দেবকন্যা

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ ঃ
৭ই মাঘ, ১৩৬৩

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা ঃ
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর ঃ শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

প্রখ্যাত সুরসাধক শ্রদ্ধেয়
শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক
অগ্রজপ্রতিমেষু

"অস্তি গোদাবরী তীরে……"

বিশাল শাল্মলীতরু আর নেই। শাখাপ্রশাখায় বিস্তীর্ণ, স্নিগ্ধ ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে-থাকা তপস্যামগ্ন সেই প্রশান্ত উদার মহীরুহের দল বহুদিন বিদায় নিয়ে গেছে। সেই টিট্টিভ-পক্ষী আর জরদগবেরাও সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় চলে গেছে। দিনান্তের কুলায়ে ফিরে-আসা পাখিদের সেই সান্ধ্য কলরব আজ আর কোন তপোবনবাসিনী বধূকে কলসী কাঁখে গোদাবরীর ঘাটে নেমে জল তুলে আনতে স্মরণ করিয়ে দেয় না।

ঋষি-পদচিহ্নিত তপোবনের সেই প্রশান্তিও কোথায় ভেসে গেছে। ভেসে গেছে সহজ সামাজিক প্রীতির সম্পর্ক, দয়া, ক্ষমা, সাম্য আর উদারতা! স্থূল প্রয়োজনটাই মানুষের কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে আজকের জনপদে। বহিরঙ্গ নিয়েই মেতে উঠতে হয়েছে মানুষকে, অন্তরের অনাবিল স্রোতধারা ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে আসছে।

গোদাবরীও তাই বুঝি আজ ক্ষীণ, শ্রীহীন! বিস্তৃত চর ওঠায় কোনক্রমে ব'য়ে চলেছে এপাশ ওপাশ দিয়ে। দূরে—কোনো সপ্তনদী বিবর্জিত দেশে কেউ হয়ত এখন তীর্থ-আবাহন করছে—'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি, নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু!'

—আমার এই এক গণ্ডূষ জলে, হে সপ্তনদী-মাতৃকা, তোমরা এসে অধিষ্ঠান করো, তোমাদের সান্নিধ্যে তীর্থে পরিণত হোক আমার এ ক্ষুদ্র গৃহ!

কিন্তু গোদাবরী শুধু আকারে নয়, স্রোতেও আজ ক্ষীণ। অবগাহনে নামলে অনুভব করাই যায় না সেই স্রোত—যেন বদ্ধ

জলাশয়ের মালিন্য সর্বাঙ্গ বেষ্টন ক'রে ধরে। গ্রীষ্মের মৃতপ্রায় নদী ঘাট ছেড়ে বেশ খানিকটা তফাতে সরে গেছে,—কাদা, ইঁট আর পাথর—তারই মাঝে ভাঙা ঘাটের কঙ্কালটা নির্লজ্জরূপেই আত্ম-প্রকাশ করেছে।

পাথরে বাঁধানো উঁচু পাড়ের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে অগ্রসর হচ্ছিল সোমনাথ। ধীরে ধীরে প্রভাত হচ্ছে—আকাশে উষার রক্তিমাভা মিলিয়ে স্পষ্ট হয়ে আসছে দিনের আলো। এক ঝাঁক সাদা বক উড়ে চলেছে দূরের ওই পাহাড়ের দিকে। ঘরের দরজার সামনে খাটিয়া অথবা মাটিতে মাতুর পেতে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের রাত যারা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, আস্তে আস্তে উঠে বসছে তাদের কেউ কেউ; কেউ বা ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া পেয়ে ঘুমের আরামে মগ্ন হয়ে আছে।

স্তূপীকৃত কাঠ পাহাড়ের মতো জড়ো করা, সারি সারি সাজানো। কেউ কেউ এরই মধ্যে দাঁড়ি-পাল্লা ঠিক ক'রে বিক্রেতার আশায় লোলুপ গৃধ্নুর মতো পথের দিকে চেয়ে ব'সে আছে। রজকের দল এরই মধ্যে কাপড়ের স্তূপ নিয়ে এসেছে নদীর ধারে। মেয়ে পুরুষ সবাই সারি সারি একেবারে জলের ধারে নেমে গিয়ে পাথরের ওপর অথবা কাঠের তক্তার ওপর কাপড় আছাড় দিচ্ছে সজোরে। মেয়েরা শাড়ির প্রান্ত হাঁটুর ওপর পর্যন্ত তুলে টান ক'রে জড়িয়ে নিয়েছে কোমরে মালকোঁচার ভঙ্গিতে। দু'হাতে গোছা করা কাপড়টা তুলে আছাড় দিচ্ছে পাথরের ওপর, তারই তালে তালে দুলছে শরীর, পিঠের লম্বমান দীর্ঘ বেণীটা তারই দোলায় দুলে দুলে যেন খেলা করছে পরম উল্লাসে,—কারুর বা খোঁপায় গোঁজা গত রাত্রির বাসী ফুল এখনো ফেলা হয়নি,—শরীরের দোলায় ম্লান দুর্বল ক্লান্ত পাপড়িগুলি একে একে খ'সে পড়ছে শুধু।

সোমনাথ আরও একটু এগিয়ে গেল। ঘাটের রাণায় ব'সে এক ব্রাহ্মণ এই এত ভোরেই তর্পণ করাচ্ছেন কাউকে। আরেকজন করাচ্ছেন তাঁর যজমানকে স্নান। আরও তিন-চার জন ব্রাহ্মণ এদিক্-

ওদিক্ যাত্রীর আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই অবধানী বা পুরোহিতরা সবাই তার পরিচিত। তার পিতৃব্যবসাও যে এই পৌরোহিত্য; তার বাপ, কাকা, জ্যাঠা সবারই এই কাজ। তার পূর্বপুরুষেরা এই গোদাবরী তীরেই যজমানদের ধর্মপথবাণী অবধান করিয়ে একে একে দেহ রেখেছেন। পৌরোহিত্য তার কুলধর্ম। একমাত্র তাকেই বলা যায় দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ!

ঘাটের রাণায় ব'সে ব্রাহ্মণ তাঁর যজমানকে তারস্বরে একটানা চিৎকার ক'রে তীর্থ-প্রণামের মন্ত্র পড়াচ্ছেন: নমঃ কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ। তীর্থান্যে তানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ।

সোমনাথ কী মনে ক'রে ঘাট দিয়ে নামতে লাগল, মুখটা ধুয়ে নেবে জলে। এই সুযোগে স্পর্শ করবে একবার প্রাচীনা গোদাবরীর জল। কিন্তু এক নদীর জলে কী মানুষ দুইবার স্নান করে? যে জল এখন সে স্পর্শ করবে, পরমুহূর্তে স্রোতে সেই জল চলে যাবে দূরে। এই চ'লে যাওয়াটাই নদীর ধর্ম। জীবনের ধর্মও তাই। এক নদী, ঐ দূরে একই লৌহ-সেতু—একই নামের আড়ালে কত নতুন নতুন জলধারার প্রবাহই না ব'য়ে যাচ্ছে! একই সোমনাথ, কিন্তু তার দেহে-মনে কতো নতুন নতুন চিন্তা আর অভিজ্ঞতার স্বাক্ষরই না প্রবহমান!

সোমনাথ ধীরে ধীরে নামছে আর ঘাটের ব্রাহ্মণদল চকিত হ'য়ে উঠছেন নতুন কোনো যাত্রীর আগমন-সম্ভাবনায়। কেউ চিনতে পারছেন দূর থেকেই, কেউ নিদারুণ আগ্রহে এগিয়ে আসছেন, কিন্তু ওকে দেখে নিতান্ত নিরাশ হ'য়েই ফিরে যাচ্ছেন নিজের আসনে; কেউ কেউ অবাক্ হয়ে ভাবছেন, এ ছেলেটা হঠাৎ এখানে কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে, অথচ স্নান-আহ্নিকের বালাই নেই! বৃদ্ধ বেণুগোপাল আচারীর এই ছেলেটি বাস্তবিকই নরকের কীট! একে বৃদ্ধ যে বাড়ি থেকে আলাদা ক'রে দিয়েছেন, সে' ভালই হয়েছে।

জলে দাঁড়িয়ে তার কাকা কা'কে যেন স্নান-বিধির মন্ত্র পড়াচ্ছেন ; এক একটি শব্দ উচ্চারণ করেন—যজমান সেটি আবৃত্তি করে ; আর তারই ফাঁকে ঘাটের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন—নতুন কোন যাত্রীর আবির্ভাব ঘটল কি না ! যজমানকে আচমন করিয়ে কাকা বলছেন—'বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য—(এইখানে একটু থেমে অপাঙ্গে তাকে একবার দেখে নিলেন)—বৈশাখ মাসি শুক্লপক্ষে…(আবার থামলেন কাকা, দূরে মন্দিরের দিকে চোখ পড়ল—একদল যাত্রী না ? পা দুটো চঞ্চল হয়ে উঠল—একে ছেড়ে ওদিকে ছুটবেন না কি ?)

সোমনাথ স'রে গেল একটু দূরে ; জলের ধারে ভিড় একটু কমুক, সে তার কাজ একটু নিরিবিলিতেই সারতে চায়। কিন্তু কাকার অতি-আশায় ছাই পড়ল, অন্য কোন ব্রাহ্মণ দখল করেছেন নবাগত যাত্রীদলটিকে ; কাকা ক্ষুণ্ণমনে আবার উচ্চারণ করছেন সেই একঘেয়ে শব্দসমষ্টি ঃ শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ গোদাবরীস্নানমহং করিষ্যে—এ—এ !

হঠাৎ কাঁধের কাছে একটা স্পর্শ অনুভব করল সোমনাথ। কে এক ব্রাহ্মণ তাকে প্রশ্ন করছেন সাগ্রহে,—পিতৃ তর্পণ করাবে ?

কিন্তু তার পিতা যে বর্তমান ! ঘুরে দাঁড়ালো সোমনাথ, পরমুহূর্তে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল ! তারই বাবা এসে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করছেন,—পিতৃ তর্পণ করাবে !

যেন আর্তকণ্ঠে উত্তর দিল সোমনাথ,—বাবা, আমি !

কে !—বৃদ্ধ দু'চোখ ভালো করে রগড়ে নিলেন, বললেন,—সো-ম-না-থ !

—হ্যাঁ, আমি।

যে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন, সে আঙুল কয়টি অপর হাতের মুঠির মধ্যে পেষণ করতে করতে সরে গেলেন বেণুগোপাল আচারী,—বুড়ো হয়েছি দেখতে পাইনে চোখে।

ব'লেই নেমে গেলেন জলের ধারে—সোমনাথ অনতিদূর থেকেই

শুনতে পেলো বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর,—অপবিত্র পবিত্রবা সর্বাবস্থা গতোহপিবা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচি !

ঘাটের রাণার একপাশে ততক্ষণে ব'সে পড়েছে সোমনাথ। মনের প্রতিক্রিয়া দেহে সঞ্চারিত হয় এত তাড়াতাড়ি ? পা-টা কেঁপে উঠল, মাথাটাও ঘুরে উঠলো হঠাৎ, শীর্ণ ক্ষীণ দেহটা সব চমক্ সব সময় সহ্য করতে পারে না।

আজ বহুদিন পরে বাবা তাকে স্পর্শ করেছেন—অবশ্য ভুল ক'রেই। আচারভ্রষ্ট সন্তানকে স্পর্শ করতে শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ সংকুচিত হবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু বাবা যখন নবাগত যাত্রিদলকে যজমান করবার চেষ্টায় তাদের পিছু পিছু ঘুরতে থাকেন, তাদের কাঁধে হাত দেন, কোন সময় বা হাতটা ধরেন,—তখন তো তাদের আচার-ভ্রষ্টতার কথা তাঁর মনে পড়ে না ; তখন তো ভুলেও নিজেকে 'শুচি' করবার কথা মনে হয় না !

কারণটা সোমনাথ জানে ; আচার-আচরণ নয়—কারণটা আরও গভীর। ভাবতে ভাবতে আপন মনেই হেসে ওঠে সোমনাথ। কী করুণ অথচ কী হাস্যকর ! ভালো ক'রে তলিয়ে দেখতে গেলে, ঘটনাটির শুরু বহু পূর্ব থেকেই ; সমাপ্তি হয়েছে মাত্র বছর তিনেক আগে। এই তিন বছর পিতা-পুত্রে কোন সংযোগ নেই। পথে চলতে চলতে ক্বচিৎ দেখা হয়েছে, অমনি মুখ ফিরিয়ে, ছোঁয়া বাঁচিয়ে যে যার পথে চলে গেছেন—কোন কথা হয়নি। তিন বছর আগের সোমনাথ ছিল সংসারানভিজ্ঞ পঁচিশ বছরের তরুণ, আজ সে আঠাশ বছরের 'জ্ঞান-বৃদ্ধ' ; অন্ততঃ নিজেকে সে তাই ব'লে পরিচয় দিতে ভালবাসে। এই তিন বছরের অভিজ্ঞতা তার জীবনের ধারাকে সম্পূর্ণ ওলটপালট ক'রে দিয়ে গেছে।

শিশুকাল থেকেই সে না কি রুগ্ন, হাড়-জিরজিরে চেহারা ! ন' বছর বয়সে উপনয়ন-সংস্কারের পর থেকেই তাদের বংশ বা পেশার রীতি অনুযায়ী পূজা-আহ্নিকের কাজ শুরু হওয়া উচিত, কিন্তু

সোমনাথের বেলায় হলো তার ব্যতিক্রম। এইখানে তার মায়ের কথা এসে পড়ে। তখনো তাদের সাবেক বাড়িটা প্রাচীরের বেড়ায়-বেড়ায় এখনকার মতো এত ভাগ হয়নি। বাবা, কাকা, জ্যাঠা সবাই একত্রে থাকতেন, একান্নবর্তী পরিবার। উদয়াস্ত পরিশ্রম করতেন মা। সেবায় ছিলেন অকুণ্ঠ। হাসিমুখে সব কাজ ক'রে যেতেন, বড় বড় পিতলের হাঁড়িতে ক'রে রাস্তার কল থেকে খাবার জল তুলে আনতেন প্রচুর, সমগ্র পরিবারটির জন্য। এই জল তুলে আনার ব্যাপারটা বিদেশীর পক্ষে সহজে হৃদয়ঙ্গম করা একটু অসুবিধাজনক। একটি মহল্লায় একটি কি দুটি খাবার জলের কল ক'রে দিয়েছে 'মনুষ্যপালসমিতি' (মিউনিসিপ্যালিটি)। আজকাল বহু বাড়িতে জলের পাইপ নিয়ে জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বটে, কিন্তু এখনো অনেক ক্ষেত্রেই ওটা সাবেক ব্যবস্থা। রাস্তার মোড়ে কলের চার পাশে নানান্ বয়সী মেয়েদের ভিড়; সারি সারি হাঁড়ি-কলসী সাজানো। রীতিমত কলহ সৃষ্টি না ক'রে জল নিয়ে আসা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। মাকে এই দুরূহ কাজই করতে হ'ত প্রতিদিন। কিন্তু অদ্ভুত তাদের পরিবার, অদ্ভুত তাদের রীতি-নীতি ; রক্ষণশীলতা আর অজ্ঞতার অপূর্ব সংমিশ্রণ! সে হবার পর কি হয়েছিল মায়ের শরীরে ; ফলে আর কোন ভাই-বোনই তার বাঁচতো না, 'মৃতবৎসা' ব'লে আখ্যাতা হলেন মা। শুধু তাই নয়, তাঁকে 'নারকী', 'পাপী' ব'লে লাঞ্ছিতও করা হত কম না। মা ছিলেন জেদী, দৃঢ়চরিত্রের মহিলা। অথচ এই মা ঐ সব অত্যাচার লাঞ্ছনা যেন গায়ে মেখেও মাখতেন না।

সোমনাথ আজ বোঝে, তাদের অদ্ভুত রক্ষণশীল পরিবারে স্ত্রীলোক সম্পত্তির সামিল মাত্র, স্ত্রীর স্থান দাসীরূপে ; মনের বালাই এদের যেন নেই। পুরুষেরা আছেন তাঁদের পূজার্চনা, মন্দির, ঘাট আর যজমান নিয়ে ; মেয়েরা করছে উদয়াস্ত ঘরের কাজ—জল তোলা, বাজার, রান্না-বান্না, ঘর-দোর নিকানো গুছানো এই সব। চাকর-বাকরের ব্যাপার নেই। এ সব ক'রেও কি কারুর মন পাবার জো

আছে ? নারীত্বের এই অপমান মাকে মর্মে মর্মে বিদ্ধ করত, কিন্তু তবু এ সব সহ্য ক'রে যেতেন মা ; সম্ভবতঃ সোমনাথেরই মুখ চেয়ে। মায়ের লাঞ্ছিত মন সর্বক্ষেত্র থেকে ফিরে বিমুখ হয়ে একমাত্র পুত্রকে ঘিরেই করেছিল স্বপ্ন-রচনা। তাই যেদিন পাঠশালা থেকে সোমনাথকে ছাড়িয়ে এনে পূজার্চনার কাজে নিয়োজিত করার কথা স্থির হলো, সেইদিন রুদ্রাণীর মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন মা—দাঁড়ালেন সমগ্র পরিবারের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কথা কাটাকাটি, রাগারাগি, বাবার সেই উচ্চ চিৎকার আর মায়ের প্রতিবাদ আজও মনে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ক্রোধ চরমে উঠতে ছেলের হাত ধ'রে একবস্ত্রে মা চলে এলেন বাপের বাড়ি—একটা গাড়িও না, কিছুই না—একেবারে পায়ে হেঁটে। প্রায় আড়াই মাইল পথ—এই রাজমহেন্দ্রী শহরেরই এক ব্রাহ্মণ-পল্লীতে। পথে যেতে যেতে বলেছেন,—সোমলু, তোকে হেঁটেই যেতে হবে, কোলে নিতে পারব না ; পারবি তো হাঁটতে ?

—হ্যাঁ, মা।

—পারতেই হবে। কেন পারবি না ? ওরা রোগ-রোগ করে তোর মাথা খেয়েছে। কিছুই হয়নি তোর। ওদের খুঁতখুতানির জন্যই তোর অত অসুখ হতো। খুলে ফেল্ ঐ সব মাতুলীর জঞ্জাল। এই দেখ্, আমিও ফেলেছি।

—বাবা বকবে না ?

—দূর ! বড্ড ছেলেমানুষ তুই !—ন' বছর বয়স হ'ল, কম কথা ! সব বুঝতে শেখ ! বলেই হেসে ফেলেছিলেন মা, বলেছিলেন,—কষ্ট হচ্ছে, হ্যাঁ রে ? কোলে আসবি ?

—না-মা।

—এই ত আমার ছেলের মতো কথা ! কী বলছিলি, তোর বাবা বকবে কিনা ! জানিস্, সব ওদের বুজরুকি ! ধর্ম আর ভক্তি ! সে সব আর আছে নাকি ওদের ! সে সব গোদাবরীর জলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে ! দেখ্, সোমলু, তুই স্কুলে পড়বি। বাবা

বাড়িতে জায়গা না দেয়, আমি পরের বাড়ি জল তুলে সেই পয়সায় তোকে পড়াবো। ওদের বুজরুকি সব তুই ভেঙে দিবি। ভণ্ডের দল সব!······

এই তার মা। এই মায়ের জন্যই সে স্কুলে পড়তে পেরেছে, এই মায়ের প্রেরণাতেই স্কুলে পড়িয়ে প্রাইভেটে আই-এ পাশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ইণ্টারমিডিয়েট। সোমনাথ আগাগোড়া সত্যসত্যই মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী।—হেসে ওঠে সোমনাথ। কথাটা কী তাৎপর্যপূর্ণ! বড়োও নয়, ছোটও নয়, একেবারে মাঝখানের লোক সে! কিন্তু যাক্ সে কথা।

আকাশের জ্বলন্ত তারা যেন তার মা হয়ে পথ ভুলে জন্ম নিয়েছিল তাদের এই ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে! মা যেন রক্তমাংসের মানুষ নয়, অন্য জগতের জীব! হয়ত সব সন্তানেরই তার মাকে মনে হয় এমনি অপার্থিব আর জ্যোতির্ময়ী! এটা তার পক্ষে নতুন কোনো কথা নয় তবু, এক একসময় ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই অনড় স্থবির রক্ষণ-শীলতার মধ্যে এমন নির্মুক্ত নির্বাধ প্রাণশক্তি এসেছিল কেমন ক'রে! অসামান্য তার মা, তার মায়ের মত দৃঢ়চরিত্রের মহিলা আর একটিও চোখে পড়ল না। কলহপরায়ণ বহু মেয়েই সে দেখেছে,—কিন্তু মা ছিল ক্ষুদ্রতা নীচতার জ্বলন্ত প্রতিবাদ!

তাই বোধহয় মাকে বেশীদিন ধরে রাখা যায়নি। দাদুর সংসারে গিয়েও মার সুখ হয়নি শেষ পর্যন্ত। সেখানেও লাঞ্ছনা উদ্যত হয়ে উঠল অবশেষে, তার দুঃখিনী মাকে এ সংসারে কেউ বোঝেনি। চির দুঃখিনী সীতাকে কোলে টেনে নিয়েছিলেন মাতা বসুমতী, আর তার লাঞ্ছিতা মাকে শেষ শান্তি দান করেছে এই নদীমাতৃকা দেবকন্যা গোদাবরী। সে-ও হয়ত এমনি এক সকাল। কিন্তু এমন গ্রীষ্ম নয়। গোদাবরী তখন বর্ষার গোদাবরী,—হয়ত শ্বশুরকুলের 'নারকী' শ্বশুর-কুলের জ্ঞাতিদের স্পর্শ বাঁচিয়ে এমনি করেই সন্তর্পণে নেমেছিল ঘাটে, —না, না, এ' সে ঘাট নয়,—সে ঘাট ঐ লৌহসেতুর নিচে—ঝকঝকে

বাঁধানো ঘাট ; কী ভাবে কী হয়েছিল কে জানে, স্নানার্থীদের ভিড় থেকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না মাকে। মা নেই, ঘাটের কাছে পড়ে আছে মার একটি কাপড়ের পুঁটুলি। একটা শুকনো শাড়ি, কয়েক আনা পয়সা, আর কিছু ফুল, চন্দন, ধূপ আর কর্পূর! রাজমহেন্দ্রী থেকে হেঁটে হেঁটে এসে নদীতে স্নান করে কোন্ দেবতার পূজা করবে বলে স্থির করেছিল তার মা, সে খবর কে জানে!

মার মৃত্যু সেই অনড় স্থবিরতার মূলে কিছু নাড়া দিয়েছিল কিনা জানা নেই,—বাবা এসে হঠাৎ একদিন তাকে নিয়ে গেলেন বাসায় তাঁর কাছে। হয়ত পিতৃস্নেহই। বাড়িটা তখন ভাগাভাগিতে খণ্ডবিখণ্ড, তারই এক অংশে তিনখানি ছোট-ছোট ঘর, একটা গোয়াল, এরই মধ্যে শুরু হলো তাদের পিতাপুত্রের সংসার।

কিন্তু বেশীদিন নয়। বাবা প্রথম-প্রথম কিছু না বললেও তার স্কুলের পড়া পছন্দ করেন নি। পরে প্রায়ই গজগজ করতেন! একটা হাতবাক্স ছিল বাবার, একটা ছোট লোহার সিন্দুক, বাবা তেজারতি কারবার করতেন, চড়া সুদে টাকা ধার। এ ব্যবসা এ পাড়ার পুরোহিতগোষ্ঠীর অনেকেরই ছিল। সেই সিন্দুক আর হাতবাক্স ছিল বাবার প্রাণ। চাবি প্রাণান্তেও হাতছাড়া করতেন না, তবু বাড়ি ফিরে এসে ছেলের দিকে তাকাতেন সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে, উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করতেন, টাকা অথবা বন্ধকী জিনিসপত্র ভালো করে দেখে তুলে রাখতেন। এই অবস্থায় পার হলো তার প্রবেশিকা পরীক্ষা।

বাবা আর পড়ালেন না। এখানকার একটা প্রাইমারী স্কুলে কাজ নিল সোমনাথ।

বাবা হঠাৎ এই সময় জ্ঞাতিদের প্ররোচনায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন ওর বিয়ের জন্য। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার, মেয়ে দেখতে গিয়ে নিজেই পছন্দ ক'রে বসলেন সেই মেয়েকে, নিজেই মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে আনলেন ঘরে। প্রাচীনেরা তেমন অবাক্ হ'লেন না। এ' অঞ্চলের প্রচলিত বহুবিখ্যাত কাহিনীর মতই ঘটল এই ঘটনাটা। অতীত

কালের সেই চিত্রাঙ্গীর গল্প। বৃদ্ধ রাজা রাজকুমারের জন্য 'চিত্রাঙ্গী'কে দেখতে গিয়ে তার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে নিজেই তাকে বিয়ে করে ফিরে এলেন রাজপ্রাসাদে।

সোমনাথের মা ছিলেন তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী, সোমনাথের বড়ো-মা অর্থাৎ বেণুগোপাল আচারীর প্রথমা পত্নী নিঃসন্তান অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলেন।

বেণুগোপাল আচারীর তৃতীয়া পত্নী অর্থাৎ সোমনাথের ছোট-মা হ'য়ে যিনি এলেন, তিনি ষোল বছরের এক তরুণী। সংসারে জটিলতার বৃদ্ধি এই মেয়েটি আসার পর থেকেই। আশ্চর্য ব্যাপার, বৃদ্ধ দিন-দিন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন তার ওপরে, ঠিক সেই বৃদ্ধ মহারাজের মতো। এই অবস্থায় পার হলো তার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা।

কিন্তু চরম পরীক্ষা অপেক্ষা করছিল তার সামনে। তিন বছর আগেকার ঘটনা। আর পড়া হয়নি সোমনাথের। কাজ বেড়েছিল স্কুলের,—শরীরটাও যাচ্ছিল না ভালো। হঠাৎ এক বর্ষায় জ্বরে পড়ল সোমনাথ, সর্দি-জ্বর, বুকে ব্যথা। বাবা প্রথম-প্রথম খুব যত্ন করতে লাগলেন, শিয়রের কাছে বসে মাথায় হাত দিয়ে ডাকতেন, —সো-ম-না-থ!

তার জ্যাঠা কী একটা শিকড় বেটে তাকে খাওয়াতে লাগলেন, বিশ্রী তার স্বাদ। এক জ্ঞাতি-কাকা এসে মন্ত্র-পড়া জল খাওয়ালেন, আরেকজন মন্ত্রপাঠ করে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হলো না। জ্যাঠা টোটকা চিকিৎসা জানতেন। কী গাছের পাতা যেন বেটে তার বুকে লাগানো হলো। অথচ রোগ সারছে না কিছুতেই। সারা দিন রাত আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে সোমনাথ। মাঝে মাঝে উপস্থিত হয় ভীষণ শ্বাসকষ্ট। জ্যাঠা জানালেন, রোগ নাকি আরোগ্য করা শিবেরও অসাধ্য। আর, রোগটাও নাকি ভালো নয়, ভীষণ ছোঁয়াচে। সে ত মরবেই, সেই সঙ্গে আর কাউকে না নিয়ে মরে।

ছোট-মা ভয় পেয়ে চলে গেল তার ভাইয়ের বাড়ি। বাবা এত আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে ঘরে ঢুকতেও তাঁর হাত-পা কাঁপত। দূর থেকে কথা বলতেন মুখে কাপড় চাপা দিয়ে। কাছে আসতেন না, ছুঁতেন না। আঃ! একটা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ যদি সে পেতো উত্তপ্ত কপালটার ওপরে! সোমনাথ জ্ঞান ফিরে এলে এক-একদিন চেয়ে দেখত, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে, চোখ দুটো তাঁর যেন ভয়ে কেমন হয়ে উঠেছে! এত ভয় কেন? কী এমন খারাপ রোগ হয়েছে তার?

না, কেউ আসে না তার কাছে। বন্ধুবান্ধব তার এমনিতেই কম, যারা ছিল, ভয় পেয়ে তারাও কাছে আসে না। আত্মীয়স্বজন মুখ ফিরিয়েছে তার জ্যাঠা জবাব দেবার পর থেকেই। সে যে মরবে, এ কথা অবধারিতরূপে সত্য বলে জেনে রেখেছে সবাই। সবাই তাকে ছেড়ে গেল, তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু তার বাবাও তাকে ত্যাগ করলেন! মা-হারা ছেলেকে এভাবে মৃত্যুর মুখে রেখে নিশ্চিন্ত হতে মানুষ যে সত্যিই পারে, এটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারই ঘটলো সোমনাথের জীবনে। স্নেহ, মায়া, প্রীতি, সব যেন কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেল মুহূর্তে। একটা কালো পর্দা যেন উঠে গেল তার চোখের সামনে থেকে। এরই নাম সংসার। তার সহপাঠী, সহকর্মী সবাই তাকে ঠেলে ফেলে সরে গেছে দূরে। শুধু মার সেই জ্যোতির্ময়ী মুখখানা ভেসে উঠছে সামনে, যেন সেইরকম হেসে হেসে তাকে বলছেন,—সোমলু, তোকে হেঁটেই যেতে হবে, কোলে নিতে পারব না, পারবি ত হাঁটতে?

—পারব মা। চোখের পাতা ভিজে উঠত সোমনাথের। বুকে ব্যথা, নিশ্বাস নিতেও কেমন কষ্ট,—তবে কি এই বয়সেই তাকে বিদায় নিতে হবে এই পৃথিবী থেকে? মৃত্যু। কেমন না জানি মৃত্যুর রূপ!

মা যেন বলছেন, কী বাবা, কষ্ট হচ্ছে? কোলে আসবি?

—না, মা, আমি নিজেই পারব। চোখের জলে বালিশ ভিজে যেত। কে এক মহিলা তাকে দুবেলা দুধ-বার্লি খাইয়ে যেতেন, ধোপাদের একটি তরুণ ছেলে তার ঘরদুয়ার ঝেড়ে ময়লাটয়লা পরিষ্কার করে দিয়ে যেত। বাবা একটু দয়া করেছিলেন এই ছেলেটিকে এনে, নইলে সঙ্গীর অভাবে সে সত্যই মারা পড়ত। ছেলেটি একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। নইলে রোগ ছোঁয়াচে শুনেও সে সেবা করতে কুণ্ঠিত হত না। বলিষ্ঠ ঝকঝকে চেহারা, নাম কোণ্ডা বা কোণ্ডাইয়া। একদিন বলেছিল সোমনাথ,—কোণ্ডা, তুই যে আমাকে ছুঁয়ে যাস্, তোর ভয় করে না? শুনিস্‌নি আমার খারাপ রোগ?

খারাপ রোগ? কোণ্ডা আশ্চর্য হয়েছিল শুনে,—রোগ ত সবই খারাপ পণ্ডিত, ভগবানের ইচ্ছা হলে সেরে ওঠে, আর না হলে তিন দিনের সামান্য জ্বরেও লোক মারা যায়।

সোমনাথ জানে, এরা এসব ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার তত বোঝে না। রোগ মহামারীর আকার ধারণ করলেই ওরা ভয় পায়, এবং দলে দলে পালাতে থাকে। নইলে কোথাও ধারে কাছে কোনো রোগ নেই, একটি লোক শুধু ঘরে শুয়ে আছে, এতে আবার ভয় করবার আছে কী?

—তুই আমাকে পণ্ডিত বলিস্ কেন কোণ্ডা?

—বলব না! কোণ্ডা ত্রস্ত হয়ে বলে ওঠে,—ওরে বাপ! পণ্ডিতের ছেলে পণ্ডিত। পণ্ডিত বলব না তোমাকে!

সোমনাথ ম্লান হাসে, বলে,—তা ত বুঝলাম। কিন্তু, হ্যাঁরে কোণ্ডা, আমার বাবা পর্যন্ত আমাকে ছোঁয় না, তুই সত্যিই ভয় পাস্ না আমাকে সেবা করতে?

—সেবা আর তোমার কী করছি! কিন্তু ভয়? কোণ্ডা বলিষ্ঠ পেশীবহুল বাহু দুটি আন্দোলিত করে বলে উঠল,—ময়লা কাপড়-চোপড় কেচেই আমাদের দিন কাটে,—রোগ আমাদের হয় না পণ্ডিত, আমরা খেটে খাই।

কিন্তু এ বাড়িতে বাবা তাকে রাখবেন না। একদিন এসে বললেন সেইরকম মুখে কাপড় চাপা দিয়ে,—কোণ্ডা এসেছিস্‌?

—হ্যাঁ, পণ্ডিতজী।

—বাড়িটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখে এসেছিস্‌?

—হ্যাঁ।

বাবা ফিরলেন সোমনাথের দিকে,—শোনো সোমনাথ, ধোপা-বস্তির কাছে একটা বাড়ি আমি পেয়েছি শুনেছ বোধ হয়, পেয়েছি মানে অনেক ফিকির-ফন্দী করে কিনেছি বলতে পারো, সেই বাড়ির ওপর তলাকার ঘরে তুমি থাকবে। যতদিন তুমি বাঁচো, কোণ্ডা এরা দেখাশোনা করতে পারবে ভালরকম। তার পরে কোণ্ডার দিকে ফিরে বললেন,—একটা গাড়ি নিয়ে আয়। আমাদের প্যাণ্টাইয়ার গাড়িটাই নিয়ে আয়, আমি পরে ভাড়া দিয়ে দেব তাকে। তাহলে সোমনাথ, আমি চললাম ঘাটে।

সোমনাথের চোখ আবার ভিজে ওঠে। ভগবান, এই অসহায় ভাবে তাকে মরতে হবে! বাবা ডাক্তার ডাকতে রাজী নয়। ছোকরা ডাক্তাররা কি তার জ্যাঠার চেয়ে বেশী জানে? এমন কি হাসপাতালে পাঠাতেও তিনি চান না। অদ্ভুত এদের সংস্কার, হাসপাতালে যে যায় সে নাকি আর ফেরে না। সে যে বাঁচবে না, এ তার বাবা ত স্থিরই করে নিয়েছিলেন, তবু হাসপাতালে যেতে দেননি। ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে হাসপাতালের সাত জাতের ছোঁয়ার মধ্যে মরবে কেন, এই ছিল তাঁর মত। কিন্তু দুর্বার এক অনুপ্রেরণা এলো তার মনে, এইভাবে এই বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে তিল তিল করে জীবনদান সে করতে পারবে না। না-না, বাঁচতে তাকে হবেই। এই-ই সুযোগ, আসুক গাড়ি। এই গাড়ি করেই যাবে সে হাসপাতালে, সেখানে সে মরুক বাঁচুক যাই হোক না কেন!

কিন্তু কোণ্ডা প্রথমে ভয় পেল এই প্রস্তাবে। পণ্ডিতজী যদি চটে

যান! সেটা কী করে সম্ভব হবে? তাছাড়া ভগবান রাখলে ঐ বাড়ীতে এমনিতেই সেবে উঠবে সোমনাথ।

হায়রে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীব! কিন্তু এদের দোষ কী, এদের ত আমরাই বুঝিয়েছি এই সব। আমরাই সমাজে প্রভুত্ব করব বলে ওদের রেখেছি অজ্ঞানতার অন্ধকারে।

এই সময় ভীষণ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হ'ল সোমনাথের। শরীরটা বেঁকে দুমড়ে যেতে লাগল।

ভয় পেয়ে ছুটে এলো কোণ্ডা, বলল,—পণ্ডিত!

সোমনাথ কোনক্রমে বলতে পারল,—হাসপাতাল।

হয়ত ওর কষ্ট দেখে নরম হলো কোণ্ডার মন, যা হবার হোক, এ কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না, না হয় রেগে পণ্ডিতজী তাকে শাপমন্যি দিক্, তবু সে নিশ্চয় নিয়ে যাবে হাসপাতালে।

দুর্দিনের বন্ধু এই কোণ্ডা। প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতে সোমনাথ পৌঁছেছিল হাসপাতালে। সংকটের মধ্যে কেটেছিল কটা দিন। Neglected case of pneumonia। নেহাত আয়ুর জোরেই সেবার বেঁচে উঠল সোমনাথ। হাসপাতালে কেউ আসেনি তাকে দেখতে, শুধু কোণ্ডা ছিল তার কাছে দিনরাত। এরা বুদ্ধিজীবি নয়, শ্রমজীবি। তাই সংশয় এদের মধ্যে কম। এদের হৃদয় আছে, প্রকৃতির সাহচর্য বেশী পায় এরা, ঘরে থাকে কতক্ষণ? তাই বোধ হয় এরা সহজ, সরল। প্রীতির ক্ষেত্রে ফাঁকি নেই, যাকে ভালবাসবে, তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

হাসপাতাল থেকে প্রায় বিশ দিন পরে বেরুল সোমনাথ। ঐ ত সেই পরিচিত বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, নদী-মাতৃকা গোদাবরী। গোদাবরীর মধ্যে তার মা মিশে আছেন, রৌদ্র জলে চিকচিক করছে তার মায়ের হাসির মতো! আমি এসেছি মা, ফিরে এসেছি তোমার কোলে!

বাবা যেন ভয় পেলেন তাকে বাড়ির দরজায় দেখে। বললেন, —এখানে নয়, তুমি ঐ বাড়িতে যাও, ঐ কোণ্ডাদের পাড়ায়। ঐ বাড়ি

রইল তোমার অধিকারে। নিচে ভাড়াটেরা আছে, তাদের ভাড়া থেকে ট্যাক্স বাদে মাসে চল্লিশ টাকার মতো আয় হবে তোমার, এতেই চালিয়ে যেতে হবে তোমাকে। আমার সাবেক বাড়িতে কোন অধিকার রইল না কিন্তু তোমার। সে' বাড়ীর স্বত্ব পাবে তোমার ভাই।

—ভাই!

বৃদ্ধ জানালেন,—হ্যাঁ বাবা, তোমার একটি ভাই শীঘ্রই আসছে পৃথিবীতে। তোমার ছোট-মা এখানেই রয়েছেন এখন।

ভাই!···তার দুঃখিনী মায়ের কথা মনে পড়ল। তার এই মাকে যেন সেই দুঃখ পেতে না হয়!

দেখ সোমনাথ, বৃদ্ধ বললেন, যতদিন তুমি বাঁচবে, ঐ বাড়ির স্বত্ব রইল তোমার, কিন্তু এ বাড়ির দিকে······

সোমনাথ উত্তর করেছিল,—না বাবা, এ বাড়ির দিকে কোনদিন হাত বাড়াবো না। আমি অশক্ত, দুর্বল। তুমি যা দিলে এ-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট, বাবা!

বোধহয় খুশী হলেন বৃদ্ধ, বললেন,—আর দেখ, তোমার সব ব্যবস্থাই ত করলাম, কিছু করিনি একথা বলতে পারবে না। যা তোমার দরকার, সবই রইল ওখানে, এ' বাড়ীর দিকে তোমার আর না এলেও চলবে!

—বেশ ত বাবা, আর আসব না।

এইটুকুই ইতিহাস। আস্তে আস্তে শরীরে বল পেতে লাগল সোমনাথ। বাড়ি থেকে একটু-আধটু বেরুতে শুরু করল। কিন্তু দেখা হ'লে বন্ধুরা সব মুখ ফিরিয়ে নেয়, আত্মীয় স্বজন আতঙ্কিত হয়ে দূরে সরে যায়। স্কুলে গিয়ে ফিরে আসতে হ'লো। চাকরিটা তার গেছে। ক্ষয়রোগীকে তারা রাখবে না। ক্ষয়রোগ! চমকে উঠল সোমনাথ। এইবার সব সে বুঝতে পারল। এইজন্যই এই আতঙ্ক! এইভাবে দূরে সরে যাওয়া সকলের। কিন্তু এ রটনা কেন মিছিমিছি!

কে রটালো? শুনতে পেল সোমনাথ, এ রটনা তারই বাবার। হাসপাতালে সে ভালো হয়েছে বটে পিতৃপুরুষের পুণ্যের জোরে, কিন্তু ক্ষয়রোগ কখনও সারে? শিগ্‌গিরই বিছানা নেবে সোমনাথ, আর উঠবে না। কিন্তু এভাবে রটনা করবার উদ্দেশ্য কি বাবার? হায়রে ভাগ্য! মনে মনে হাসে সোমনাথ, বাবার সন্দেহ ছোট-মাকে নিয়ে। ক্ষয়রোগের রটনা করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া!

চমৎকার!…এইভাবে কেটে গেল তিন বছর। সোমনাথ আর বিছানায় পড়ল না দেখে আশ্চর্য হলো এখানকার লোক। তবে কি যক্ষ্মা নয়? আস্তে আস্তে বন্ধুদের কয়েকজন আবার এগিয়ে এলো কাছে। সোমনাথ হেসে তাদের কথার উত্তর দেয়, কিন্তু প্রাণ খুলতে পারে না তাদের কাছে। এই বুদ্ধিজীবিদের চেহারা তার দেখা হয়ে গেছে।

অথচ ঐ ওরা? ওরা স্ত্রীপুরুষ কলরব করতে করতে তার বাসায় ঢোকে, কেউ আঁচলের প্রান্ত দিয়ে ধ'রে গরম চায়ের বাটী নিয়ে আসে খাওয়াতে, কেউ নিয়ে আসে দুধ। এরাই আজ তার আপন জন। গলার পৈতাটা ছিঁড়ে এই গোদাবরীর জলেই একদিন ভাসিয়ে দিল সোমনাথ।

'পিতৃ-তর্পণ করাবে?' বাবার এই প্রশ্ন আজ অদ্ভুত নাড়া দিয়ে গেল তাকে। হয়ত এই বৃদ্ধও আর বেশীদিন নয়। হয়ত সত্যিই সেদিন অন্য কোন ব্রাহ্মণ তার কাছে এসে তাকে এমনি ভাবে জিজ্ঞাসা করবে,—করাবে পিতৃ-তর্পণ? গোদাবরীর সলিল স্পর্শ করে তাকে হয়ত সেদিন বলতে হবে,—বিষ্ণুঃ ওঁ কাশ্যপগোত্রঃ পিতা বেণুগোপালাচারী তৃপ্যতামেতৎ সতিলদোকং তস্মৈ নমঃ।

চোখের কোল আবার ভিজে ওঠে। ওর বাবা ত সত্যিই একদিন থাকবেন না! ওঁর চেহারাও হয়ে গেছে খারাপ, ভোরে উঠতে বোধহয় দেরি হয়, তাই সবার শেষে আসেন ঘাটে। ছোট-মা ওঁকে কি তেমন যত্ন করেন? ভাই হয়নি তার, হয়েছে বোন। বছর

আড়াই প্রায় বয়স হ'ল। কোনদিন দেখেনি, শুনেছে সুন্দর ফুটফুটে হয়েছে বোনটি তার।

বেশ বেলা হয়ে গেছে এতক্ষণে। উঠে দাঁড়ালো সোমনাথ। সূর্যের তেজ এরই মধ্যে বেশ প্রখর। ব্রাহ্মণেরা মাথায় ভিজে গামছা পাট করে মেলে দিয়েছেন। বাবা একটি গ্রাম্য কৃষক দম্পতিকে সংগ্রহ করেছেন বোধহয়। ঐ ত নেমে আসছেন তাদের সঙ্গে বকতে বকতে। —স্নান করাব গোদাবরীতে, তুটো টাকা দিস্। ছোকরাটি বলল,—না মহারাজ, অতো পারব না, আমরা গরিব লোক।

—আচ্ছা দেড়টা টাকা দিস্।

—প্রণাম জানাই মহারাজ, অতোও পারব না।

বাবা তখনও নামছেন,—বেশ বাপু, তোরা নতুন বিয়ে করে এসেছিস্, আমি ব্রাহ্মণ তোদের স্নান করিয়ে আশীর্বাদ জানাবো, দেড়টা টাকাও দিবি না! তোদের ধর্ম! আচ্ছা, পাঁচসিকেই দিস্।

—না মহারাজ, পুরো এক টাকা নিয়েই আজ সন্তুষ্ট হোন্।

শেষ পর্যন্ত এক টাকা! বাবা বললেন,—ঠকাবি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে! বেশ, যা তোদের ধর্ম, নে, জলে নাম্, আচমন কর্।

কিন্তু সোমনাথ জানে এই এক টাকাতেই শেষ হবে না, ওরা স্নান সেরে ঘাটে ওঠবার আগেই ওদের মাথা নোয়াতে হবে বৃদ্ধের পায়ে, বৃদ্ধ বলবেন,—গুরু প্রণাম কর্ রে বেটা, তীর্থগুরু। তীর্থগুরু না হ'লে কোন কাজই হয় না! নে, আট-আনা আট-আনা তুজনের প্রণামী রাখ্ এক টাকা!

এইভাবে তু টাকা উশুল করে ছাড়বেন বাবা ওদের কাছ থেকে। সমস্ত ব্যাপারটাই সুযোগ বুঝে দাঁও-মারা! যাত্রী-বিশেষে চার আনাতেও স্নান-মন্ত্র পড়াতে দেখা যায় এই ব্রাহ্মণদের।

ধর্মের নামে কী অদ্ভুত উপায়ে অর্থ-শোষণ চলেছে এসব জায়গায়, সে ঠিক না দেখলে বোঝা যাবে না! আমি স্নান করব, দক্ষিণা দিতে হবে ব্রাহ্মণকে।

গোদাবরীর মতো ব্রাহ্মণত্বও আজ মলিন! আজ পৌরোহিত্য একটা ব্যবসায়ের রূপ নিয়েছে! অথচ, এই গরিব ব্রাহ্মণদের বা উপায় কী? সমাজের সব-ব্যবস্থাটাই আজ শিথিল, কোন কিছুর ওপরই কারুর বিশ্বাস নেই।

বিষয়বুদ্ধিতে আবিল হয়ে উঠেছে গোদাবরীর তীর্থবারি। সোমনাথের মনে হলো, ভুল করেই এসে পড়েছে সে আজ এখানে। এখানকার সে কেউই নয়। স্পর্শ করবে এই ঘাটের জল?··· কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুস্করাণি চ।···না, না, তার গয়া-গঙ্গা এখানে নয়। ঘাট থেকে নদী তীরের নরম মাটিতে নেমে গেল সোমনাথ, এ ঘাটে নয়, ঐখানে সে নদীস্পর্শ করবে, যেখানে ঐ ওরা হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে পাষাণে কাপড় আছাড় দিয়ে দিয়ে ময়লা নিঙড়ে পরিষ্কার পবিত্র করে তুলছে পরিধেয়কে। ওদের প্রাণ, ওদের হৃদয়, ওখানেই তার কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা আর প্রভাস-পুস্করতীর্থ!

এগিয়ে গেল সোমনাথ পাথরের কুচি আর ভিজে নরম মাটির ওপর পা ফেলে ফেলে। ওদের কাজ চলেছে পুরোদমে। পাশাপাশি দু'তিন জন স্ত্রী পুরুষ কাপড়ের গোছা নিয়ে ব্যস্ত। তারপরে একটু ফাঁক। তারপরে আবার দুজন কিংবা তিনজন। দুজনের জুড়িই বেশী; হয়ত স্বামী-স্ত্রী ওরা, পাশাপাশি কাজ করে চলেছে একমনে। বেশী বেলা হয়ে গেলে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে কাজ করা অসম্ভব, তার আগেই সব কাজ সারা করতে হবে। বিভিন্ন পরিবার যেন একযোগে কাজ করছে, বিভিন্ন পরিবার, কিন্তু একগোষ্ঠী। গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে থাকতেই এরা পছন্দ করে। এই রজকের দলটি তার পরিচিত, তার বাসার চারপাশে যেন তাকে ঘিরেই এরা বাস করছে।

পাড়ের ওপর মাটিতে চারটি করে খোঁটা পুঁতেছে, সেই খোঁটাটা ঘিরে নিয়েছে একটি শাড়ি দিয়ে, তিনদিক ঘেরা একদিক খোলা। তারই মধ্যে বসিয়েছে উনুন, উনুনে হাঁড়ি চড়ানো, সিদ্ধ হচ্ছে কাপড়। এই রকম একটু দূরে দূরে ছোট ছোট শাড়িঘেরা ঘর। দমকা হাওয়া এসে উনুনের আগুনে হঠাৎ না জোর দেয়, সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। অল্প আঁচে এবং একই উত্তাপে কাপড় নাকি ভাল পরিষ্কার হয়, এবং কাপড়ের আয়ুও কমে না।

পাড়ের ওপরকার সেই স্তূপীকৃত কাঠের সামনে ঐ অতো ভোরে দোকানদারদের ঢুলু-ঢুলু চোখে বসে থাকতে দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছিল সোমনাথ। এইবার স্পষ্ট বুঝতে পারল, তার অর্থটা কী? রজকের দল কাঠ কিনে নিয়ে আসতে যায় ঐ অতো সকালে তাদের উনুনের জন্যে, সেইজন্যই ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই দোকানদার গিয়ে বসে তার দোকানে দাঁড়ি-পাল্লা ঠিক ক'রে!

কাজে ব্যস্ত ওরা, তার দিকে নজর দেবার সময় কই? স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই মুখে মাঝে মাঝে জ্বলছে চুট্টা (চুরুটের দেহাতী সংস্করণ); মেয়েদের কেউ কেউ ওকে দেখতে পেয়ে মুখ থেকে চট করে চুট্টা নামিয়ে ফেলে চুট্টা-সুদ্ধ হাতটা পিছনে সরিয়ে রাখছে, একটুক্ষণ কারুর দিকে চেয়ে থাকলেই দেখা যাবে পিছন থেকে উঠে আসছে সরু একটা ধোঁয়ার রেখা, আর মুখে একটা সলাজ হাসি। একটু যারা বয়স্ক, তাদের এ লজ্জা নেই, চুট্টা বড়জোর মুখ থেকে হাতে রাখছে, হয়ত বলছে, 'কী পণ্ডিত, এখানে যে?'

কিন্তু যত লজ্জা ঐ তরুণীদের। পুরুষরা নির্বিকার। ওদের পুরুষদের অথবা বাইরের অচেনা কারুর সামনে ওদের বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই, কিন্তু ওকে দেখলেই ওরা মুখের চুট্টা চট করে লুকিয়ে ফেলে। কারণ কী? সে নিজে খায় না বলে? কে জানে! এই তরুণী মেয়েরা হয়ত দেখেছে, সোমনাথের জাতের মেয়েরা কেউ কখনও ধূমপান করে না, মেয়েদের মুখে জ্বলন্ত চুট্টা দেখতে সেই জন্যই হয়ত

তাদের 'পণ্ডিত' অভ্যস্ত নয়, তাদের মুখে চুট্টা দেখলে তাদের অতি প্রিয় পণ্ডিত কী জানি কী ভাববে !

বর্ষিয়সী মেয়েদের মধ্যে অবশ্য এ সাবধানতা নেই ! হয়ত তাদের মনোভাব, এইটুকু ছেলের সামনে আবার লজ্জা কী ? পুরুষদের ত লজ্জা-সংকোচ সম্মান প্রদর্শন-বোধের বালাই-ই নেই। এটা দেখেছে সোমনাথ, এদের মধ্যে পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা স্বভাবতঃই বুদ্ধিমতী, কর্মঠ এবং পরিশ্রমী বেশী।

কিন্তু সে সব যাক, হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূর এগিয়ে এসেছে সোমনাথ। দলের মধ্যে বুড়ো নোকন্না কিংবা কোণ্ডা, ওদের ত দেখা যাচ্ছে না আজ ? কী হলো ওদের ? একটু এগিয়ে যেতেই সোমনাথ দেখল, একরাশ কাপড়ের সামনে বসে আছে লছমী, বুড়ো নোকন্না-সর্দারের মেয়ে। মাটিতে বিছানো শাড়ির ওপর কিছু কাচা কাপড় জড়ো করা। শাড়ি-ঘেরা ঘরে যথারীতি উনুন জ্বলছে, আর দুটো রঙীন কাপড়, শাড়িই হবে বোধ হয়, নদীর ধারে পাশাপাশি পাথরের উপর হেলায় পড়ে আছে। কাজ করতে করতে কে দুটি লোক হঠাৎ যেন কাজ ছেড়ে উঠে গেছে। তাকে দেখে নিভন্ত চুরুট মুখ থেকে টান দিয়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো লছমী। শাড়ি হাঁটুর ওপর পর্যন্ত তোলা, টান করে মালকোঁচার ভঙ্গিতে পরা। পায়ে দুটি রূপোর মল, সুগঠিত মসৃণ দুটি পদযুগলকে সপ্রেমে বেষ্টন করে পড়ে আছে। পরনে ছাপা শাড়ি, লাল-লাল বড়ো-বড়ো ফুলতোলা, গায়ে কালো রঙের ব্লাউজ। খোঁপায় বাসী ফুলের মালা জড়ানো ছিল, ফুলগুলি এতক্ষণে সব ঝরে গেছে, দু'একটা অবাঞ্ছিত ছিন্ন পাপড়ি নিয়ে একটা রিক্ত সাদা সুতো কালো চুলের ওপর পড়ে আছে শুধু।

এই শ্রমজীবি-সমাজের মেয়েদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—এদের সুগঠিত শরীর। হয়ত মুখশ্রী সুন্দর নয়, কিন্তু দেহশ্রী সুন্দর, রঙে নয়, সুষমায় এবং ছন্দে। ঘরের বাইরে প্রকৃতির অবারিত আঙিনায় এরা

কাজ করে, তাই প্রকৃতি এদের সাজিয়ে দেন অকৃপণ হস্তে। সোমনাথরা শৈব। কিন্তু গোদাবরীর অপর পারে কব্বুরে এক বৈষ্ণবের ঘরে গিয়েছিল সে একবার। সেখানে পুরীধাম থেকে আগত এক গায়কের মুখে সে শুনেছিল পূর্বদেশীয় কবি জয়দেবের গীত গোবিন্দম্-এর সুললিত সঙ্গীত-ঝংকার! সবটা মনে নেই, সামান্য মনে আছে—রাধিকাকে বলা হয়েছিল, গুরু জঘনভারে তুমি মন্থরগামিনী! যতদূর মনে পড়ে, বোধ হয় ব্যবহার করা হয়েছিল, 'অলসপীনজঘন' কথাটা। রাধা নাকি বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বৌ। সোমনাথ বড়োঘর বেশী দেখেনি, দেখেছে মধ্যবিত্ত সংসার। সেখানে হয়ত রূপ আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য নেই। 'জঘনভারে মন্থরগামিনী' যদি বলতে হয় ত সহজেই বলা চলে এই শ্রমজীবি মেয়েদের। এরা স্বভাবতঃ দীর্ঘাঙ্গিনীও বটে।

লছমী অপাঙ্গে একবার সোমনাথের দিকে তাকালো, কিন্তু কিছু বলল না। মেয়েটিকে চেনে সোমনাথ, একটু চুপচাপ এর ধরন, হয়ত একটু ভাবপ্রবণও। পঙ্গল বা পৌষ-সংক্রান্তির দিনে ফুলের মালা, দু-এক ছড়া কলা, দুটো নারকেল, এইসব একটা কাঁসার থালায় সাজিয়ে নিয়ে ওর বাবার সঙ্গে এসে প্রণাম করে গেছে নীরবে, কিছু বলেনি। হয়ত হাসিঠাট্টার কথায় মুখ নামিয়ে একটু হেসেছে, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। কতদিন গেলাসে করে গরম দুধ খাইয়ে গেছে, চা খাইয়ে গেছে, কিন্তু সব কাজই ওর কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে ভরা। হয়ত সোমনাথ জিজ্ঞাসা করেছে,—কী রে লছমী, হঠাৎ চা?

—আজকে চা করেছি। বাবা বলল তোমায় দিতে।

হয়ত অন্যদিন,—কী রে, হঠাৎ যে দুধ নিয়ে এলি?

—বাবা পাঠিয়েছে। গাঁয়ে গিয়েছিল, পাওনা দুধ নিয়ে এসেছে।

সোমনাথ হেসে বলেছিল,—সবই বুঝি বাবা পাঠায়?

উত্তর দেয়নি মেয়েটি, একটু হেসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

সত্যিই মেয়েটি একটু অন্যরকম, একটু দলছাড়া। সবকিছুর মধ্যে থেকেও যেন ও নেই। ওদের দূর থেকে একসঙ্গে দেখলে কার কী বৈশিষ্ট্য তা বোঝা মুশকিল, কিন্তু ওদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এলে, ওদের ব্যক্তিত্বকে চেনা যায়; জানা যায়,—সবাই একছাঁচে-ঢালা যন্ত্রবিশেষ নয়। 'শ্রমিক' নামের শীলমোহর ছেপে ওদের একদিকে ঠেলে ফেলে রেখে অনেক সময় শ্রমিক আন্দোলনের নামে ওদের ব্যক্তিত্বের অপমানই করা হয়, মূল্য দেওয়া হয় না!

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল,—লছমী, তুই একা? তোর বাবা, নোকন্না কই?

—শহরে গেছে।

—শহরে? এই এত সকালে?

—হ্যাঁ।

—কাজে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তুই একা?

মাথা নিচু করল লছমী, বলল,—না। কোণ্ডা আছে।

তার অসুখে যে সেবা করেছিল, এ সেই কোণ্ডার কথা বলছে লছমী। কোণ্ডার মা-বাপ নেই, তাদের একে একে হারিয়ে এখন একাই থাকে। সর্দার অর্থাৎ নোকন্নার খুব অনুগত। নোকন্নার বহু কাজকর্ম করে দেয়। ছেলেটা একটু বাউণ্ডুলে, একটু খেয়ালী গোছের। টাকা-পয়সা রোজগারের ঝোঁক নেই, তবে মাঝে মাঝে আবার হঠাৎ উপার্জনের চেষ্টা জাগে। হাতে পয়সা পড়লে জমানোর ধার ধারে না, সোজা শহরে যায়, উপর্যুপরি দু-তিনদিন সিনেমা দেখে সব খুইয়ে শেষে ফিরে আসে নিজের চালা ঘরে। সর্দারের খোশামোদ করে পয়সাকড়ি চায় না, ছুটি খেতে পেলেই খুশী। তখন কিছুদিন মাথা থেকে সিনেমা দেখার ভূত একেবারে নেমে যায়। সোমনাথের দরজার সামনেই ওর চালাঘর। কয়েকদিন তালাবন্ধ থাকে, আবার

খোলে। পরের কাজ ক'রে ক'রেই ওর দিন যায়। নিজে স্বাধীন ভাবে যে গৃহস্থবাড়ি গিয়ে কাপড় কাচার ব্যবস্থা করবে, সে বোধহয় ওর কুষ্ঠিতে লেখেনি। শহরে গিয়ে হয়ত কোনদিন হিন্দী ছবিও দেখে থাকবে। দুটো একটা হিন্দীকথা শিখে এসেছে। যেমন 'জমানা' আর 'ঠিক হ্যায়।' এ'দুটো কথা প্রায়ই ও শুনতে পায় কোণ্ডার মুখে। তার অসুখের সময় ওর 'ঠিক হ্যায়' শুনতে শুনতে সোমনাথের পাগল হয়ে যাবার উপক্রম। যেখানে সেখানে ও 'ঠিক হ্যায়' ব্যবহার ক'রে বসে। লছমীরা থাকে সোমনাথের একেবারে পাশেব বাড়িটাতে, প্রায়ই শুনতে পায় সোমনাথ ওদের বাড়ীতে কোণ্ডাব কণ্ঠস্বব। হয়ত লছমীর কাছে জোর পয়সার তাগিদ লাগিয়েছে। লছমীও দেবে না, ও'ও ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত কোণ্ডাবই হাব হয়, বলে,—জমানাই বদলে যাচ্ছে। নইলে লছমীও তাকে পয়সা দেয় না!

তাই কোণ্ডার কথা উঠতেই হাসি ফুটে ওঠে সোমনাথের মুখে। সত্যি, একটু পাগল-পাগলই বটে ছেলেটা। এই পাগলার সঙ্গে লছমীর একটা সম্পর্ক মনে মনে আন্দাজ করে রেখেছে সোমনাথ। ওবা দুটিতে প্রেমে পড়েছে বলে মনে হয় সোমনাথের, কিন্তু ঠিক বুঝতেও পারে না। কতদিন এ সত্যটি আবিষ্কাব কববাব চেষ্টা করেছে সোমনাথ, ওদেব দুজনকে একত্রে দেখে কতোভাবে কতো কী হাসির কথা তুলেছে, ওদেব সম্পর্কটাকে জড়িয়ে কতো ইঙ্গিত করেছে। কিন্তু কই, সেই চকিত-বিদ্যুৎ কই ওদের চোখে, কই সেই চোখে চোখে কথা বলার মধুব মুহূর্তটি! কোণ্ডার সামনে লছমীকে, অথবা লছমীর উপস্থিতিতে কোণ্ডাকে হঠাৎ ডেকে কতো-কী না-বলা বাণীর ইশারা জানতে চেয়েছে সোমনাথ, কিছুই পায়নি। তবে কি ওর অনুমান ভুল? তার জানালায় দাঁড়িয়ে লছমীদেব আঙিনা চোখে পড়ে। কতদিন চুপি চুপি ওদের দেখেছে সোমনাথ, কিন্তু কিছুই চোখে পড়েনি! হয়ত পয়সার তাগাদা করেছে কোণ্ডা উঠানে

দাঁড়িয়ে। নয়ত কোনদিন দাওয়ায় বসে ভাত খাচ্ছে চুপচাপ। লছমী ঘরের ভিতরে, আর ও' কেমন নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে ভাতের গ্রাস মুখে তুলছে,—খুঁটিতে মাথাটা ঠেস দেওয়া, চোখ সদর দরজা ছাড়িয়ে পথের ওপর গিয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা নির্জীব, অলস ভঙ্গী। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্র এসে পড়েছে উঠানে, বাড়ির নিঝুম একটিও পাতা-না-নড়া আম গাছটায় বসে একটা একক কাক মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে,—কঃ কঃ!···কোণ্ডা নিশ্চুপ। আশ্চর্য, ঘরের ভিতর থেকে চুড়ির রিনিঝিনিও কি শুনতে পায় না কোণ্ডা?

হয়ত ওদের প্রেমের ধরনটাই আলাদা। ঠিক বুঝতে পারেনা সোমনাথ। প্রেমকে ঘিরে একটু কল্পনা, একটু মনোরম চিন্তার মাধুর্য-রচনা, এসব হয়ত ওদের নেই। নেই? তাই বা কী করে ভাববে সোমনাথ? মানুষ ত ওরাও? অর্থনৈতিক কাঠামোই ওদের নিম্নবিত্ত করে রেখেছে, কিন্তু সেটা ত মানুষেরই সৃষ্টি। অথচ প্রেমদেবতার সৃষ্টি যে দুর্নিবার প্রবাহ মানুষের জীবনে ও মনে তরঙ্গ তোলে, সে'ক্ষেত্রে ত বিত্তের কোন প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন চিত্তের। এই চিত্ত কি ওদের নেই? নিশ্চয় আছে। প্রতিনিয়তই দেখছে সোমনাথ, কতো সামান্য কারণে ওরা খুশী হয়ে ওঠে, কতো সহজ ব্যাপার থেকেই ওরা আনন্দ পায়। বিয়োগান্ত কোন গল্প শুনতে শুনতে সহজেই ওদের চোখের কোণে অশ্রু ঘনিয়ে আসে!

নোকম্নাকে দু'একবার জিজ্ঞাসাও করেছে সোমনাথ,—কি হে সর্দার, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ কবে?

নোকম্না একটু হেসে জবাব দিয়েছে,—হবে পণ্ডিত, হবে।

—জামাই পাচ্ছ না বুঝি মনের মতো?

—জামাই! নোকম্না বলে,—জামাই হবার ইচ্ছা ত অনেকেরই পণ্ডিত। দেখা যাক্, দুটো দিন যাক্ আরও। মেয়ে আমার যা' তা' নয়! রূপে-গুণে সত্যিই লছমী!

কোণ্ডার কথায় সোমনাথকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে লছমী ততক্ষণে আবার নেমে গেছে জলের ধারে। একটি কাপড় পাথরের ওপর যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল, অপর কাপড়টি নিযে আছাড় দিতে লাগল লছমী সজোরে। সোমনাথও নেমে গেল জলের ধারে, স্পর্শ করল দেবকন্তা গোদাবরীর জল, তারপর একসময় প্রশ্ন করল লছমীকে।

কাজ থামিয়ে লছমী বলল,—কী পণ্ডিত?

—কোণ্ডা আছে বললি, কোণ্ডা কই?

মুখ টিপে একটু হাসল লছমী। ওদের মত তেমন পুরু নয় লছমীর ঠোঁট, বরং ওদের ঘরের মেয়েদের মতোই পাতলা, সুন্দর দেখায় যখন ও' মুখ টিপে হাসে। বলল,—কোণ্ডাকে খুঁজছ পণ্ডিত?

বলেই হাতের গোছাকরা কাপড়টা ছুঁড়ে দিল পাড়ের ওপর ধুলো আর কাদার মধ্যে, জল ছেড়ে মুহূর্তে উঠে এল ওপরে, আর যা' ও ভুলেও করে না, সোমনাথের হাত ধরে মারল এক ঝট্‌কা টান। বলল,—এসো তবে আমার সঙ্গে।

দাঁড়ালো না, একপ্রকার ছুটতে ছুটতেই চলতে লাগল সামনের দিকে, পাথরে হোঁচট খেলো দু'একবার, ভ্রূক্ষেপও নেই।

এদিকে পথটা একটু নিরিবিলি, পথচারীর সংখ্যা কম। তবু যে দু'তিনজন পথ চলছিল, তারাও চম্‌কে ফিরে তাকালো লছমীর দিকে, পাগলের মত কোথায় ছুটেছে মেয়েটা?

এত দ্রুত সোমনাথের পক্ষে চলা অসম্ভব। পাথরের আঘাত বাঁচিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হ'চ্ছে তাকে। কিন্তু, কোথায় লছমী? রজকদের আরও এক দম্পতি এদিকে এসে শাড়ির ঘর করেছে, পুরুষটির লক্ষ্য নেই, একমনে কাপড় আছাড় দিচ্ছে পাথরে, মুখে কেমন একটা শব্দ করছে—হেই—হেই। আচমকা শুনলে মনে হবে, কে যেন কাকে সাবধান করছে,—হেই-হেই! মেয়েটি একবার

তার দিকে তাকালো, আবার পরক্ষণেই মন দিল কাজে। ভঙ্গী দেখে মনে হল, যেন বলতে চায়,—পণ্ডিত, তুমি ঐ লছমীর পিছনে পিছনে কোথায় ছুটেছো, জানতে আমার যথেষ্ট কৌতূহল, কিন্তু দেখছ ত, হাতে সময় নেই, প্রচুর কাজ, সূর্য দেখতে দেখতে মাথার ওপর আসবেন !

যেতে যেতে সেই জল পাম্প করার মেসিন ঘরটার কাছে এসে পড়ল সোমনাথ। গম্বুজের মত উঁচুতে উঠে গেছে মেসিন-বাড়ীটা, এখানে থেকে পাম্প ক'রে জল যায় ঐ অদূরে শহরের মধ্যে কারখানা-টার ভিতরে। এটুকুই লোক চলাচলের সীমা, তারপরে মরা একটা নালা, নালার তীরে তীরে জন্মেছে বহু গাছ-গাছালি, তারপরে একটি টিলার মত,—একদিকে ধানের ক্ষেত, পতিত জমি, আরও উঁচু-নিচু টিলার ভিড়। দূরে একটি গ্রাম।

গম্বুজ ঘরটা পাশ কাটিয়ে একেবারে নালার ধারে এসে পড়ল সোমনাথ। ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে লছমী, তাকে পাশ কাটিয়ে দু'একটি রজক গোদাবরীর জলে নেমে যাচ্ছে, জল এখানে কম, হাঁটু জলের একটু বেশী, সেটা পার হয়ে তারা উঠছে গিয়ে চরে, সেই চরেও তৈরী হয়েছে কয়েকটি শাড়িঘর।

সে কাছে আসতেই নালার মধ্যে নেমে পড়ল লছমী, সামান্য জল কিন্তু পাঁক বেশী, ওপারে পৌঁছে সোমনাথকে জলে ধুয়ে নিতে হল পায়ের সেই পাঁক, লছমীর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই, তার পায়ের মল পর্যন্ত কাদায় মাখামাখি, সে সমানে চলেছে এগিয়ে টিলার দিকে। টিলা বেষ্টন করে সরু পায়ে-চলা-পথটা হঠাৎ বেঁকে নদীর দিকে সোজা নেমে গেছে, সেইখানে একটা প্রকাণ্ড পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল লছমী, সোমনাথ কাছে এলে মৃদুস্বরে বলল,—পণ্ডিত, কোণ্ডাকে খুঁজছিলে ? ঐ দেখ।

সত্যি, দেখবার মত দৃশ্যই বটে। একটি মেয়ে জলের ধারে ব'সে তার পরনের শাড়িটা কাচছে, আর অদূরে তার পিছনে একটা কালো

পাথরে ঠেস দিয়ে ব'সে কোণ্ডা তার কাপড়-কাচার রকম দেখে আপন-মনে হেসে উঠছে। কালো-কালো গোলগাল মেয়েটি, পরনে এখন শুধু সায়া আর ব্লাউজ, গায়ের শাড়িটা খুলে নিয়ে তাতে নদীর বালি-মাটি মাখিয়ে পাথরে থুবড়ে থুবড়ে কাচছে। তার পিছনে যে একটি ছেলে বসে হাসছে, সেদিকে নজর দেবার অবসর তার নেই। কোণ্ডা একটা ঢিল ছুঁড়ে ফেলল তার কাছে জলের ওপরে, মেয়েটি চম্‌কে একটুক্ষণ তাব কাজ থামালো। কিন্তু মুখ ফেরালো না, পরক্ষণেই কাজ করে যেতে লাগল একমনে। সোমনাথ বলল,—কে রে এই মেয়েটা ?

লছমী বলল,—জানি না।

মেয়েটির মাথায় একরাশ চুল জট্‌পাকানো, লালচে; কতকাল মাথায় তেল পড়েনি কে জানে! মেয়েটিকে কী নির্লজ্জা বলা যেতে পারে? তা নয়। তাদের দেশের মেয়েরা সায়ার মতো যেটা ব্যবহার করে, সেটা ঠিক সায়া নয়, ঘাঘরা। ঘাঘবার ওপরে যখন মেয়েরা শাড়ি পরে, সে' শাড়ি আকারে ছোট, সে' শাড়িটা বুকঢাকা আঁচলের মতোই ব্যবহৃত হয়, শাড়ির একপ্রান্ত শুধু সায়ার সঙ্গে (ওরা বলে 'নাঙ্গা') কোমরে গোঁজা থাকে। সোমনাথ একটু নেমে গেল তীরের দিকে, ডাকল,—কোণ্ডা ?

মুখ ফিরালো কোণ্ডা,—কে, পণ্ডিত ? ঠিক হ্যায়।

হো-হো ক'রে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো কোণ্ডা, বলল,—লছমী তোমাকে ডেকে এনেছে বুঝি ? জমানা বদল গিয়া! ডাকবে কেন, আমিই ত যেতুম! এদিকে যে এক কাণ্ড!

ব'লেই আবার হাসতে লাগল কোণ্ডা, বলল,—ও লছমী, তুই তখন এখানে এসে আবার চলে গেলি কেন? কাপড় কাচার রকম দেখলি না? আমি হেসে-হেসে মরি! বললাম,—আমায় দে' ছুঁড়ি, আমি কেচে দেই। তা' কী মুখনাড়া। বলে,—আমার কাপড় আমি কাচব, তুই কে ?

লছমী বলল,—আমি এবার যাই পণ্ডিত, তোমাকে ত সব দেখালাম,—বাবা এলে আমি বলব, তুমি সাক্ষী থেকো।

চকিতে লছমীর মুখের দিকে তাকায় সোমনাথ। এই কী তবে প্রেমের স্বরূপ? ঈর্ষার মধ্য দিয়ে এমনিভাবেই কি ভালবাসার ফুল ফুটে ওঠে?

—জমানা বদল গিয়া—সখেদে বলে ওঠে কোণ্ডা,—নইলে লছমী কিনা বাবার কাছে নালিশ করতে চায় আমার নামে! ও লছমী, দেখ্, সব কাজ আমি এখুনি সেরে দিচ্ছি,—আমার কাজ কেন, তোর কাজও সব আমি ক'রে দেবো। কিন্তু, লছমী?

লছমী সোজা চাইল ওর মুখের দিকে, বলল,—কী?

লছমীর কাছে একটু এগিয়ে এল কোণ্ডা, অনুনয়ের সুরে বলল,—দিবি ত?

—কী দেবো? পয়সা? ছাই দেবো তোকে!

—দেখ পণ্ডিত দেখ,—কোণ্ডা বলে ওঠে,—কথার ছিরি দেখ। আমার কতো পয়সা এই মেয়েটা নিয়েছে তা জানো!

কী!—লছমীর এই নতুন দৃপ্ত রূপ দেখে অবাক্ হ'য়ে যায় সোমনাথ; সেই নিরীহ শান্ত মেয়েটা এগিয়ে গিয়ে কোণ্ডার বুকে আচম্‌কা দেয় এক ধাক্কা, বলে,—যতো বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমি তোর পয়সা নিয়েছি! পয়সা দেয় কে তোকে? কাজ করিস্ অমনি-অমনি? খাস কোথায় দু'বেলা?

কোণ্ডাও হয়ত প্রস্তুত ছিল না লছমীর এই ব্যবহারের জন্য, ধাক্কাটা সামলে পিছিয়ে গেল দু'তিন পা, কিন্তু আশ্চর্য, রাগ করল না, একটু অপ্রতিভের মতো হাসতে লাগলো শুধু। বলল,—পণ্ডিত, কী শুনছ? আমার পয়সা ও' নেয় নি, আমিই নিয়েছি ওর ভাত! ঠিক হ্যায়!

লছমী বলল,—বেশ, বাবা আসুক, হয়ে যাক্ এর একটা হেস্তনেস্ত।

কোণ্ডা এগিয়ে এলো, বলল,—রাগ করিস্ কেন লছমী, আমি কী পয়সা চেয়েছি ?

—তবে, কী চেয়েছিস্ তুই ?

লছমীর কণ্ঠস্বর একটু নরম হওয়াতে যেন উৎসাহে জ্বলে উঠল কোণ্ডা, বলল,—সব কাজ তোর ক'রে দেবো লছমী, যত বেলা হয় হোক্। তুই দুটি বেশী ভাত দিস্ এবেলা, কেমন ? পয়সা-টয়সা চাই না। দেখ্, দিবি ত ?

লছমী একটু থেমে তারপর বলল,—ঐ মেয়েটার জন্য বুঝি ?

কোণ্ডা চট্ করে সরে এলো লছমীর কাছে, কেমন একটা চাপা ফিসফিসানির সুরে বলল,—আরে চুপ চুপ! শুনতে পেলে এখখুনি তিড়বিড় ক'রে উঠবে! নামটা কী জানিস্ ? নাগমণি। ওরে বাবা, কোন্ নাগের মাথার মণি, কে জানে!

বলে হঠাৎ আবার হো হো ক'রে হেসে ওঠে কোণ্ডা। লছমী ধমক দিয়ে বলে,—রাখ্ তোর পাগলামি! মণি দেখাতে এসেছে আমাকে!

তারপরে দুপদাপ ক'রে পা ফেলে এগিয়ে যায় লছমী মেয়েটার কাছে, বলে,—এই ?

মেয়েটার শাড়ি ধোওয়ার কাজ হয়ে গেছে, উঠে দাঁড়িয়েছে সে ততক্ষণে, ভেজা শাড়ির গোছাটা বুকের কাছে জড়ো ক'রে ধরা। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল সে নদীর দিকে মুখ ক'রে, পুরুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করেই এদিকে ফিরল না, শুধু ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে চোখ ফেলল লছমীর ওপরে, বলল,—কী ?

—কে তুই ?

মেয়েটি বোধহয় একটু হাসল, বলল,—শুনলে না ? নাগমণি আমার নাম।

—তা'ত বুঝলাম। তোর নাগ কই ?

এইবার খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি, বলল,—নেই। খুঁজতে বেরিয়েছি।

কোণ্ডা ওদের কথাব মধ্যে এক-পা এক-পা ক'রে কখন এগিয়ে গিয়েছিল ওদেব একেবারে কাছে,—পিছন থেকে ব'লে উঠল,—ঠিক হ্যায়।

বুকের ওপর ভিজে কাপড়টা জড়ো করা, মেয়েটা এবাব ফিরে দাঁড়ালো এদিকে মুখ ক'বে, বলল,—এই, সবে যা এখান থেকে।

লছমী ব'লে উঠল,—কেন, সববে কেন? পছন্দ হয় না নাগটিকে?

মেয়েটি হেসে উঠল এ' কথায়, বললে,—এ' আবাব নাগ নাকি? একে নাকি আবাব খুঁজতে হয়? এই-ই উল্টে আমায় খুঁজে বার কবেছে।

লছমীও তবল কণ্ঠে বলল, ঐ হ'ল, একই কথা! নে, এখন চল্।

—কোথায়?

—কেন, তোব নাগেব গর্তে?

মেয়েটি বলল,—সে' লোভ আমার আব নেই দিদি,—বেশ আছি বাইবে এসে।

লছমী বলল,—বেশ যে আছিস তা' ত দেখতেই পাচ্ছি। পেটে দানা পড়ে না ক'দিন?

ও লছমী,—ব'লে উঠল কোণ্ডা—দানাব কথা বলিস্ না, আমি এসে দেখি নদীতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল!

—হ্যাঁ যাচ্ছিল,—মেয়েটি বলে,—তোকে বলেছে।

—দেখ্ মিথ্যা বলিস্ না!—কোণ্ডা বলল,—হাত ধ'রে পিছন থেকে হ্যাঁচকা টান যদি না দিতুম, তবে ঠিক তুই ঝাঁপিয়ে পড়তিস্ জলে!

—আহা! মববার মতো জল তোদেব গোদাববীতে আব আছে কি না!

এই কথায় একটু চম্‌কে উঠল সোমনাথ। মেয়েটি হঠাৎ বলল কেন এই কথাটা? গোদাবরী কী এতই ক্ষীণ হয়ে গেছে! তাই যদি হয়, তবে তার মাকে কেমন ক'রে টেনে নিয়েছিল বুকে? না-না, এ পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়! কিন্তু সত্যই কী মেয়েটি জলে ঝাঁপ দিয়ে জুড়োতে চাইছিল সকল জ্বালা? কেন, কী এমন কষ্ট ওর? কী ওর দুঃখ? তবে কী তার দুঃখিনী মায়ের মতো ঐ মেয়েটিও ঐরকম লাঞ্ছিত হচ্ছিল সংসারে! রুক্ষ চুল, ছিন্ন মলিন বেশবাস,—মেয়েটির দিকে তাকাতে তাকাতে একটা অদ্ভুত স্নেহ আর কারুণ্যে ভ'রে গেল সোমনাথের মন,—নিজে অজ্ঞাতেই একটু একটু ক'রে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

মেয়েটি ওকে এত কাছে দেখে লজ্জায় জড়োসড়ো হ'য়ে উঠল মুহূর্তে। বুকের কাছে জড়ো-করা শাড়ির প্রান্তটুকু ছেড়ে দিলো,—ভিজে শাড়িটা পর্দার মতো লুটিয়ে পড়ল ওর পা পর্যন্ত। মেয়েটি মুখ নিচু করল। ওর সংকুচিত ভঙ্গী দেখে নিজেও একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়ল সোমনাথ,—এ' যেন তার সম্পুর্ণ অনধিকার-প্রবেশ। সত্যিই তাই, এতদিন ওদের মধ্যে সে আছে, এতদিন ধ'রে ওদের দেখেছে,—কিন্তু লছমীর হাত ধরে এ'যে আজ ওদের জীবনের একেবারে অন্দর-মহলে প্রবেশ করা! চমৎকার লাগছে ওদের এই লীলা,—কিন্তু ওরা কেন অতো সহজভাবে নিতে পারবে তাকে?

লছমী বলল,—কী রে নাগমণি, আমাদের পণ্ডিতকে দেখে লজ্জা পেলি নাকি? এই কোণ্ডা, দৌড়ে যা না, একটা শুকনো শাড়ি নিয়ে আয় ঘর থেকে, নইলে ও' যাবে কেমন ক'রে?

কোণ্ডা বলল,—ঠিক হ্যায়। এখনি যাচ্ছি। ঘরের চাবি দে?

সোমনাথ বলল,—দাঁড়া কোণ্ডা, আমিও যাব।

লছমী এগিয়ে এলো, বলল,—ও' যাবে কোথায় পণ্ডিত? থাক্ এখানে। ওর হাতে ঘরের চাবি দেবো না আরও কিছু? আমিই নিয়ে আসছি শাড়ি।

নাগমণি পিছন থেকে বলল,—দরকার নেই দিদি, শাড়ি আমি এখুনি শুকিয়ে নিচ্ছি। টান ক'রে দুজনে দুদিকে ধরলে এখনি শুকিয়ে যাবে।

লছমী চলতে চলতে ফিরে দাঁড়ালো, বলল,—মনে মনে ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিস বুঝি? তাই কর, দুজনে দুদিকে ধর, আমরা যাই। এসো পণ্ডিত।

কোণ্ডা চেঁচিয়ে বলল,—কিন্তু ভাতের কথা?

—ভাতের কথা তুই কবে ভাবিস্? আয় ওকে নিয়ে।

প্রথম দিকে জোরে জোরে চলতে আরম্ভ করলেও শেষে মন্থর হয়ে এলো লছমীর চলাব গতি, নালার কাছে এসে অকারণেই একটু হেসে উঠল সে, বলল,—পণ্ডিত?

—কী?

—ওদের দুটিতে জুড়ি মিলবে ভালো। দুটিই বুনো!

—জুড়ির কথা ভাবছিস্ কেন লছমী। মেয়েটা কে, কী রকম, সে-সব ত জানতে হবে!

—জানবে কোটলিঙ্গ-ঠাকুর। পণ্ডিত, ওদের দুটিকে একদিন নদীতে মন্ত্র পড়িয়ে স্নান করিয়ে দিও। স্নান ক'রে দুটিতে প্রণাম করুক কোটলিঙ্গ-শিবকে। ওদের ঢুকতে দেবে ত মন্দিরে, পণ্ডিত? বাবা বলছিল, নতুন আইন হয়েছে, মন্দিরের ভিতরে যেতে চাইলে ছোটজাত ব'লে আমাদের কেউ আর বাধা দিতে পারবে না।

সত্যিই লছমীর এ' এক নতুন মূর্তি! সেই শান্ত চুপচাপ মেয়েটা আজ অনর্গল কথা ব'লে চলেছে। কোণ্ডাকে ও' ভালোই বাসে, আজ ঈর্ষার কাঁটায় ফুটে বেদনা ঝ'রে পড়ছে সেই পরম প্রেম-পুষ্পটি থেকে! হয়ত সোমনাথের মতো এ' প্রেম আজ ওরও এই নতুন আবিষ্কার। সেই আবিষ্কারের মধুর আনন্দেই ভ'রে উঠেছে মন, সেই মধুরতার স্পর্শেই আজ ও' মুহূর্তে উদার, কোমল, স্নেহময়ী হয়ে উঠল

ঐ মেয়েটির ওপরে। কিন্তু, কে এই নাগমণি, ওর কথা সব ভালো ক'রে জানতে হবে সোমনাথের।

—লছমী ?

—কী পণ্ডিত ?

—তুই জানিস না মেয়েটি কে ?

—এই ত জানলাম। নাগমণি ওর নাম।

—কোণ্ডা ওকে দেখতে পেল কী ক'রে ?

এ' কথায় একটু হেসে উঠল লছমী, বলল,—ও' পাগলটার কথা বোলো না পণ্ডিত, ওর চোখ পড়ে সব দিকে। ভোরে উঠে কাজ করতে এলো, কিছুক্ষণ পরেই উঠে গেল কাজ ছেড়ে, বলল, আমি মাঠ থেকে ঘুরে আসছি, লছমী।...আসছে ত আসছেই, আর দেখা নেই ওর। দেরি দেখে আমিই গেলাম ওকে খুঁজতে মাঠের দিকে। মাঠে নেই, ও' দেখি টিলার কাছে, মেয়েটার সঙ্গে কী আবোল-তাবোল বকছে! প্রকাণ্ড নাকি ওর বাড়ি, অনেক পয়সা, যখন-তখন সিনেমায় যায়, রেল গাড়িতে চড়েছে একবাব—এইসব যতো চালবাজের কথা। ডাকলাম,—কোণ্ডা ? কাজ করতে হবে না ?

ব'লে বসল, করব না! তোর কী ?

রাগে সর্বশরীব কাঁপতে লাগল পণ্ডিত, ছুটে চলে এলাম। অনায়াসে মুখের ওপর বলল কিনা, কাজ করব না! ভাবলাম, আসুক বাবা শহর থেকে, ওকে শাস্তি দিতে না পারি ত সর্দারের মেয়েই নই,...এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল, বাবা কখন আসবে কে জানে! তোমাকে তখন হঠাৎ দেখতে পেয়ে ভাবলাম, ঠিক হয়েছে, তোমাকেই নিয়ে যাই, তোমাকে ও' মানে, ঘাড় ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে নিয়ে আসি গর্দভটাকে! কিন্তু পণ্ডিত, পারলাম না, মেয়েটাকে দেখে সমস্ত রাগ জল হয়ে গেল! ছেঁড়া শাড়ি, ছেঁড়া জামা, আর কেমন ছেলেমানুষের মতো তাকানোর ভঙ্গি! বড়ো মায়া হল! আজ ঐ মেয়েটির জন্যই বেঁচে গেল কোণ্ডা, নইলে

ওকে আমি কান ধরে তোমার পায়ের কাছে ওঠবোস করাতাম পণ্ডিত।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা ততক্ষণে সেই রজক-দম্পতির কাছে ফিরে এসেছে। পুরুষটি তখনও একমনে কাপড় আছড়াচ্ছে, আর মুখে উচ্চারণ করছে যেন সাবধান বাণী—হেই—হেই!

মেয়েটি ঠিক আগের মতই তাকালো ওদের দিকে, সামান্য একটু যেন ভ্রূ কুঞ্চিত হলো, তারপর আবার দিলো কাজে মন। যেন বলতে চাইল, পণ্ডিত আর লছমী মিলে কী যেন একটা কাণ্ড করছে আজ, বড়ো জানতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু উপায় নেই, হাতের কাজ সেরে ফেলতে হবে, সময় কই?

ক্রমে ক্রমে তার নিজের শাড়ির ঘরে ফিরে এলো লছমী, উনুনে হাঁড়িটা টগবগ করে ফুটছে, সন্তর্পণে নামিয়ে ফেলল হাঁড়িটা, যতটুকু হবার তার চেয়ে বেশী সিদ্ধ হয়ে গেছে কাপড়, ধরে যায় নি ত? না, ঠিক আছে। পড়ে আছে কাপড়েব স্তূপ, সূর্য ওদিকে অনেকটা ওপরে উঠে গেছেন। এত কাজ এক বেলার মধ্যে ক'রে ওঠা কী একা লছমীর পক্ষে সম্ভব? তবু, জলের ধারে নেমে গেল লছমী, সেই ধুলো-কাদায়-ছুঁড়েফেলা শাড়িটা এলোমেলো হয়ে প'ড়ে আছে, শাড়িটার গোছা তুলে নিলো হাতে।

সোমনাথ দাঁড়িয়ে পড়েছিল ওর কাছে, বলল,—আমি যাই?

মুখ তুলল লছমী, কোনো কথা বলল না, শুধু মুখখানা একটু কাত করে জানালো, যাও।

সব চঞ্চলতা মিলিয়ে গিয়ে আবার সেই ঔদাসীন্য আর প্রশান্তি যেন ফিরে এসেছে লছমীর মনে। সোমনাথ সরে গেল। এরপর সেই ভাঙা ঘাট, ঘাট বেয়ে উঁচুতে বাঁধের ওপর উঠে ধীর পায়ে চলে যাবে তার ঘরে।

ঘাটে লোক নেই এখন। ওপরের চাতালে দুটি ব্রাহ্মণ বসে জটলা করছেন, আর সবাই কোটলিঙ্গ-শিবের মন্দিরে, ঢং ঢং করে ঘন্টা

বেজে উঠছে মাঝে মাঝে, মন্দির ছাড়িয়ে পথের ওপর দিয়ে একটু এগিয়ে গেল সোমনাথ। সামনে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় বাঁধানো বেদী—বেদীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অশ্বত্থ বৃক্ষের গোড়ায় কমণ্ডলুর জল ঢালছেন একটি মহিলা, স্নান করে উঠেছেন, পরনের কাপড় ভিজে। মধ্যবয়সী হবেন। জল দিচ্ছেন আর উচ্চারণ করছেন জলদানের মন্ত্র,—চক্ষুস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনম্। শত্রুনাশঞ্চ সমুত্থান-মশ্বত্থ শময়াশু মে। অশ্বত্থরূপী ভগবান!···

মন্ত্রের মধ্যেই তাঁর চোখ পড়ল সোমনাথের ওপরে, বললেন,—কে সোমনাথ?

মধ্যবয়সী মহিলাটিকে চিনেছে সোমনাথ, পার্বতী আম্মা, অর্থাৎ পার্বতী-মা। ইনিই ওর অসুখের সময় ওকে গিয়ে দুধ বার্লি খাইয়ে আসতেন। কিন্তু ইনি ত বেশ কিছুদিন হ'ল এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন! আবার এলেন কবে?

—কাল এসেছি বাবা। নাসিক-তীর্থ ঘুরে এলাম। সে-ও গোদাবরীর তীর। দাঁড়াও বাবা, তোমার সঙ্গে যাব, প্রণামটা সেরে নেই। বলে শুরু করলেন—নমঃ অশ্বত্থ ব্রহ্মরূপোঽসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ·· তার পরে সোমনাথ, কেমন আছ? আর অসুখবিসুখে পড়োনি ত?

—না!

—যাক্, ভালই খবর তাহলে তোমার! তোমার ঐ রোগ-টোগের কথা মিথ্যা বাবা, আমি জানি। কিন্তু বলার উপায় নেই। আর বললে আমার কথা বিশ্বাসই বা করছে কে? আসল কথাটা আমি জানি। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিন্তু বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলাম। কেমন আছে কৃষ্ণবেণী?

কৃষ্ণবেণী তার নতুন মায়ের নাম। বলল—তাতো জানি না। বোধ হয় ভালই আছেন।

—তোমার বোন?

—ভালই আছে বোধ হয়।

—যাও না বুঝি বাড়িতে?

—না।

পার্বতী-মা চলতে চলতে এবারে একটু থামলেন,—ভালই করেছ না গিয়ে। চুপি চুপি তোমাকে বলি,—মেয়েটা ভাল নয়। রূপের দেমাকেই গেলেন, সেই গল্প জানো ত? সেই চিত্রাঙ্গীর গল্প?

সোমনাথ জানে, ইনি কথা আরম্ভ করলে আর রক্ষে নেই, কী যে বকবক করতে পারেন! অথচ স্নেহ আছে তার ওপর, এটা সে বেশ বোঝে। বলল,—পার্বতী-মা, আজ গল্প থাক্, আরেক দিন শুনব। একটু কাজ আছে।

—কাজ? কী কাজ? কাজকর্ম ধরেছ না কি?

—না, না, সে-সব কিছু নয়, এমনি, মানে সকাল থেকে ঘুরছি, এখন বাসায় যাই।

পার্বতী-মা বললেন,—আচ্ছা যাও। সেই বাসাতেই আছো ত?

—হ্যাঁ!

পার্বতী-মাকে গলির মোড়ে রেখে হনহন করে এগিয়ে গেল সোমনাথ। আরেকটি অদ্ভুত চরিত্র এই পার্বতী-মা। ইনি নাকি আজীবন কুমারী। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে সে এঁকে। ব্রাহ্মণ-কন্যা, এই পাড়ারই বহু দিনের লোক। আত্মীয়স্বজন সব মরে-হেজে ইনিই একা বেঁচে আছেন ওঁর বংশের। একখানা পাকা-বাড়ি ঐ গলির মধ্যে। লোকে বলে, প্রচুর টাকা। সোমনাথ তা বুঝতে পারে না। তবে একটা কথা বহুদিন থেকে সে শুনে আসছে। তার বাবাকে আর এঁকে জড়িয়ে কুৎসা-কাহিনী। বিশ্বাস করে না সোমনাথ,—এ' সব নিশ্চয়ই দুষ্ট লোকের রটনা। তবে, বাবাকে মহিলাটি খুব ভক্তি করেন, শ্রদ্ধা করেন, এটা সে দেখেছে।

বাসায় পৌঁছল সোমনাথ। রাস্তা থেকেই অপরিসর সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে—তার ঘরের দুয়ারে, নিচের ভাড়াটের সঙ্গে কোন যোগই

নেই। তার ভাড়াটে দুটি, একজন থাকেন একা,—ছোট খাটো ঠিকাদারী করেন,—নাম মাধব রাও। অপর জন স্ত্রী ও ছোট-ছোট তিনটি শিশু নিয়ে বাস করেন, জাতে রজক হলেও ব্যবসা করেন না রজকের, করেন চাকরি,—তাই নোকম্মাদের সঙ্গে মেশেন না,—এদিকে অর্থনৈতিক চাপে নাভিশ্বাস উঠলেও নাক উঁচু করে চলেন। একটু-আধটু জুয়ার ঝোঁক আছে। কিন্তু এদের কথা নয়, সোমনাথের সারা মন জুড়ে বিরাজ করছে আজ লছমী, কোণ্ডা আর নাগমণি।

ঘবেব কোণে কুকারে রান্না চড়িয়ে দিয়ে তার খাটিয়ায় এসে বসে সোমনাথ। তৈজসপত্র তাব সামান্যই। ছোট ঘর, ঘবেব সামনে ছাদ থাকায় খানিকটা খোলা মনে হয়। ছাদের একটা কোণ দরমা দিয়ে ঘেরা। পাকা কোঠা, কিন্তু টালির ছাদ। বাবা বাড়িটা পেয়েছিলো মন্দ নয়। অনেক কৌশল করে নাকি পাওয়া। বন্ধকী বাড়ি—বাড়ির মালিক টাকা শোধ করতে পারেনি; শেষে এই বাড়িটাই দিয়ে দিয়েছে বাবাকে।

ভীষণ গরম। দরজা জানালা সব বন্ধ করে থাকতে হবে। তাতেও কী ঠাণ্ডা হয়? টালি তেতে আগুনে সিদ্ধ হবার যোগাড়। খালি-মেঝের ওপর গড়াগড়ি দিয়েও শান্তি নেই। এইভাবে গ্রীষ্মেব মধ্যাহ্ন-যাপন। চল্লিশ টাকার জীবন কষ্টেসৃষ্টে কেটে যাচ্ছে একরকম—নিষ্ক্রিয়ভাবে। আর কোনো মাস্টারী জোটে কি না সে' চেষ্টা যে সোমনাথ করেনি এমন নয়, কিন্তু জোটেনি। আর এ' নিয়ে আজকাল বাবুদের দরজায় ঘুরতেও ভালো লাগে না। লাইব্রেরীতে গিয়ে বই নিয়ে বসাও ছাড়তে হয়েছে তাকে। বই নিয়ে বসলে পরিচিতদের সন্দেহাকুল দৃষ্টি এমনভাবে তার ওপর এসে পড়ে যে রীতিমত

অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সোমনাথ! ক্ষয়রোগ! সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজেই ধরেছে ক্ষয়রোগ। অর্থনৈতিক চাপে সমস্ত সমাজটাই দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে, নামতে নামতে আঁকড়ে ধরে আছে নিমজ্জমান ব্যক্তির ভাসমান কুটোটুকু ধরার মতো কতকগুলি অন্ধ কুসংস্কার, আর চিরাচরিত অভ্যাস। তার চেয়ে ভেঙেই যাক এই বুদ্ধিজীবী সমাজের কঙ্কাল। শ্রমকেন্দ্রিক সমাজ গড়ে উঠুক,—নতুন করে ভাবতে শিখুক মানুষ,—নতুন করে গড়তে শিখুক।

খাওয়া দাওয়া ক'রে শুয়েছে সোমনাথ, একটু পরেই খুটখাট শব্দ শুনতে পেলো লছমীদের উঠানে। ফিরে এলো না কি ওরা? উঠে জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সোমনাথ। লছমী উনুনে রান্না চাপিয়েছে,—কাঠ কেটে দিচ্ছে উনুনে; উনুন মানে তিনটে পাথরের ওপর মাটির প্রলেপ দেওয়া। রান্না-বান্নার আয়োজন ওদের সব উঠানে। এদের তবু উঠান আছে, ওদের জাতের অন্য অনেকেরই সম্বল ওদের গলি, গলির পাশে কারুর বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে কারুর বেড়ার ধারে সব উনুন পাতা,—ধোঁয়া লেগে লেগে দেয়ালগুলি জায়গায় জায়গায় কালো হয়ে আছে। ওদের যাযাবরী মানসিকতার এ' এক অদ্ভুত বহিঃপ্রকাশ!

সোমনাথ জানালা থেকেই হাঁক দিলো—লছমী?

মুখ তুলল লছমী, ঠোঁটের কোণে সেই অভ্যস্ত হাসিটুকু, বলল—কী?

—ওরা কোথায়—কোণ্ডা আর নাগমণি?

—কাপড় কাচছে।

—কাপড় কাচছে?

—হ্যাঁ। আমাকে কোণ্ডা বলল, তুই যা, আমরা সব কাজ শেষ ক'রে নিচ্ছি।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল—নাগমণি?

—নাগমণিও, কোণ্ডা ওকে শেখাচ্ছে।

—সে কি রে?

—হ্যাঁ পণ্ডিত—লছমী বলল—আজ কাজ যা হবে, তা বুঝতেই পারছি,—সারাদিন ধরে শেখানোর পালাই চলবে।

হেসে উঠল সোমনাথ,—তবে ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এলি কেন কাজ?

—দিলাম।

—তাই বলছি, দিলি কেন? নোকন্না ফিবে এসে রাগ করবে না?

লছমী হেসে বলল,—রাগ? বাবা করবে রাগ কোণ্ডার ওপরে! সূর্য সেদিন পশ্চিমে উঠবেন! বাবার আশকারা পেয়েই ত ওর এত বাড়! পণ্ডিত, এবাব তুমি জানালা বন্ধ করো, গন্ধ যাবে, আমি এখন মাছ পোড়া দেবো উনুনে।

তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ ক'বে দেয় সোমনাথ। সে নিজে নিরামিষাশী,—তার ওপব এ' পোড়া মাছের বিট্‌কেল গন্ধ নাকে এলে বমি আসে। জানালা বন্ধ করলেই কি গন্ধ থেকে একেবারে পাব পাওয়া যাবে? আজকাল তবু একটু সয়ে এসেছে,—আগে-আগে মাছ পোড়া গন্ধে মনে হ'তো, কে টি`কবে বাসায়? বলার কিছু নেই, এই ওদেব খাদ্য। অবশ্য সব দিনই ওরা মাছ পোড়ায় না! তেঁতুলেব ঝোল, ডাল, একটা বেগুন কি কুঁদবীর তরকারী, এবং তার ওপবে যদি জোটে একটু ঘোল,—ব্যস্, রাজার খাওয়া হলো ওদের সেদিন!

জানালা বন্ধ ক'বে সবে এলো সোমনাথ খাটিয়ার কাছে। এ'ভাবে জানালা থেকে লছমীকে ডেকে কথা কওয়া নতুন নয়,—ওদের জাতের লোকেরা কতদিন তাকে দেখেছে এ'ভাবে কথা কইতে,—কিন্তু কেউ এ' ব্যাপার নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় না। হ'তো যদি এ' ব্যাপারটা তাদের জাতেব মধ্যে,—এতক্ষণে কুৎসায় লকলক ক'রে উঠত আবাল-

বৃদ্ধবনিতার লোলুপ রসনা! আজ লছমী তার হাত ধ'রে টান দিয়েছে,—এ'টা যদি ওদের কারুর চোখে পড়ে থাকে ত, আর র'ক্ষে নেই! সেই বাংলাদেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণ কবি আর রজকিনীর প্রেম-পর্বের আধুনিক সংস্করণ আবিষ্কার করে বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন তাঁরা,—এ' বিষয়ে আর সন্দেহ কী?

মেঝের ওপর বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে সোমনাথ। হাতে হাত-পাখাটা চলতে থাকে। কর্মহীন জীবন। স্কুলের সেই কচি কচি ছাত্রদের মনে পড়ে। সোমনাথকে তারা পছন্দ করত,—তার ক্লাসে কোন গোলমাল কোনদিন হয়নি। তাকে স্কুল থেকে জবাব দেবার পরও ছেলেদের কেউ কেউ এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু আজকাল আর কেউ আসে না। এ তার সেই ক্ষয়রোগ প্রচারেরই ফল। ছেলেদের দোষ দেওয়া চলে না।

আস্তে আস্তে হাতের হাত-পাখাটা এক সময় মাটিতে এসে ঠক্ করে থামে—আপনার মনে কল্পনার জাল বুনতে বুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে সোমনাথ। ঘুমের মধ্যেও হয়ত চলে সেই স্বপ্নের জাল-রচনা। এক সময় মনে হয়, মা তার শিয়রে এসে তেমনি আদরের স্বরে ডাক দেয়—সোমা, সোমলু!

ধড়মড় করে জেগে ওঠে সোমনাথ,—মনে হয়, সত্যিই বুঝি মা এসে দাঁড়িয়েছে তার ঘরে, সত্যিই তেমনি আদর করে ডাকছে—সোমা, সোমলু!

ইস্, বেলা যে একেবারে পড়ে এসেছে। না, মা নয়, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লছমী। নীল একটা শাড়ি পরেছে, খোঁপায় ফুল, হাসি-হাসি মুখে বলছে তাকে,—কী পণ্ডিত, এত ঘুম কেন আজ? এই নাও, বাবা তোমার জন্যে একটু কফি পাঠিয়ে দিয়েছে, খেয়ে নাও।

লজ্জিত ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়ায় সোমনাথ, বলে,—আয় মা লছমী, বাইরে কেন? ভিতরে আয়।

—না পণ্ডিত, লছমী বলে—আমি ভিতরে যাব না, তুমি বরং বাইরে এসো, দেখ, কাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি।

—কে রে ?

বাইরে আসামাত্রই নাগমণি লছমীর গা ঘেঁষে নিজেকে যতটুকু লুকানো যায়, ততটুকু লুকোবার চেষ্টা করে। টকটকে লাল শাড়ি বুঝি ওকে পরিয়েছে লছমী, মাথার চুলে তেল ঢেলে একটা বেণীও দিয়েছে বেঁধে। এ' একেবারে অন্যরূপ নাগমণির। সমস্ত বন্যতা ঢেকে গিয়ে একটা স্নিগ্ধশ্রী ফুটে উঠেছে। সোমনাথ বলল,—দাঁড়া, মুখটা ধুয়ে আসি।

তার দরমা-ঘেরা চাতালটা থেকে ঘুরে এসে লছমীর হাত থেকে টেনে নেয় কফির পাত্রটা, ব'সে পড়ে চৌকাটের উপর, বলে,—মাদুর দেই, তোরা বোস্ না লছমী ?

লছমী হেসে বলে,—আমার অনেক কাজ। বসলে চলবে কেন ? কোণ্ডা আর বাবা গেছে শুকনো কাপড়ের রাশি তুলে আনতে। তুমি ত ঘুমিয়ে পড়লে পণ্ডিত, আমি ওদের খাইয়ে দাইয়ে আবার গেলাম না নদীর ধারে, ওদের কাচা কাপড়গুলি মেলে দিতে। এখুনি ওরা নিয়ে আসবে কাচা কাপড়, ইস্ত্রি করতে হবে, গৃহস্থবাড়ি যেতে হবে,—এমনিতেই ত দেরি হ'য়ে যায়। গৃহস্থরা রাগ করবে না দেরী করলে ? তার চেয়ে, নাগমণি, তুই বোস্, পণ্ডিতের সঙ্গে গল্প কর্, আমি আসছি।

প্রস্থানোদ্যত লছমীর শাড়ির আঁচলটা চট্ ক'রে চেপে ধরে নাগমণি, লজ্জা-বিজড়িত কণ্ঠে বলে,—না।

—না ?—হেসে ফেলে লছমী, এখন না কেন ? এই ত বায়না ধরলি, আমার সঙ্গে আসবি, পণ্ডিতকে দেখবি, বড়ো ভালো লেগেছে তোর পণ্ডিতকে, আরও কতো কী ! এখন লজ্জা কেন ?

—ধ্যেৎ !—বলেই ওর আঁচলটা ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেল নাগমণি সিঁড়ির দিকে, তরতর ক'রে নেমে গেল নিচে। এদিকে, ওর মতো

মেয়ের এই অহেতুক লজ্জার বহর দেখে হেসে আকুল হ'য়ে উঠল লছমী। তারপর একসময় হাসি থামিয়ে বলল,—সত্যি পণ্ডিত, তোমাকে দেখবার ওর কী ঝোঁক!

—কেন?

—কে জানে!

—আমার কথা কী বলেছিস্ ওকে লছমী?

—কিছুই না। ও' বলল, ঐ লোকটি কে? বললাম,—আমাদের বন্ধু। বলল,—বন্ধু? ও লোকটা ব্রাহ্মণ না?

বললাম,—হ্যাঁ। ব্রাহ্মণ কী বন্ধু হতে নেই? আর কিছু বলল না। শুধু, আমি যখন কফি নিয়ে আসছি, বলল,—চল্ লছমী তোদের বন্ধুকে দেখব।

এইভাবে একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলতে বলতে লছমী হঠাৎ থেমে গেল। সোমনাথও চুপচাপ।

স্বাদটা সত্যিই নতুন,—কম-কথা-বলা মেয়েটার হৃদয়ের অর্গল আজ খুলে গেছে যেন একটা দমকা হাওয়ায়। সোমনাথ উপলক্ষ্য মাত্র—লছমীর এ কলকাকলী, এ যেন তার নিজেরই জন্য,—নানান্ সুরের ভাবনাটাকে বাজিয়ে নিজের অশান্ত চিত্তটাকে মোহমুগ্ধ ক'রে রাখার প্রয়াস।

বন্ধু! সোমনাথ লছমীর বন্ধুই বটে,—এ' এক অদ্ভুত বন্ধুত্ব! ঠাণ্ডা-হয়ে-যাওয়া বাকি কফিটুকু এক চুমুকে শেষ করে গেলাসটা লছমীর হাতে তুলে দিলো সোমনাথ। বলল,—লছমী?

—কী?

—কী ঠিক করলি নাগমণি-সম্পর্কে?

একটুক্ষণ চুপ করে রইল লছমী, তারপরে বলল,—ও' আমার কাছে থাকবে পণ্ডিত।

—থাকবে! রাজী হয়েছে?

—হয়েছে।

—তোর বাবা? নোকন্না রাগ করেনি ওকে যে রাখছিস্, সে কথা শুনে?

—রাগ!—লছমী একটু হাসল,—বাবা আরও খুশী। ঘরে একজন লোক বাড়ল। কাপড়-কাচার কাজ করা যাবে আরও বেশী। বাবা ত হিসেবী মানুষ,—ওকে দেখেই তার হিসেব কষা শুরু হয়ে গেছে!

—বটে! এতদূর!—হেসে উঠল সোমনাথ, বলল,—নোকন্নার বুদ্ধি আছে বলতে হবে। কিন্তু লছমী, মেয়েটি কে, কোথা থেকে এসেছে, সে-সব খোঁজ কিছু পেলি?

—পেয়েছি।

—পেয়েছিস্? তোদের জাতের ত?

—না পণ্ডিত, আমাদের জাত একেবারেই নয়। কিন্তু তাতে কী? ওকে একজাত করে নেবো।

কী করে?

লছমী এবারে আবার হাসল একটু মুখ টিপে, বলল,—কী করে? ওর বিয়ে দেবো আমাদের কোণ্ডার সঙ্গে। দুটিতে মিলও হবে চমৎকার, কী বল্লো পণ্ডিত?

বিয়ের কথায় লছমীর চোখের দিকে তাকালো সোমনাথ,—কৌতুকে উজ্জ্বল দুটি চোখ। একটুও বেদনার ছায়া কী চোখের কোনে টলমল করছে না? সত্যিই কী লছমী এমনি হাসিমুখে তুলে দিতে পারবে নাগমণিকে কোণ্ডার হাতে?

—কী ভাবছ পণ্ডিত?

—ভাবছি?—সোমনাথ একটুক্ষণ থেমে আবার হাসি টেনে আনল ঠোঁটের কোণে, বলল—ভাবছি তোদের জাতের কথা। নিচু-জাত উঁচু-জাতের কথা তুললি না? এখন কতদূর কী হয়েছে জানি না, পূর্বদেশে তোদের জাতকে খুব নিচু বলে ধ'রে থাকে, বইতে পড়েছি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। এমন কি ভোরবেলা উঠে তোদের মুখ দেখলে ওদেশে উঁচু জাতেরা সেটাকে অশুভ মনে করত। এখানে যখন-তখন তোরা ব্রাহ্মণের ঘরে ঢুকে পড়িস্,—সেখানে এটি চলত না! বিয়ে-টিয়ের মতো শুভকাজে নাপিতদের সঙ্গে এখানে তোদেরও ডাক পড়ে, ওদেশে কিন্তু পড়ে না।

লছমী বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে থাকে শুধু, কিছু বলে না। সোমনাথ ওর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে,—তাই ত বলি লছমী,—এই জাত-জাত করা তোরা ছাড়বি কবে ? কিন্তু থাক্ এসব কথা এখন,—নাগমণির কথাই বল্। কে ও' মেয়েটি ? নদীতে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তরে লছমী কিছু বলবার আগেই সিঁড়ির কাছ থেকে ভেসে এলো নাগমণির কণ্ঠস্বর,—আত্মহত্যা কে বলল ? আমি ত স্নান করতে যাচ্ছিলাম।

সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল লছমী,—অ্যাঁ! ঐখানে লুকিয়ে থেকে সব কথা শোনা হচ্ছিল মেয়ের! এদিকে উঠে আয় শিগ্‌গির—আয় ?

পায়ে-পায়ে উঠে এলো নাগমণি, ছাদে পা দিয়েই দৌড়ে এলো লছমীর কাছে, আগের মতোই ওর আড়ালে তেমনি ক'রে লুকিয়ে দাঁড়াল। লছমী ওকে ঠেলা দিয়ে বলল,—এই, বল্‌না পণ্ডিতকে তোর কথা।

—না।

—আহা! খুব যে লজ্জা দেখছি!—লছমী আবার হেসে উঠল, বলল,—শোনো পণ্ডিত—ও' নাকি জলে ঝাঁপ দিয়ে স্নান করতে যাচ্ছিল, আর কিছু না।

নাগমণি বলল,—না-ই ত! আত্মহত্যা করতে যাবো কোন্ দুঃখে!

—শুনলে ত পণ্ডিত! লছমী বলল,—আত্মহত্যা করতে যাবে ও' কোন্ দুঃখে! দুঃখটা কী! মা নেই, বাপ আছে—আর আছে ভাই-বোন, ঘরে সৎমা। খুব গরীব অবস্থা, জনমজুরি করে খায়। বুঝলে? দুঃখটা কী?

নাগমণি কাহিনীর খেই ধরিয়ে দেয়, বলে,—আমি ত চাকরি করতাম!

লছমী মুখ টিপে আবার হাসে, বলে,—ঠিক। চাকরি করত। রোজ বারো আনা। ইঁট বইত মাথায়।

বাধা দেয় নাগমণি, বলে,—ইঁট নয়—মামুলী ইঁট নয় সেগুলি!

—না পণ্ডিত, আমিই ভুল বলেছি, মামুলী ইঁট নয় সেগুলি,—লছমী বলে,—ইঁটের চেয়ে বড়ো আর ইঁটের চেয়ে ভারী। তাই না, নাগমণি?

—হ্যাঁ। সিমেণ্টের তৈরী। ছাঁচে-তোলা।

বুঝতে পারে সোমনাথ। নতুন কলোনী হচ্ছে সারঙ্গধারার পথের ধারে, ঠিকাদারেরা নতুন ধরনের বাড়ি তৈরি করছে! সিমেণ্টের তৈরী ফাঁপা ইঁট। এ অঞ্চলে ইঁটের যা দাম, সে অনুপাতে এতে খরচ নাকি কম হয়, বাড়ি হয় মজবুত,—আর সব থেকে বড়ো কথা,—গ্রীষ্মকালে ঘরগুলি লাগে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, শীতকালে গরম।···কিন্তু এসব তথ্যের আপাততঃ প্রয়োজন নেই। সোমনাথ উপভোগ করে ওদের কথা-কাটাকাটির ধরন। হাসিমুখে বলে,—তারপর?

লছমী বললে,—তারপর আর কী? ডানপিটে মেয়ে ত? একে ধরে, তাকে মারে, ঝগড়া করে গাঁয়ের প্রত্যেকের সঙ্গে। সৎমার সঙ্গে চুলোচুলি ক'রে তার চুলই ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে একমুঠো।

নাগমণি যুগিয়ে দেয়,—সৎমা ভীষণ খারাপ লোক!

লছমী বলে,—সে আর বলতে! সৎমারা চিরদিনই খারাপ লোক! কোণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিস্, একথা ও-ই বলবে 'খন।

সোমনাথের মনে ভেসে যায় তার নিজের সৎমার ছায়া। দৃশ্যতঃ

তার ওপর কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি সে, আসেই নি তার সামনে কোনদিন ; শুধু তার বাবার মধ্য দিয়ে এসেছে এর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কোণ্ডা ? কোণ্ডা সৎমায়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করল কেমন করে ?

লছমী হাসে, বলে,—সিনেমা।···সিনেমায় যা দেখায়, কোণ্ডার মতে তা-ই সত্য। গাঁয়ের লোক অতদূর থেকে হাতে লণ্ঠন জ্বালিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে শহরে সিনেমা দেখতে,—সে কী মিথ্যা কিছু দেখবার জন্য ?—কোণ্ডার যুক্তি একেবারে অকাট্য। আর, সিনেমায় সৎমা মাত্রই নাকি খারাপ।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করে,—তারপর ?

লছমী বলে,—বাড়ি থেকে ঝগড়া করে মেয়ে বেরিয়ে যায়,—বাপ এক-এক সময় খুঁজে-পেতে ধরে নিয়ে আসে। আবার বেরিয়ে পড়ে মেয়ে। ইঁট বওয়ার কাজ নেয়,—সিমেন্টের ইঁট।

—তারপর ?

লছমী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়, বলে,—তারপর আর জিজ্ঞাসা করো না পণ্ডিত। মেয়ে মানুষের এ এক জ্বালার দিক্, লজ্জার দিক্। দুষ্ট লোকের নজরে পড়ে !

নাগমণি শুধরে দেয়,—ভদ্দর লোক।

ঐ হলো—ভদ্দর লোকের সাজে দুষ্ট লোক। তার গায়ের ওপর ইঁট ছুঁড়ে ছুটে পালিয়ে আসে নাগমণি। তারপরে গোদাবরীর তীর, তারপরে আমরা।

কাহিনী শেষ করে দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। লছমী কথা কইতে কইতে সামান্য একটু সরে গেছে,—তারই ফাঁকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নাগমণির মুখখানা,—দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে,—পড়ন্ত রৌদ্রের আভা এসে পড়েছে ওর মুখের ওপর। গল্প করতে করতে আনমনা হয়ে পড়েছে,—মনটা চলে গেছে হয়ত সেই ওর ফেলে-আসা গাঁয়ে,—ওর বাপের কাছে, ভাইবোনদের কাছে।

অনেকক্ষণ পরে সোমনাথই নীরবতা ভঙ্গ করে প্রথম, বলে,—ফিরে যাবি ভাইবোনদের কাছে, নাগমণি ?

এ'টাই বোধ হয় মেয়েটির সব থেকে দুর্বল স্থান ; ভাইবোনদের কথায় ওর চোখের পাতা ভিজে ওঠে, বলে,—আমার ছোট ভাইটা খুব দুষ্টু। পিছন থেকে এসে চোখ টিপে ধরে। খিদে পেলে আমার হাতে খাবে বলে বায়না ধরে।

লছমী কথার মধ্যে সরে দাঁড়িয়েছে, নাগমণি এখন একেবারে সোমনাথের সামনাসামনি। সোমনাথ কোমল কণ্ঠে বলে,—ফিরে যাবি তোর গাঁয়ে ?

—না !

মুখে 'না' বলে বটে, কিন্তু দুই চোখই তার ভ'রে ওঠে জলে,—মুক্তার বিন্দুর মতো এক ফোঁটা নেমে আসে গাল বেয়ে,—গোধূলির নিভন্ত আলো চিকচিক করে জ্বলে ওঠে সেই বিন্দুটির ওপর।

একটা দুর্জয় অভিমানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে এই মেয়ে। উল্কাপিণ্ডের মতো কক্ষচ্যুত হ'য়ে নেমে এসেছে প্রাণশক্তির এক অপরূপ বহ্নিকণা। ঠিক ওর মায়ের মতন। সেই অদম্য প্রাণশক্তি, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব। শিশু হ'য়ে এই রকম মায়ের কোলেই এসে যেন সে জন্মায় যুগে যুগে !

হয়ত ওর দৃষ্টিতে মুগ্ধ আরতিই দীপ্তিমান হয়ে ওঠে,—নাগমণি অপাঙ্গে ওর চোখে একবার তাকিয়েই চোখ নামায় ;' মনে মনে কী ভাবে কে জানে ? মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে।

এতক্ষণ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল লছমী, হঠাৎ যেন চমক ভেঙে জেগে ওঠে, বলে,—আমি যাই পণ্ডিত, কোণ্ডারা এসেছে, আমায় এখুনি খুঁজবে।

ব'লেই আর দাঁড়ায় না, ক্ষিপ্রগতিতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। কোণ্ডার কলরব এরা না শুনলেও লছমীর কানে যেন মুরলীধ্বনির মতো প্রবেশ ক'রেছে ; সব কিছু বিস্মরণ হয়ে যায়,—ছুটে যায়

বিহ্বলা পাগলিনীর মতো। ব্যাপারটা ঘটে যায় এত আকস্মিক যে সোমনাথ কোন কথা বলার অবসর পায় না, নাগমণিও যে ছুটে চট্ করে ওর পিছু ধরবে, তা-ও মুহূর্তে মনস্থির করতে পারে না। কিছুটা সময় কেটে যায় চুপচাপ।

সোমনাথই নীরবতা ভঙ্গ করে প্রথম, বলে,—নাগমণি, তুই কী এদের মধ্যেই থাকবি ?

হয়ত এতক্ষণে সংকোচটা একটু কেটে গেছে, হয়ত এতক্ষণে ওর কাছে সহজ হয়ে এসেছে সোমনাথের উপস্থিতি,—ওর প্রশ্নের উত্তরে মুখ তুলে তাকায়,—হয়ত সোমনাথের এই অদম্য কৌতূহল লক্ষ্য ক'রেই একটু হাসে ঠোঁট টিপে, মাথা নেড়ে জানায়—না।

—না ?

নাগমণি আবার হেসে বলে,—না।

—সে কী—কোথায় যাবি তাহ'লে ?

—যেদিকে খুশী।

সোমনাথ একটু অবাক্ই হয় ওর কথায়, বলে,—কেন রে, ওদের ভালো লাগে না ?

—লাগে।

—তবে ?

নাগমণি আবার হাসে, বলে,—আমি ত নাগিনী, আমার থাকা উচিত নয় কোনো সংসারে। কাকে ছোবল দেবো তার ঠিক আছে ?

বলেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে ওঠে নাগমণি। মুহূর্তে আলোয় ভ'রে ওঠে সোমনাথের মন। এক অনাবিল আনন্দের স্রোত যেন উৎসারিত হ'য়ে ওঠে তার সামনে !—এ' ভালো-লাগার কী তুলনা আছে ? সোমনাথ বলে,—সত্যিই তোরা বেশ ! বেশ তোদের জীবন ! অকারণে তোরা খুশী হয়ে উঠিস্, আনন্দে তোদের জীবন ভরা !

একটু যেন অবাক্ হ'য়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নাগমণি, বলে,—বলছ কী ?

—বলছি কী ?—বলছি, আমাকে তোর বন্ধু ব'লে ভাববি ?

—লছমীর মতো ?

—হ্যাঁ।

গাম্ভীর্যের ভান করে নাগমণি, বলে,—তারপর ?

—তোর সব কথা আমাকে বলবি। তোর সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দ—সব কথা।

ভ্রূ-দুটো কুঞ্চিত ক'রে কেমন-যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায় নাগমণি, বলে,—কেন বলো ত ?

—কে জানে ! বেশ লাগে তোদের কথা শুনতে, তোদের জীবনের ধরন-ধারণ দেখতে।

সমস্ত প্রগলভতা যেন স্তব্ধ হ'য়ে যায় নাগমণির। ও' চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নিচু ক'রে,—আঙুলে শুধু শাড়ির আঁচলটা জড়াতে থাকে, আর খুলতে থাকে। ওর এই অভাবিত গাম্ভীর্য লক্ষ্য ক'রে সোমনাথেরই অবাক্ হবার পালা। বলে,—কী হ'লো ?—মুখ তোলে নাগমণি, একটা অব্যক্ত অন্তর্জ্বালা যেন দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ওর চোখে। মুখখানা একটু ফিরিয়ে কাছেই যে মহীরুহের আশ্রয়ে কুলায়-ফিরে-আসা পাখিরা কলরব করছে, সেই দিকে তাকিয়ে থাকে, কেমন যেন চাপা অস্ফুট কণ্ঠে ব'লে ওঠে,—তোমাদের মাঝে মাঝে ভয় ক'রে আমার !

—ভয় ?

—হাঁ ভয়। তোমরা, ভদ্দর লোকেরা কত সুন্দর সুন্দর কথা বল, আমাদের জাতের পুরুষরা তা পারে না। তোমাদের কথা শুনতে খুব ভালো লাগে—কিন্তু কথা যখন তোমাদের থেমে যায়, তখনই লাগে ভয়।

—তাহলে আমাকেও তুই ভয় করিস্, নাগমণি ?

—সকালে যখন থেকে তোমাকে ওদের মধ্যে দেখেছি, তখন থেকেই ভয় করে আসছি। তুমি ভদ্দর লোক, তায় বেরাম্মণ— তুমি ওদের মধ্যে কেন ?

রীতিমত চম্‌কে ওঠে সোমনাথ—এক অতি সাধারণ গ্রাম্য মেয়ের মুখে এ কী শুনছে সে ?

ওর বিস্মিত বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে বাঁকা হাসি হাসে নাগমণি, বলে,—অনেক পোড় খেয়েছি জীবনে. আমি এদের চেয়ে অনেক বেশী চিনি এই ভদ্দবলোকদের ; এরাই আমার শত্রু—এদেরই জন্যে আজ ঘর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে, ভাইবোনদের ছেড়ে পথে বেড়িয়ে পড়েছি !

বলতে বলতে দু'চোখ জ্বলে ওঠে যেন নাগমণির—ওর জীবনের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা যেন বিদ্যুতের মতো ঝলমল করতে থাকে ! বলে —আমার কথা সবটা শোননি। শুন্‌বে ?

চিন্তিত ভঙ্গীমায় মাথাটা নিচু করে সোমনাথ। মেয়েটা ক্রমশই রহস্যময়ী হয়ে উঠছে তার কাছে। বাস্তবিকই, কে এই নাগিনী, তার সামনে দাঁড়িয়ে ?

সিঁড়ির দিকটা একবার দেখে নিয়ে নাগমণি বলতে শুরু করে,— তুমি বেরাম্মণ, 'দেবদাসী' প্রথার কথা তোমাকে নতুন করে শোনাতে হবে না। এ' সব একেবারে কমে গেলেও অন্য আরেক রকমে এর ধারা এখনো ব'য়ে চলেছে ; জানো ?

—কিছু কিছু জানি।

—আমি তেমনি একটি ভাগ্যহীনা মেয়ে। আমি গাঁয়ের মেয়ে, গাঁয়ের চাষীর ঘরে জন্মালেও আমাকে নাচ গান শিখতে হয়েছে।

অবাক্ বিস্ময়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে সোমনাথ। এদের কথা সে শুনেছে বৈ কি ! কিন্তু এভাবে এ'রকম পরিস্থিতিতে যে এমনি একটি মেয়ের সামনাসামনি তাকে দাঁড়াতে হবে, এ সে ভাবেনি !

বছর দুয়েক আগে এদের জাতের একটি মেয়েকে সে দেখেছিল হঠাৎ। সে যে এ' ধরনের, প্রথমে বুঝতে পারেনি সোমনাথ। ঘুরতে ঘুরতে দৌলেশ্বরমের পথের ধারে একটা বহু পুরানো মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সে। একটি ভজনের আসর বসেছে মন্দিরের চত্বরে। মাথার ওপরে বিস্তৃত সামিয়ানা টানানো। রাত তখন ন'টার বেশীই হবে, চারিদিকে গোল হয়ে ব'সে ভক্ত নরনারীর দল শুনছে সেই গান। ক্ষুদ্র মঞ্চের ওপর উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর আভায় মুখখানা উদ্ভাসিত, তরুণী একটি মেয়ে চমৎকার সুরেলা-গলায় রামায়ণ-গান ক'রে চলেছে। গোলাপী শাড়ি পরনে, গলায় লাল-করবীর মালা, কপালে লাল কুঙ্কুমের টিপ,—মাঝে মাঝে পায়ের নূপুরে সে ঝংকার তুলছে,—চমৎকার লাগছিল তাকে দূর থেকে। কে যেন ভিড় থেকে উঠে তাকে থালায়-সাজানো একটা শাড়ি আর কিছু ফল উপহার দিয়ে এলো নমস্কার জানিয়ে। মেয়েটি থালাটি হাতে নিয়ে হঠাৎ গান থামিয়ে দিলো, একমুহূর্ত চুপ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিলো দাতার নাম, তারপরে কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলে ঘোষণা করল উপহার-দাতার নাম, এবং দেবতার নাম নিয়ে কামনা করল তার সর্বাঙ্গীণ কুশল,—তারপর থালাটি নামিয়ে রেখে আবার শুরু করল তার অসমাপ্ত ভজন মালিকা। মেয়েটির সুরেলা কণ্ঠের সেই সম্ভাষণ,—'মহাজনলো !'—অর্থাৎ, তোমাদের মনের মধ্যে যে মহৎ জন বাস করে, আমি তাকেই ডাকছি ! মানুষের অন্তরতম প্রদেশের ওগো চিরসুন্দর দেবতা, ওগো মহাজন, তুমি সাড়া দাও ! —মহাজনলো ! আজও কানে বাজে। কিন্তু মেয়েটি যে কী, তা' জানতো না সোমনাথ। জানলো হঠাৎ একদিন, স্নান সেরে কোটলিঙ্গম মন্দিরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে। গানশোনার দু'তিনদিন পরের ঘটনা। মেয়েটি মন্দিরের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সেই গায়িকা মেয়েটি। হাতে তার পূজার থালা। 'মহাজনলো !'—ঠিক সেদিনকার সেই সম্ভাষণের ভঙ্গিতে সে যেন কাউকে কিছু বলতে চায়। থমকে দাঁড়ালো সোমনাথ। মেয়েটির

কাছে এগিয়ে যেতেই মেয়েটি আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করল,—আপনি কী ব্রাহ্মণ ?

—হ্যাঁ।

হাতের থালাটি সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে দিলো মেয়েটি, বলল,—আমার হ'য়ে এই পূজাটা দিয়ে দিন না মন্দিরে !

—কেন, আপনি নিজে গিয়ে দিতে পারেন না ?

মেয়েটি বলল,—আমি নাগাসাপুদের মেয়ে,—ভিতরে গিয়ে ঠাকুরকে ছুঁতে চাই না !

একটু আশ্চর্য হয়েই সোমনাথ বলেছিল,—আইন হয়েছে জানেন না ? যে-কেউ যেতে পারেন।

মেয়েটি বলল,—জানি, কিন্তু তবু যাব না।

একটু থেমে সোমনাথ বলে,—মাপ করবেন, আমিও যাব না ভিতরে।

—সে কী ! আপনি ত ব্রাহ্মণ দেখছি !

—হ্যাঁ, তবু যাব না।

অবাক্ হয়ে ওর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়েছিল মেয়েটি। কী অদ্ভুত এই লোকটি ! তাড়াতাড়ি কাছ থেকে সরে এসেছিল সোমনাথ। মেয়েটি তবে নাগাসাপুদের মেয়ে ?

নাগমণিও কি তবে ওই জাতের মেয়ে ? বাঁকা হাসে নাগমণি, বলে,—আমার আসল নাম নাগমণি হলেও পোশাকী নাম আছে,—আমি যখন নাচিয়ে-মেয়ে ছিলাম, আমার তখনকার একটা নাম 'চন্দ্রসেনা'। এই চন্দ্রসেনার কথা শুনতে চাও ?

সোমনাথ বাধা দিয়ে বলে,—তোমরাই কি তবে, যাদের বলে নাগাসাপু ?

—হ্যাঁ। আমরাই নাগাসাপু; ভালো কথায় যাকে বলে নাগবাসী। বইয়ে পড়োনি নাগরাজার কথা ? আমরা সেই নাগরাজার বংশের মেয়ে। আমরা এক ধরনের জাত। আমাদের জাতের

মেয়েরাই একদিন দেবদাসী হয়েছে। আজ ত মন্দিরে দেবতা নেই, আছে পাথর। আজ পূজা হয় মানুষের। আমরাও তাই দেবতা ছেড়ে মানুষের পূজা ধরেছি।

ব'লে, হঠাৎ খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে রহস্যময়ী। তারপর হাসি থামিয়ে আবার শুরু করে,—আজকাল অবশ্য জাতের গরম ততটা নেই। শুধু আমরা কেন, আজ কতো জাতের মেয়েরা অভাবের তাড়নায় নাচগান সম্বল ক'রে মানুষের পূজায় নেমেছে।

—তারপর ?

—তারপর ? এইভাবেই চন্দ্রসেনার জন্ম। আমার বাবা 'নাগবাসী' হয়েও আরও অনেক লোকের মতো গাঁয়ে গিয়ে চাষবাসের কাজ নিয়েছে। আমার সৎমা চাষীদের মেয়ে। কিন্তু আমাকে ভালো চোখে কোনো কালেই দেখে না। আমি খুব দুরন্ত ছিলাম, আমার সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া-মারামারি লেগে থাকত। বড়ো হলাম এইভাবে, —আর আমাদেব বাড়ির আশেপাশে ভদ্দরলোকদের আনাগোনা বাড়ল। ইশারা-ইঙ্গিত, এটা-ওটা মাকে আর বাবাকে এনে দেওয়া, —বুঝলে ?

—বুঝলাম।

নাগমণি বলল,—আমার সৎমায়ের উসকানির পর বাবা শেষে রাজী হলো। খুব জাঁকজমক হলো বাড়িতে। ঠিক বিয়ে বাড়ির মতই সাজানো-গোছানো। কিন্তু এ'কে কী বিয়ে বলে ? মনে-মনে এটুকু আনন্দ যে বাইরে যেতে পারব এ' বাড়ির ; সৎমার হাত থেকে ছাড়া পাবো। এলাম শহরে নাচগান শিখতে, লেখাপড়াও কিছু কিছু। প্রথম-প্রথম বেশ লাগত, কোনো উৎপাত ছিল না, আমি তখন মাত্র শিখতে এসেছি। নাচ বড়ো ভালো লাগত। ভাবতাম এই নাচের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখব। কিন্তু তার পরের পাঠে এসে ভুল ভাঙল। শুরু হলো শেখবার শেষ ধাপ। কামকলা। সইতে পারলাম না,—সব ছেড়ে একদিন পালিয়ে এলাম। চন্দ্রসেনার খোলস

ছেড়ে নাগমণি ফিরে এলো তার গাঁয়ে। কিন্তু সেখানেও কী নিস্তার আছে? শহর থেকে লোক এলো আমার পিছুপিছু,—এই তোমারই মতো ভদ্দরলোক। সবার জ্বালায় শেষে ঘর ছেড়ে পথে বেরুলাম। ভাবলাম, খেটে খাবো। কিন্তু তাতেও জ্বালা কম নয়। জ্বালা আর জ্বালা! যেখানেই যাই সেখানেই এই জ্বালা,—কী করি কোথায় যাই, বলতে পারো?

—থাকো না এখানেই?

আবার বাঁকা হাসি হাসল নাগমণি, প্রগল্‌ভ মেয়ে হঠাৎ-ই ব'লে বসল,—কী রকম? তোমাব কাছে?

ছি ছি, এ কী কথা!

খিলখিল কবে হেসে উঠলো নাগমণি।

অতর্কিতে প্রচণ্ড আঘাতই এসে পড়ে সোমনাথেব মনে,—তীব্র কশাঘাত! বাঁকা পথে হেঁটে হেঁটে মেয়েটাব মনও হ'য়ে গেছে বাঁকা। ধরা গলায় কোনক্রমে বলে সোমনাথ,—তুই ভয়ানক ভুল করছিস্ বোন। আমি আজ থেকে সত্যিই তোর মাযেব পেটেব ভাই। শোন্ তবে আমাব কথা। আমিও তোর মতো হতভাগ্য। আমাবও নিজেব মা নেই, সৎমা। আমাকেও বাড়ি থেকে, বাড়ি থেকে কেন, সমাজ থেকে বাব ক'বে দিয়েছে!

এবাব অবাক্ হবার পালা নাগমণির, বলে,—কেন?

সে অনেক কথা। তবে এ'টুকু শুনে রাখ বোন, আমার কোনো জাত নেই। জাত আমি জলাঞ্জলি দিয়েছি।

নাগমণি বিস্ফাবিত চোখে ওব দিকে তাকিয়ে থাকে, হয়ত পায়ে-পায়ে একটু এগিয়েও আসে ওর দিকে, বলে,—তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে কেন বাড়ি থেকে?

—আমার মা—আমার অত্যাচারিতা, অবহেলিতা মা, সে-ও তোর মতো এমনি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসে শিশু পুত্রের হাত ধ'রে, এই গোদাবরীই তাকে স্থান দিয়েছে বুকে—এই গোদাবরীর জলেই

মিলিয়ে আছে মায়ের পুণ্যদেহ, এই গোদাবরী-মাকে ছেড়ে কোথাও চলে যেতে পারি না। জানিস্ বোন, আমার খুব খারাপ রোগ হয়েছে,—যক্ষ্মা।

—যক্ষ্মা!

—হ্যাঁ, জানিস্, রোগটা কি?

—জানি। কিন্তু···

সোমনাথ বলে,—হ্যাঁ বোন, ব্রাহ্মণপল্লীতে যা, জিজ্ঞাসা কর আমার কথা। সবাই বলবে। শুধু কোণ্ডারা এসব বলে না, বোঝেও না, বিশ্বাসও করে না। ঐ কোণ্ডাই আমাকে সেবা ক'রে বাঁচিয়েছে।

—কোণ্ডা?

—হ্যাঁ। কোণ্ডার মতো শ্রমজীবীই আজ আমার বন্ধু আর সঙ্গী। তোর মতো ভদ্রলোকদের আমিও ভয় করি, এড়িয়ে চলি।

নাগমণি ওর দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ নিষ্পলকে, তারপরে অস্ফুটকণ্ঠে বলে,—তুমি সেরে গেছ?

একটু ম্লান হাসে সোমনাথ,—না রে নাগমণি। আমি কেন, কেউই সারেনি। আমাদের মধ্যবিত্তের স্নায়ুতে স্নায়ুতে এই রোগ! সন্দেহ—অবিশ্বাস—ঘৃণা—অসাম্য আর পরশ্রীকাতরতা!

—আমি বুঝছি না তোমার কথা।

একটু থেমে সোমনাথ বলতে শুরু করে তার ইতিহাস। সৎ-মাকে নিয়ে তার বাবার সন্দেহের কথা, ক্ষয়রোগ-প্রচারের কথা। কাহিনীর শেষে মুখ তুলে দেখে, নাগমণির চোখে টলমল করছে অশ্রুর বিন্দু। দিনের আলো নিভে গিয়ে কখন রাত্রি নেমে এসেছে, রাস্তার আলো এসে পড়েছে তীব্রভাবে ওদের মাঝখানে,—তারই আভাসে নাগমণির কমনীয় মুখখানা উদ্ভাসিত।

নিচে থেকে অকস্মাৎ কোণ্ডার কণ্ঠস্বর শোনা যায়,—পণ্ডিত, পণ্ডিত?—নাগমণি সেই স্বর শুনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় সিঁড়ির

দিকে। তারপরে তাড়াতাড়ি নেমে যায়। সোমনাথ ঢোকে ঘরের ভিতরে, দাঁড়ায় গিয়ে জানালার কাছে—সাড়া দেয়,—কী ?

কোণ্ডা দাঁড়িয়ে জানালার ঠিক নিচে, লছমী হয়ত ব্যস্ত রান্নার তদ্দারকে, বুড়ো নোকন্না মাথায় পাগড়ি বেঁধে দাওয়ার ওপর ব'সে সর্দারের মতো, তাকে ঘিরে আরো কয়েকজন রজকের ভিড়। রাস্তার আলোটা বেশ উজ্জ্বল করে রেখেছে ওদের উঠানটাকে। বুড়ো নোকন্না তাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়, প্রণাম জানিয়ে বলে,—একবার এখানে আসবে, পণ্ডিত ?

—যাচ্ছি।

দাওয়ার একপ্রান্তে আসন পেতে তাকে বসতে দেয় লছমী। কোণ্ডা বসে তার পায়ের কাছে, পাশে নোকন্না। নাগমণিকে দেখা যাচ্ছে না, কিসের আড়ালে গিয়ে সে নিজেকে লুকিয়েছে, কে জানে! নোকন্না বলে,—পণ্ডিত, তুমি আমাদের লোক। তোমাকে আমাদের একটা দরখাস্ত লিখে দিতে হবে।

কিসের দরখাস্ত, নোকন্না ?

—এই দেখ না, এই সব লোক আমাকে আর সর্দার ব'লে মানতেই চায় না।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনমণ্ডলীতে একটা প্রতিবাদের গুঞ্জন ওঠে, কোণ্ডা থামিয়ে দেয় তাদের। নোকন্না বলে, —তবে বিশ্বাস করে না কেন আমার কথা? আমাদের অবস্থা বাস্তবিকই খারাপ হয়ে যাচ্ছে পণ্ডিত। সরকার আমাদের ঠিকমতো 'সোডা' দেবে না,—আমরা 'চাউড়ভূমি'তে গিয়ে অতিকষ্টে 'চাউড়মন্নু' যোগাড় করে আনি বটে, কিন্তু তাতে কাপড় খুব ফরসা হচ্ছে না, গৃহস্থেরা মোটেই পছন্দ করছে না।

সোমনাথ জানে, এই 'চাউড়মন্নু'টা কী। ধানের জমি হচ্ছে 'চাউড়ভূমি।' ধানের জমির ওপরে অনেক সময় লবণের মতো সাদা আস্তরণ পড়ে, তাই সযত্নে সংগ্রহ ক'রে আনে

স্থানীয় রজকের দল,—কাপড় কাচার জন্য সোডার বদলে ব্যবহার করে।

—কী লিখব, নোকন্না ?

নোকন্না আবেগকম্পিত কণ্ঠে ব'লে ওঠে,—পণ্ডিত, তুমি আমাদের মা-বাপ। এমন করে লিখবে যাতে সরকার বাহাদুরের মন গলে—যেন আমাদের 'সোডা'র বরাদ্দ বাড়িয়ে দেয়। কী বলো হে তোমরা ? সোডা না পেলে চলবে কী ক'রে আমাদের ব্যবসা ? খাবো কী ?

সমস্বরে সবাই ব'লে ওঠে,—নিশ্চয়-নিশ্চয়।

ক্রমে রাত বাড়ে। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়ে যায়, সোমনাথ ওদের 'সোডা'র জন্য দরখাস্ত লিখে দেবে এবং শুধু তাই নয়—সরকারী অফিসে গিয়ে ওদের হয়ে দরবার করবে। সোমনাথের নামে জয়ধ্বনি তুলে যে-যার ঘরে ফিরে যায়, কোণ্ডা তো আবেগে ওর পা-ই জড়িয়ে ধরে।

সবাই চলে যাবার পর লছমী আসে এগিয়ে ওদের কাছে, বলে,—বাবা, কোণ্ডাকে একটু বকুনি দাও, ও আজও পয়সা চেয়েছে।

কোণ্ডা অমনি লাফিয়ে ওঠে তাব আসন থেকে,—এই, খবরদার ! চেয়েছি পয়সা !

—বটে, চাস্‌নি !

ওদের ঝগড়া হয়ত জমে উঠত আরো, হঠাৎ নাগমণির খিলখিল-হাসির শব্দে ওরা দুজনেই থেমে যায়। নোকন্না বলে,—কে রে ? ঐ মেয়েটা বুঝি ?

লছমী বলে,—হ্যাঁ বাবা।

নোকন্না বলে,—ঐ দেখ পণ্ডিত, কোণ্ডা ত ছিলই এক পাগল, এখন আরেক পাগলী এসে জুটেছে।

সোমনাথ বলে,—সে কী নোকন্না, তুমি কী মেয়েটিকে পছন্দ করছ না ? এই যে শুনলাম······

বাধা দিয়ে নোকন্না ব'লে ওঠে,—ঠিকই শুনেছ পণ্ডিত। মেয়েটিকে

পছন্দ না ক'রে আমার উপায় আছে? আমার লছমী-মায়ের যখন পছন্দ······

অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে লছমী ব'লে ওঠে,—বাবা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক—বুঝলে পণ্ডিত, মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ। কী নাম যেন মা তোমার—নাগমণি? তা' বেশ। থাকো মা থাকো, আমার ঘর আলো করে থাকো। কিন্তু দেখিস্ বেটী দিদির সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করিস্ না।

বলতে বলতে উঠে পড়ে নোকন্না, বলে,—এসো পণ্ডিত, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই।

বাইরে এসে গম্ভীর হয়ে যায় নোকন্না, বলে,—পণ্ডিত, খুব বিপদ এবার আমাদের।

—সে কী!

—হ্যাঁ, পণ্ডিত। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি ত সব গুলিয়ে যাচ্ছে। এবার না খেয়ে মরতে হবে। শহরে 'ডাইংক্লিনিং' ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

—'ডাইক্লিনিং' বাড়ছে, তাতে তোমাদের কী?

—আমাদের ভয় ঐখানেই পণ্ডিত। ভদ্রলোকের ছেলেরা যদি এ ব্যবসায়ে নামে তাদের সঙ্গে কী আমরা পারব? গৃহস্থরা সব 'ডাই-ক্লিনিং' পছন্দ করছে। আমাদের অন্ন বুঝি এবার গেল!

—ব্যাপারটা বুঝছি না সর্দার। ওরা ত আর নিজেরা কাচছে না কাপড়!

—তা কাচছে না অবশ্য। ওরা গৃহস্থবাড়ি থেকে কাপড় নিয়ে আমাদেব দিয়ে কাচাচ্ছে। কিন্তু কী রকম সাজানো দোকান-ঘর, কেমন কাগজ-মোড়া নম্বর-মারা কাচা কাপড়গুলি সাজানো থাকে, লোকে ঐ সবই পছন্দ করছে বেশী। আমাদের থাকতে হচ্ছে ঐ ভদ্রলোকদের তাঁবে। গৃহস্থবাড়ী গিয়ে 'মা' ব'লে দাঁড়ানো,—এ সম্পর্কটা আস্তে আস্তে এ শহর থেকে উঠে যাচ্ছে, পণ্ডিত।

—ভাববার কথা বটে!

—দেখ পণ্ডিত, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু।

বন্ধু! ঘরের আলো নিভিয়ে অন্ধকার ছাদে শুয়ে, থেকে থেকে এই কথাই বার বার ওর মনে জেগে উঠছে। এদের যথার্থ বন্ধু হবার যোগ্যতা আগে অর্জন করতে হবে তাকে। কাজ খুঁজছিল সে,—এই ত তার কাজ—ওদের দুঃখ-দুর্দশা-সমস্যার সমভাগী হওয়া।

না—না, আমি তোমাকে ভুল ব'লেছি পণ্ডিত, আমার কথা বিশ্বাস করো না, সব আমার বানানো। ···ঘুমুতে ঘুমুতে হঠাৎ নিজেরই কণ্ঠস্বর শুনে ঘুম আচমকা ভেঙে গেল নাগমণির। প্রথমেই চোখ পড়ল একটি নীল-নীল উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে ; পণ্ডিতের ঘরের ছাদের ঠিক ওপরেই একা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে,—যেন চেয়ে আছে তারই দিকে—একদৃষ্টে—পণ্ডিতের চাউনির মতো। জ্বালা নেই, তৃষ্ণা নেই—নিবিড় মমতায় আর স্নেহে স্নিগ্ধ!

মাদুরের ওপর তার ঠিক পাশেই শুয়ে আছে লছমী। সর্দার শুয়ে আছে উঠানে একখানা খাটিয়ার ওপর। কোণ্ডা হয়ত তার ঘরে, কিংবা তার ঘরের সামনেকার রাস্তায়। ভোর হবার কতো দেরি? কখন এরা উঠবে? কখন জাগবে ওদের জীবনের চাঞ্চল্য, একে একে কাপড়ের স্তূপ মাথায় রওনা হবে গোদাবরীর তীরে?

হয়ত সময় আসন্ন। কিন্তু কী হ'লো তার? এখনো স্পষ্ট কানে বাজছে স্বপ্ন দেখতে-দেখতে-উচ্চারণ-করা কথা কয়টি! পণ্ডিতের পায়ে মাথা কুটে যেন সে বার বার বলতে চাইছে, তার সব কথা বানানো! কী অদ্ভুত এ স্বপ্ন।

স্বপ্ন, না বাস্তব? হঠাৎ কী হলো তার পণ্ডিতকে ওদের মধ্যে দেখে, একটা অব্যক্ত জ্বালায় জ্বলতে লাগল হৃদয়-মন,—পাগলের

মতো প্রলাপ ব'কে গেল পণ্ডিতের সামনে। যে-পরিচয় সে দিতে পারেনি লছমীকে, সে পরিচয় সে মুহূর্তে উদ্ঘাটন ক'রে দিলো পণ্ডিতের কাছে,—এ মনোভাবের পশ্চাতে আছে কিসের প্রতিক্রিয়া, তা' ভেবে পায় না নাগমণি।

সে যে নাগাম্বু বা নাগবাসীর কন্যা, এ পরিচয় দেওয়া চলবে না এই রজকদের কাছে। তারা জাতে এক নয়,—পরস্পরের মধ্যে সামাজিক আদানপ্রদান নেই, একের অন্ন অপরে ছোঁয়না পর্যন্ত। সে নিজে পথের মেয়ে, এসে পড়েছে পথে, তার কোনো বাছবিচার নেই, থাকলে চলবেও না—কিন্তু এরা ত গৃহস্থ ?

উঠে বসল নাগমণি। চ'লেই তার যাওয়া উচিত। এদের এই শান্তিময় জীবনে বিক্ষোভের ঘূর্ণি জাগিয়ে তোলা নিঃসন্দেহে অপরাধ। লছমী কেমন নিরুদ্বেগে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে! একবার একটু পাশ ফিরল। কচি-কচি মুখখানার ওপর নক্ষত্রের স্তিমিত আভা এসে প'ড়ে কেমন যেন একটা অদ্ভুত শ্রী ফুটিয়ে তুলেছে! ভারি ভাল লাগছে ওকে এখন। ওর চুলের ওপর নিজের আঙুলগুলি সস্নেহে বুলিয়ে দিতে দিতে ভাবতে লাগল নাগমণি, কার প্রিয়া এই মেয়েটি,—কার কামনার ধন!··· কোণ্ডার ?

কোণ্ডার কথা মনে হ'তেই ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠল নাগমণির। অদ্ভুত লোক ঐ কোণ্ডা! যেন নির্জন মাঠের বাঁশী-বাজানো আপনভোলা রাখালটিকে ধরে এনে ঘরের মায়ায় বেঁধে রেখেছে। ঘর থেকে আবার পথে নিয়ে যাওয়া যায় না ওকে ? লছমীর দিকে তাকালো নাগমণি, এ যেন কোমল তরু-লতিকা। লতার মতো বেষ্টন ক'রে ধরার মতোই ললিত দেহমঞ্জরী ওর। ও' যতই কঠোর হবার চেষ্টা করুক, কোমলতা ওর অঙ্গের সন্ধিতে সন্ধিতে।

উঠে দাঁড়ায় নাগমণি। আর কতক্ষণ পরে সূর্য উঠবে ? হয়ত একটু পরেই। তাকে এই অন্ধকারের সুযোগে গোদাবরীতে গিয়ে

স্নান সেরে নিতে হবে। স্নানের পরে দূরে চলে-যাবার পালা—যে দিকে দু'চোখ যায়!

স্নানের কথায় কোণ্ডার কথা মনে পড়ে গেল। নাগমণির স্নান করার অভ্যাসটা ছোটবেলা থেকেই ঐ রকম। জল দেখলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্নান করতে ইচ্ছা করে—উত্তপ্ত দেহটাকে যেন মুহূর্তে স্নেহ-শীতলতায় নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু এই ঝাঁপ-দেওয়াটা কোণ্ডার কাছে নাকি মরণের বুকে ঢলে পড়ারই সামিল!

পায়ে-পায়ে বেরিয়ে এলো নাগমণি। ঐ ত ওর ঘরের সামনেকার পথটুকুতে খাটিয়া পেতে আরামে ঘুমিয়ে আছে কোণ্ডা, দীর্ঘ আর সবল শরীরটাকে বেশ ছড়িয়ে, মেলে। যেন একটা উচ্ছল বন্যতার ঢেউ অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে!

ঠিক এ'ধরনের পুরুষ তার জীবনে এই প্রথম। তাদের আপন জাতের পুরুষদের মধ্যে দৈহিক সুগঠনের অভাব নেই, কিন্তু তাদের মধ্যে কেমন একটা সংসারীপনার ভাব আছে; বৈষয়িকতায় তারা আচ্ছন্ন। তাদের জাতের অধিকাংশ পুরুষই আজ নেমেছে কৃষির কাজে,—হাল চালনা করতে করতে যেন তাদের সেই চিরন্তন ভবঘুরে মনটাকেই তারা চিরে ফেলেছে! কৃষিকাজ, ঘর আর ঘরণী। এব বাইরে তাদের কোনো জীবনই যেন নেই! কিন্তু, সে শুনেছে, নাগাসুদের জীবন অন্য ধরনের; অন্য-এক-জীবন গ্রহণের জন্যই তারা জন্মায়! নৃত্য-গীত-ললিতকলার জীবন।

অনেক কথাই ত মনে পড়ে। তাকে তার বাবার নিজের হাতে নটী-জীবনের মধ্যে ঠেলে দেওয়া। সেই প্রথম রাত্রির উৎসব। কিশোরী-মনের গোপন স্বপ্ন তখন পদ্মকোরকের মতো ফুটে উঠেছে। এগিয়ে আসছে আত্মদানের লগ্ন,—একটা অবিশ্বাস্য ভীরুতা এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা উদগ্র কৌতূহল—সব মিলে অপরূপ এক আচ্ছন্নতা সমস্ত শরীর-মন জুড়ে আছে। সম্প্রদানের সালংকারা কন্যার মতো ব'সে আছে সে একদল পুরুষের মধ্যে। বিচিত্র সে নিয়ম,

বিচিত্র সে পদ্ধতি। সেই তার স্বয়ংবর সভা। না—না, তার কোনো অভিলাষের সেখানে দাম ছিল না। বীর্যশুল্কা ত সে নয়, পণ্যশুল্কা। অর্থ-বলে যিনি সবার থেকে ওপরে উঠবেন, তার কুমারী জীবনের পূর্ণাহুতি হবে তারই পায়ে। একে একে সবাই চলে যাবে, থাকবেন শুধু সেই অর্থবান পুরুষ।

নাগাসুর কন্যা সে, দেবতার দাসী হবার জন্যই নাকি তার জন্ম! কিন্তু যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেবতার রূপেরও পরিবর্তন ঘটেছে। গভীর রাত্রে সবাই যখন একে একে চলে গেল,—তখন তার দেবতা এলেন তার কাছে। মুখ তুলল নাগমণি। কালো কুশ্রী একটি বৃদ্ধের মুখ,—একটি চোখ কাণা, অপর চোখটি সাপের মণির মতো জ্বলছে।

সেই বীভৎস রাত্রির কথা এত চেষ্টা ক'রে আজও ভুলতে পারেনি নাগমণি। ধস্তাধস্তি চিৎকার, ঘর ছেড়ে পালানোর চেষ্টা! কিন্তু পালাবে সে কোথায়? ঘরের বাইরে পিতার শাসন, সৎ-মায়ের তিরস্কার। ফিরে আসতে হয়েছিল,—দিতে হয়েছিল গা-ঘিনঘিন-করা পাঁকের মধ্যে ডুব! সেই পাকের মালিন্য যেন শত অবগাহনেও যাবার নয়!

তারপরে, নাচ গান শেখার জীবন। কী ভালই না লাগত তখন! বিশেষ ক'রে নাচের মধ্যে সে যখন নিজেকে ডুবিয়ে দিত! প্রথমে দ্বিধা, লজ্জা,—তারপরে ধীরে ধীরে দেহ-সচেতনতার উর্ধ্বে ওঠা! সংগীত-মূর্ছনার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করা, একটা উদ্বেলিত আনন্দ-হিল্লোলের মধ্যে দেহ-মন-প্রাণকে ভাসিয়ে দেওয়া! "তাম্-তিথাম্-আই-আথাই! তাম্ তিথাম্ থাই তাথাই!"···সব থেকে ভালো লাগত তার 'আলারিপ্পু' নাচের ভঙ্গিগুলি। প্রথমে হাতের মুদ্রা, শিরের আন্দোলন, চরণে লয়ের ক্ষিপ্রতা। "তাম্ তিথাই থাই তাথাই।"···অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল চম্পক অঙ্গুলীতে, বক্ষে, শিরে। যেন দেহের প্রতিটি অঙ্গে অঙ্গে জ্বলে উঠলো আরতির মঙ্গলালোক

"তাম্ তিথাম্ থাই তিথাই",···আরো দ্রুত লয়, দ্রুত ভঙ্গি। দেহের আভরণ—আবরণ সব গেল, সমস্ত দেহ তখন একটি উজ্জ্বল প্রদীপ-শিখায় পরিণত হ'য়েছে। গায়ক ও বাদকদল ছায়া হ'য়ে মিলিয়ে গেছে শূন্যে,—মন্দিরের পাষাণ-দেবতার মূর্তিও অন্তর্হিত—ক্রমে ক্রমে দেহও যেন ধূপের মতো মিলিয়ে গেল! নিঃসীম শূন্যতা! দেহ গেল—মন গেল,—আত্মা—ক্রমে ক্রমে তাও যেন বিলীন হ'য়ে গেল! "থাই-তাথাই!"···অবধারিত—অনিবার্য—সমে এসে থেমে গেছে তার সব কিছু!

কিন্তু, এ কী! তার নিজের অবস্থা দেখে আপনমনে হেসেই অস্থির হ'লো নাগমণি! এইজন্য চিন্তা ভাবনার কোনো ধার ধারতে নেই। গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতে গেলে মনটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা কোনো কাজ অজ্ঞাতসারে হঠাৎই ক'রে বসে; আর সে কাজের দিকে তাকিয়ে সময় সময় লজ্জার আর অবধি থাকে না! নিজের অতীতকে ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে কখন ব'সে পড়েছে সে কোণ্ডার খাটের ওপর—ঘুমন্ত কোণ্ডার পাশে; আর এরই মধ্যে কখন যেন পাশ ফিরেছে কোণ্ডা, ঘুমের ঘোরে কখন তার আঁচলটা হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রেছে আপনভোলা ঐ ক্ষ্যাপা মানুষটা।

গলির এদিক-ওদিক তাকালো নাগমণি, তাকালো লছমীদের ঘরের দিকে—না, জাগরণের লক্ষণ কোনদিকেই নেই; তার চলে-যাবার এই-ই ত মাহেন্দ্রক্ষণ! লছমীব দেওয়া শাড়িটা ছেড়ে নিজের পোশাক পরেই শুয়েছিল সে বুদ্ধি ক'রে। যেতেই হবে,—কোনদিকে কোনো বাধাই আর নেই! উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু আঁচলের খুঁটটা শক্ত মুঠিতেই চেপে ধ'রেছে এই পাগল লোকটা! ছি ছি যদি কেউ দেখে ফেলে—যদি লছমীর চোখেই প'ড়ে যেতো ঘটনাটা!

আঁচলটা আস্তে টেনে নিতে নিতে হঠাৎ নিজের মনেই হেসে ওঠে কৌতুকময়ী, সবটা মিলে একটা খেলার মতই মনে হয়। কোণ্ডার মুঠি শক্ত, জোরে আঁচলটা টানতে গেলে ওর ঘুম ভেঙে যাবে।

মুহূর্তে অদ্ভুত এক কৌতুকের নেশায় ভ'রে ওঠে ওর মন ; অদম্য হাসির আবেগে কেঁপে উঠছে সারা শরীর। ওর আঁচলটা ধ'রে ঘুমের ভান করে চুপচাপ প'ড়ে আছে কোণ্ডা, এমনও হ'তে পারে। হাসির তরঙ্গ রোধ করতে পারছে না বন্য কুরঙ্গিণী, একটু নিচু হয়ে সকৌতুকে কোণ্ডার বুকের ওপর নিজের নরম মুঠি দুটি দিয়ে ঘনঘন কয়েকবার আঘাত করে হাস্যময়ী, চোখ খোলে কোণ্ডা, হাতের মুঠি শিথিল হয় ; সেই সুযোগে আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালায় নাগমণি, নাগিনীব মতো এঁকে বেঁকে !

কিন্তু যাবে কতদূর ? কোণ্ডা এসে ধ'রে ফেলে ওকে পেছন থেকে। নাগমণি বলে,—ছাড়্ শিগ্‌গির !

ওর হাতটা তবু ধ'রে থাকে কোণ্ডা, বলে,—জমানা বদল গিয়া !

—কী বললি !

কোণ্ডা হেসে বলে,—চল্ পালাই !

সজোরে হাতটা ছাড়িয়ে নেয় নাগমণি, বলে,—যা ভাগ ! কে তোকে বেঁধে রাখছে ?

কোণ্ডা বলে,—কে আবার বাঁধবে ? আমার যখন খুশী, যেদিকে খুশী চলে যাব !

নাগমণি একটু হাসে, বলে,—লছমী বকবে না ?

কোণ্ডা একটু তাচ্ছিল্যের সুরে বলে,—বকুক্ গিয়ে, হ্যাঁ। চল্ না, যাই ?

—না, যাব না, তোর সঙ্গে যাব কেন ?

কোণ্ডা বলে,—তবে আমার ঘুম ভাঙালি কেন ?

নাগমণি ঠোঁট টিপে একটু হাসে, বলে,—আমি ভাঙিয়েছি তোর ঘুম ? কক্ষনো নয়—কোণ্ডা শিশুর মতো বলে,—তুই বুকে মেরেছিস, কী রকম লেগেছে ছাখ্ ? এখনো টিপটিপ করছে !

হেসে ফেলে নাগমণি, বলে,—বেশ যা হোক্ ! আমার আঁচল ধরেছিলি কেন ?

—আমি ?—কোণ্ডা অবাক্ হয়ে বলে,—কই, না।

—মিথ্যেবাদী!—কৌতুক আর তিরস্কার মিলে অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটে ওঠে নাগমণির চোখে; তাই দেখে অবুঝ মানুষটা ওর হাত চেপে অনুনয়ের কণ্ঠে ব'লে ওঠে,—বিশ্বাস কর্ তুই।

আবার হেসে ওঠে নাগমণি, বলে,—ছাড়্ হাত, আমি যাচ্ছি চান করতে গোদাবরীতে।

—আমিও যাব।

—তা যা' না—কিন্তু আমার সঙ্গে কেন ?

কোণ্ডা বলে,—শোন্ না ? দুজনে কোটিলিঙ্গমের ঘাটে চান ক'রে তারপরে পালিয়ে যাই।

—কোথায় ?

—শহরে—রাজমহেন্দ্রীতে ? দু'জনে সিনেমা-টিনেমা দেখে তারপরে ফিরে আসব ?

হাসে নাগমণি। লোকটি একেবারেই ছেলেমানুষ! বলে,—যদি আমি না যাই তোর সঙ্গে ? যদি ফিরে না আসি ?

—কেন, আসবি না কেন ফিরে ?

নাগমণি একটু থেমে তারপরে মৃদুকণ্ঠে বলে,—কেন আসব ? আমি তোদের কে রে ? আমি তোদের জাতেরও নই, তা জানিস্ ?

মুহূর্তে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে কোণ্ডা, বলে,—দেখ্, জাত জাত করিস্ না! ও সব জাতটাতের ব্যাপার ঐ অবধানী বামুনদের কাছে গিয়ে বলিস্, আমি ওসব বুঝি-টুঝি না, হ্যাঁ!—যত সব···!

নাগমণি তেমনি মৃদুস্বরে বলে,—অত রেগে যাচ্ছিস্ কেন ?

—রাগব না! কোণ্ডা এবার রীতিমত চেঁচিয়েই ওঠে,—তুই কে, কোন্ জাতের, সেই সাত-সতরো সব ওদের বলতে হবে!

—কা'দের ?

—ঐ ওরা—আমাদের দলবল! দরবার করতে এসেছিল ঐ যে

লোকগুলি সোডার জন্য নোকন্নাসর্দারের কাছে কাল রাত্রে—দেখিস্ নি ?

নাগমণি রুদ্ধনিশ্বাসে শুনে যায় ওর কথা, বলে,—তারপর !

—তারপর আর কী ! হাঁকিয়ে দিয়েছি !

—কে ?

—আমি, আবার কে ! সর্দারকে সোজা বললাম,—জমানা বদল গিয়া ! সিনেমায় দেখেছিলাম, জানিস্ ! অন্য জাতের মেয়েকে বিয়ে করেছে একটা ছেলে ! গাঁয়ের সবাই মারমুখো ! মেয়েটার কী কষ্ট ! চোখের জল রাখা যায় না। গাঁয়ের লোক তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ! একদিন ছেলেটা কাজ খুঁজতে শহরে গেছে, সেই ফাঁকে ওদের বাড়িতে চড়াও হয়ে···বুঝলি ? মেয়েটার কোলে ছোট্ট ছেলে। কাঁদতে কাঁদতে তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ! কী কষ্ট ! শেষে বিষ্ণু নিজে দেখা দিয়ে মেয়েটার কষ্ট দূব করলেন !

—বিষ্ণু !

—হ্যাঁ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে ! আমি নিজের চোখে দেখলাম ! সিনেমার ঘরসুদ্ধ লোক 'হরি-হরি' ক'রে উঠল ! এই তোর গা ছুঁয়ে বল্‌ছি, নিজে দেখেছি সিনেমায় ! বিষ্ণু নিজের মুখে বললেন, ও' জাত-টাত কিছু নয়—সব বাজে !

নাগমণি বলল,—আচ্ছা, কোণ্ডা ?

—কী ? শিগ্‌গির বল্, ঐ দেখ্, সব লোক জাগছে, লছমীও উঠবে এখুনি !

মুখ টিপে আবার হাসে মেয়েটি, বলে,—ভয় করিস্ বুঝি লছমীকে ?

—ভয় !—কোণ্ডা ব'লে ওঠে,—ভয় আমি কাউকে করি না, হ্যাঁ ! নে, বল্, যা বলবি, বল্ ?

—দেখ্ কোণ্ডা ?

—হ্যাঁ ?

নাগমণি বলে,—আমি তোদের ত কেউ না। আমি চলে যাই। আমাকে খুঁজিস্ না, কেমন ?

—কিন্তু, যাবি কেন তুই ? আমাদের সঙ্গে থাক্, কাপড় কাচা ধর্, পয়সা পাবি, বেশ চলে যাবে !

—না, ওসব আমাকে দিয়ে হবে না !

—হবে, হবে, খুব হবে। আমি তোকে সব শিখিয়ে দেবো। আর, এরা খুব ভালো লোক, জানিস্ ?

নাগমণি বলে,—জানি। লছমীর মতো মেয়ে হয় না !

—ঠিক বলেছিস্ !—কোণ্ডা বলে,—বড়ো ভালো মেয়ে, শুধু আমার ওপরই চটা ! তোকে ও' ভালবাসে—ভীষণ ভালবাসে !

মুহূর্তে নির্বাক্ হ'য়ে যায় চঞ্চল লোকটি, নিথর দাঁড়িয়ে থাকে। ওদিকে লছমীদের বাড়িতে, পাড়ায়, সত্যিই জাগরণের আভাস ফুটে ওঠে। নোকন্নার কাশির শব্দ শোনা যায়,—লছমী হয়ত এইবার উঠবে। জাগবে রজকজীবনের দৈনন্দিন কর্ম-চাঞ্চল্য !

কোণ্ডার মুখের দিয়ে তাকিয়ে কেমন একটা অব্যক্ত বেদনায় গুম্‌রে ওঠে অন্তরটা, সঙ্গে-সঙ্গে জেগে ওঠে একটা অদ্ভুত কৌতুক ! কোণ্ডা খুব কাছে এসে ওর একখানা হাত চেপে ধ'রে, বলে,—চল্, তোতে আমাতে সারাদিন ধ'রে খানিকটা ঘুরে আসি ! বেশ মজা হবে ! নদীর সারাটা কিনারা ধ'রে আমাদের খুঁজে বেড়াবে লছমী !

নাগমণি হেসে এতক্ষণে চলতে থাকে। পিছন পিছন আসে কোণ্ডা,—যাবি ত ?

কে শোনে ওর কথা ? নাগমণি প্রায় ছুটতে থাকে।

—যাবি ত ?

ততক্ষণে গোদাবরীর তীরে এসে পড়েছে ওরা ! অন্ধকার এখনো ঠিক ফিকে হয়নি, লোক চলাচল শুরু হয়নি এখনো।

—যাবি ত ?

নাগমণি হেসে বলে,—তুই ওদিকে যা। আমি চান সেরে নি।

—আমি ?

নাগমণি ঝংকার দিয়ে ওঠে,—তুই ওদিকে যা বলছি! দূরে গিয়ে চান সেরে নে!

নদীবক্ষ খুব অস্পষ্ট চোখে পড়ে। তারা-জ্বলা শেষরাত্রির অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায় ওরা—দুজন দুদিকে। দুটি অন্ধকারের শিশু যেন মায়ের কোলের আরামের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েকটি মুহূর্তের জন্য!

কিন্তু এ আরাম বেশীক্ষণ ভোগ করা চলবে না। কী দ্রুত ফরসা হ'য়ে আসছে চারদিক্! যেন মুহূর্তে একটা পট পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে! চারদিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে ঘনঘন কয়েকটা ডুব দিয়ে চট্ ক'রে উঠে পড়ে নাগমণি, অন্ধকারে সঞ্চরমাণ একটি সরল বিদ্যুৎ রেখার মতো ছুটে গিয়ে তুলে নেয় শাড়িটা। কিন্তু পথের ওপর ওরা কারা? রজকের দল ত এখনো আসেনি, কোটিলিঙ্গম-দেবতার ঘাটে এখনো জটলা জাগেনি অবধানী ব্রাহ্মণদের। নির্জন পথের ওপর দিয়ে কে যায় এখন? হাতে একটা হারিকেন, কে একটি মহিলা যেন অনর্গল কথা বলতে বলতে চলেছেন, সঙ্গে একটি পুরুষ। পুরুষটি কথা কইতেই কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল নাগমণি। এ কী! এ যে তাদের পণ্ডিত! কোথায় চলেছে এ ভাবে? সঙ্গের মহিলাটি কে? একটু এগিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে লক্ষ্য করল নাগমণি, মহিলাটি লছমী নয়, প্রৌঢ়া, এর আগে ওঁকে কোনদিন আর দেখেনি সে!

প্রবল কৌতূহলের বশে হয়ত ওদের পিছনে অনেকটা দূরই এগিয়ে যেত নাগমণি, বাধা দিল কোণ্ডা। সে নিশ্চয়ই দূর থেকে লক্ষ্য করেছে ওর গতিবিধি, ওকে চলতে দেখেই ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এসেছে।

—এ-ই যাস্ কোথায় ?

—যেখানেই যাই না, তোর তাতে কী ?

কিন্তু বলতে বলতে ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে

ওঠে নাগমণি। কোণ্ডার হাতে শুকনো জামাটা, পরনের ধুতিটা ভেজা। অর্থাৎ স্নান করতে গিয়ে ধুতিটা ভিজিয়েছে! ও মেয়ে হ'য়ে যে বুদ্ধির আশ্রয় নিতে পারল, কোণ্ডা পুরুষ হ'য়েও তা' পারেনি!

—এ-ই হাসছিস্ যে?

নাগমণি হাসি থামিয়ে বলে,—কোণ্ডা! পণ্ডিত কোথায় যাচ্ছে বল্ ত?

—পণ্ডিত!

—হ্যাঁ! ঐ দেখ্ সামনে। থম্‌কে দাঁড়িয়েছে আমাদের কথা শুনে হয়ত। স'রে আয়। সঙ্গে এক বুড়ী।

কোণ্ডা বলে,—বুড়ী? তবে হয়ত আমাদের পার্বতী-মা।

—পার্বতী-মা আবার কে?

—আছে একজন। তুই বুঝবি না! চল্, আমরা এই গলির মধ্য দিয়ে-দিয়ে চলে যাই। ও পার্বতী-মা, বামুনের মেয়ে, হয়ত মন্ত্রতন্ত্র পড়ানোর কিছু দরকার হয়ে পড়েছে, তাই নিয়ে যাচ্ছে পণ্ডিতকে। পণ্ডিত আমাদের সঙ্গে থাকলে কী হয়, আসলে বামুনের ছেলে, সাপের বাচ্চা সাপ।

পথ চলতে চলতে সত্যিই থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল সোমনাথ, এভাবে হেসে উঠল কে তার পিছনে? যেন তার অবস্থাটাকেই ব্যঙ্গ করছে কেউ অদম্য কৌতুকে! কাল সারারাত দুশ্চিন্তার ঝড় পেয়ে বসেছিল সোমনাথকে। মাঝে মাঝে এ রকম হয়। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মনের দিগন্তে জাগে আশঙ্কার কালো মেঘ, দেখতে দেখতে মেঘময় হয়ে ওঠে সমস্ত মন,—সমস্ত চেতনাকে যেন বিপর্যস্ত ক'রে বইতে থাকে চিন্তার ঝড়! প্রায় রাত্রিই এ রকম তার কাটছে আজকাল, সকালে ঘুম-ভাঙবার মুহূর্তে অবসন্ন লাগে সর্বশরীর, তবু অভ্যাসবশে উঠে পড়ে বিছানা থেকে, চলে আসে নদীর তীরে। গোদাবরীর প্রভাতী হাওয়া তার মায়ের স্নেহপরশ হ'য়ে দূর ক'রে দেয় তার দেহমনের সমস্ত ক্লান্তি।

কিন্তু কিসের তার অতো চিন্তা? তার অ-সহজ জীবনের—সর্বোপরি তার এই অপরূপ প্রবীণ মনটির।—কাল সারারাত কতো কী সে ভাবছিল শুয়ে শুয়ে—তার স্বর্গগতা মায়ের কথা, তার বাবার কথা। কাল রাত্রে বাবার কথাটাই হঠাৎ বেশী ক'রে পড়ছিল মনে। সকাল বেলায় ঘাটে নিজের ছেলেকেই যজমান বলে ভুল ক'রে পিতৃতর্পণ করবার অনুরোধ,—এর মধ্যে নেই ত লুকিয়ে ভবিতব্যের কোনো নিগূঢ় ইঙ্গিত?···শেষরাত্রির দিকে ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে। পার্বতী-মার কণ্ঠস্বরে ধড়মড় ক'রে জেগে উঠেছিল সোমনাথ।

—পার্বতী-মা।

হ্যারিকেনটা হাতে, প্রৌঢ়া মহিলাটি ততক্ষণে ব'সে পড়েছিলেন তার বন্ধ দরজার সামনে। বললেন,—সোমনাথ, তোর বাড়ি খুঁজতেই হয়রান হয়ে গেলাম! অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, আর, বয়স ত হলো।

—কী হয়েছে পার্বতী-মা!

প্রৌঢ়া উঠে দাঁড়িয়েছেন, বললেন,—আয় আমার সঙ্গে।

—কী হ'য়েছে! আমার বাবার···

প্রৌঢ়া সস্নেহ ভঙ্গিতে তার চিবুকে ছোঁয়ালেন তাঁর হাতের আঙুল,—তাইত বলি, বাপের প্রতি ছেলের টান, এ যে নাড়ীর টান। এদিক্ কিংবা ওদিক্ টললেই নাড়ীতে টান পড়বে। বাপের বিপদে ছেলে কী চুপ ক'রে থাকতে পারবে? ছুটে যে আসতেই হবে তাকে!

—কী বিপদ পার্বতী-মা!

—তোর বাবা প্রায় পাগলের মতো, কৃষ্ণবেণী নিথর—সাড়া নেই, শব্দ নেই—চুপচাপ ব'সে আছে। আমি খবর শুনেই দেখতে গেলাম, কতো কী করলাম, তোদের জেঠামশাই মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক্ কতো কী করলেন, কিন্তু কিছুতেই আর রাখা গেল না,—বেশ কয়েক দিন ধ'রেই

নাকি ভুগছিল মেয়েটা,—সর্দিজ্বর, বুকে ব্যথা। আহা! ফুলের মত মেয়েটি গো! আড়াই বছরের নিষ্পাপ শিশু!

—বোন! আমার বোনের কথা বল্‌ছ?

—হ্যাঁ। তোর বোন। শুনেছিলি ত কী সুন্দর হয়েছিল দেখতে! কৃষ্ণবেণীর মুখখানা একেবারে বসানো!

—পার্বতী-মা?

—কী?

সোমনাথ বলে,—আমার কী যাওয়া উচিত? আমাকে কী বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন?

—নাই বা পাঠালো! তোর কর্তব্য বলে কিছু নেই? আমি এসেছি কী জন্যে, তোকে নিয়েই যাবো! তোর জেঠা, কাকারা যে-যার কাজে গেছে এদিক্-ওদিক্, মেয়েরা কেউ কাছে এলো না, ঘরে মৃত শিশুর শিয়রে ব'সে আছে কৃষ্ণবেণী, আর তোর বুড়ো বাপ বুক চাপ্‌ড়াচ্ছে পাগলের মতো! বড়ো ভালবাসত কিনা মেয়েটাকে; আমি একা আর সামলাই কী ক'রে! ওদের অবস্থা দেখে আমিই কী ঠিক রাখ্‌তে পারি নিজেকে! তুই চল্‌।

—চলো পার্বতী-মা।

অবস্থাটা অদ্ভুত। যে শিশুকে সে কোনদিন দেখেনি, সেই শিশুটির জন্য আজ সত্যিই মনটা কাঁদছে! দ্বিগুণ দুঃখ হয় বৃদ্ধ পিতার জন্য! শেষ বয়সের শিশু সন্তান,—স্নেহার্দ্র মনের হয়ত ছিল একমাত্র অবলম্বন! সৎ-মা কৃষ্ণবেণীব মুখখানা মনেই পড়ে না! তাঁকে সে দেখেছিলই বা কয়দিন? কিন্তু পার্বতী-মা? আজীবন কুমারী এই প্রৌঢ়া কিসের আকর্ষণে ছুটোছুটি করছেন এই শেষ রাত্রে?

স্বচ্ছ হ'য়ে আসছে চারদিক্। অশ্বত্থ চূড়ায় পাখিদের কলরব। এই ঘাটটার কাছে আসতেই মার কথা মনে পড়ে যায়। গোদাবরীতে স্নান সেরে অস্পষ্ট প্রভাতী আলোর আবছায়ার মধ্য দিয়ে ঐ যেন উঠে আসছে তার মা, ভিজে চুলের গোছা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জলের

বিন্দু গড়িয়ে পড়ছে, ভিজে পায়ের ছাপ এঁকে এঁকে তারই কাছে এগিয়ে আসছে তার মা, হাসিমুখে বলছে,—সোমা! ভালো আছিস্!

কিন্তু পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যায় তার মায়ের ছায়া, পার্বতী-মা ব'লে ওঠে,—এ কী, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন সোমনাথ? চল্। গোদাবরী-প্রণাম সেরে নিলি বুঝি মনে মনে? হ্যাঁ, অনেকে তা' করে বটে। নদীও মা, নদী-মাতৃকা-দেবকন্যা। শোন্, একটা গল্প বলি শোন্। এক দেবকন্যা। শাপভ্রষ্টা হয়ে জন্মালো এসে এক গরিব ব্রাহ্মণের ঘরে। কী ঘর আলো-করা রূপ! শুনছিস্ সোমনাথ?

—শুনছি পার্বতী-মা।

—কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ্! মেয়ে যখন বড়ো-সড়ো হয়ে উঠল, তখন সে রঙের যেন আর তুলনা রইল না! আর মাথায় কী চুল! যেমনি কালো, তেমনি ঘন, খোঁপা ভেঙে এলিয়ে দিলে পিঠ বেয়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত আসে—

অতি দুঃখের দিনেও হাসি পায় সোমনাথের, কী অবস্থায় কিসের গল্প যে শুরু ক'রল পার্বতী-মা! কাঁচা সোনার মতো দেহের বর্ণ! হ্যাঁ, প্রৌঢ়ার দিকে তাকিয়ে এখনো সে কথা বিশ্বাস করা চলে। তবে কী পার্বতী-মা নিজেরই কাহিনী শুরু করল দেবকন্যার কাহিনীর অন্তরালে,—নিজেরই ফেলে-আসা দিনের সুখস্মৃতি? ইনিও একা। স্বজাতিরা সম্পর্ক রাখে না,—আজীবন কুমারী এই মহিলা, কিছু টাকা আর বাড়িখানা সম্বল ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তীর্থে তীর্থে—একা, একেবারে একা!

—শুনছিস্ সোমনাথ?

—হ্যাঁ, বলো।

—মেয়ে যেন রূপ-গুণে লক্ষ্মী! এক সৎ-ব্রাহ্মণের সঙ্গেই বিয়ে হ'লো মেয়ের। গলায় 'মঙ্গলসূত্রম্' ছাড়া আর কোনো অলংকার নেই,—কন্যা এলেন স্বামীর ঘরে। কিন্তু ওকে কী বলে ঘর? খড়ে-ছাওয়া ভাঙা এক কুঁড়ে, তারি মধ্যে এসে উঠলেন স্বামীর সঙ্গে।

দিন যায়। খুবই গরিব অবস্থা, একবেলা খাওয়া জোটে ত অন্যবেলা জোটে না। তবু, মুখে হাসিটি ছাড়া নেই। স্বামীকে কী ভাবে সেবায়-যত্নে সুখী রাখবেন, ওই তাঁর একমাত্র চিন্তা। স্বামীর মঙ্গল-কামনায় মন্দিরে গিয়ে হত্যা দেন, ব্রত আর উপবাস লেগেই আছে। এই ক'রে ত দিন চলে। কিন্তু একদিন কী হলো, জানিস্ সোমনাথ?

—কী?

—একদিন দূরের একটা মন্দির থেকে ফিরছেন কন্যা, বেলা গড়িয়ে গেছে। পূজো সেরে ফিরতে হ'য়ে গেছে যথেষ্ট দেরি, না-জানি ঘরে ব'সে কতোই ভাবছেন তাঁর স্বামী,—পথ সংক্ষেপ করতে গিয়ে একটা নির্জন বনের পথ ধরলেন কন্যা। এটাই হ'লো তাঁর ভুল। কাঁচা বয়স আর অমন রূপ! একজন দুষ্টু লোক অলক্ষ্যে তাঁর পিছু ধরল। রূপে মুগ্ধ সেই কামাচারীর আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার ধৈর্য ছিল না, কন্যাকে ঐভাবে একা পেয়ে তাঁর সর্বনাশ ক'রে বসল সেই নরপিশাচ।

বিপর্যস্ত কলুষিত দেহমন নিয়েই ফিরে এলেন ঘরে। সে এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা তাঁর। একদিকে স্বামীর প্রতি আকর্ষণ,—অন্যদিকে কলুষিত দেহ! স্বামীকে সব বলতে গিয়েও মুখে বেধে যায়,—অথচ, ধীরে ধীরে যখন প্রকাশ পেলো গর্ভলক্ষণ,—তখন ভয়ে আর আশঙ্কায় ভীষণ অস্থির হয়ে পড়লেন মনে-মনে।

স্বামী গেলেন এই সময় কয়েক মাসের জন্য নানান দেশের নানান যজমানদের বাড়ি, প্রতি বছরেই একটা সময়ে তিনি এইরকম যান, কিছু প্রাপ্তিও তাঁর হয় এই সময়।

তাঁকে বলা হ'লো না কিছুই। অথচ, এভাবে দেহভার আর বহন করা চলে না, ভেবে-ভেবে চোখে ঘুম নেই, মনেও শান্তি নেই। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করা ছাড়া যেন আর উপায় রইল না! কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা তাঁকে করতেই হবে; নিষ্পাপ শিশুর জীবন নেবার তাঁর অধিকার নেই। যথাসময়ে এলো তাঁর কোলে শিশু।

একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। আত্মহত্যা করা আর তাঁর হ'লো না, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে করুণায় ভ'রে গেল মায়ের মন।

স্বামী কিন্তু সব শুনে ক্ষমা করতে পারলেন না। অতি নিষ্ঠুরের মতই তাড়িয়ে দিলেন কন্যাকে। অসহায় কন্যা এলেন আবার বনে, এক বন্য শবর-কন্যার দয়ায় উঠলেন এসে তাঁর আশ্রয়ে। ছেলেটিকে বুকে ক'রে কাটতে লাগল দিন। মাতৃত্বের আস্বাদ যেন তাঁর সব দুঃখ আর লাঞ্ছনা ভুলিয়ে দিয়েছে! ক্রমে বড়ো হ'লো ছেলেটি। একদিন কোলে ক'রে ছেলেটিকে রেখে এলেন এক দয়ালু ঋষির আশ্রমে,—সব শুনে মুখ ফেরালেন না ঋষি—ছেলেটির শিক্ষার সমস্ত ভার তুলে নিলেন নিজের হাতে। আর, এদিকে কন্যা ফিরে এসে নিজে বসলেন,—তপস্যায়,—কঠোর তপস্যায়!

—এ' কার গল্প বলছ, পার্বতী-মা?

—শোন্ বাবা। দেবতা এলেন বব দিতে। কন্যা বললেন,—আর কোনো বর চাই না, শুধু এই করো ঠাকুর, এই বিশ্বের সব শিশুদের যেন মঙ্গল হয়! দেবতা প্রসন্ন হ'য়ে বললেন,—তথাস্তু।...কন্যা হলেন করুণাময়ী। ঋষির আশ্রমে শিশুরা যেখানে মানুষ হ'চ্ছে, গৃহীর আঙিনায় যেখানে আসছে মায়ের-কোল-আলো-করা ফুলের মতো আনন্দময় সুন্দর শিশুরা, তারই পাশ দিয়ে দিয়ে নদী হ'য়ে ব'য়ে চললেন সেই করুণামযী কন্যা। এই কন্যাই গোদাবরী,—দেবকন্যা গোদাবরী।

ঠিক এই সময়েই নদীর তীর ছেড়ে তাদের সাবেক বাড়িব গলি-পথে ঢুকতে হ'লো। কাহিনীটি হয়ত রূপক, হয়ত বা কেউ নিজের মনের দুঃখ-বেদনা মাধুর্যকে রূপ দিয়ে গেছে এই গল্প ও কাহিনীর মধ্য দিয়ে। গল্প ত এইভাবেই গ'ড়ে ওঠে! গ'ড়ে উঠে স্থান ক'রে নেয় হৃদয়ে হৃদয়ে। এই কাহিনীতে যে বেদনা আছে, যে করুণ ভাব আছে, হয়ত পার্বতী-মা, পেয়েছে খুঁজে তা'তে নিজের অনুভূতির কোনো মিল!

সোমনাথ বলে,—এ' গল্প তুমি কোথা থেকে শুনলে পার্বতী-মা ?

—নাসিকে এক ভক্ত সাধু আমাকে এ' গল্পটা বলেছিলেন বাবা। শুনে এতো ভালো লেগেছিল যে কী বলব! করুণাময়ী দেবকন্যার করুণার শেষ নেই, শাপ তাঁর মোচন হ'য়ে গিয়েছিল বাবা, কিন্তু তিনি আর ফিরে গেলেন না স্বর্গে,—আমাদের জন্য, মা আমাদের আজও ব'য়ে চ'লেছেন! ···এ' গল্প ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে নাকি আছে বাবা।

নীববেই চলতে থাকে সোমনাথ। ঐ ত দেখা যাচ্ছে তাদের বাড়ি। কিছুদূর থেকেই শোনা যায় গুম্‌রে-গুম্‌রে চাপা কান্নার করুণ একটানা ধ্বনি। তাব জেঠামশায় দাঁতন হাতে বসে আছে তার ঘরেব দাওয়ায়,—সোমনাথদের বাসার দরজা খোলা; সেই খোলা দবজা দিয়ে ম্লান আলো এসে প'ড়েছে পথে, উষার আভাসে পথ আলোকিত হ'য়ে উঠেছে,—উষাব আলো আর ঘরেব ভিতরকার ঐ আলো, সব মিলিয়ে ঘরের সামনে এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি ক'বেছে।

—বাবা!

—কে?—দরজাব কাছ থেকে সাড়া দিলেন বেণুগোপাল আচারী। কয়েক মুহূর্ত্ত চেষ্টাব পব তবে যেন চিনতে পারলেন সোমনাথকে। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, বললেন,—নিতে এসেছিস্! নিয়ে যা—ঐ ত শুয়ে আছে মায়ের কোলের কাছে!

সত্যিই শুয়ে আছে, যেন ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্ত আরামে। অন্তিমে এঁরা যে অনুষ্ঠান ক'রে থাকেন, তা' বোধ হয় সারা হ'য়ে গেছে, কপালে চন্দন-বিন্দু আর তুলসীর পাতা। গায়ে জড়ানো একটা নতুন-কেনা কোরা সাদা কাপড়। কৃষ্ণবেণী পাশে ব'সে নিশ্চল প্রস্তর খণ্ডের মতো। তার বাবার চেহারা দেখলে ভয়ই করে। একটা রাত্রের মধ্যে মানুষেব চেহারা যে এত ভেঙে পড়তে পারে, তা' না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব! যেন একটা কঙ্কাল-দেহ, দেহের সমস্ত সুষমা কে যেন নির্মমভাবে শুষে নিয়েছে!

শিশুটির গায়ে কোনো অলংকার নেই, সব খুলে নেওয়া হ'য়েছে। নিরাভরণ শিশুটি যেন সমস্ত ভার থেকে মুক্ত হ'য়ে মহাযাত্রার প্রতীক্ষা করছে! সত্যিই সুন্দর! মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ চুল, ভ্রূদুটি যেন নিপুণ তুলিকায় আঁকা। চোখ দুটি বুজে র'য়েছে, চোখের পাতায় ঘনপল্লব! ওকে সে কী একবার বুকে তুলে শেষবারের মতো আদর ক'রে নেবে!

—তুমি ঘরের ভিতরে যেও না সোমনাথ, ওকে ছুঁয়ো না।

—ছোঁব না!—বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো চম্‌কে ওঠে সোমনাথ, ফিরে আসে ঘরের দরজা থেকে। তার বাবা নয়, তার স্থবির জেঠামশায়, আর তাঁর দুই ছেলে। জেঠামশায় আবার বললেন,—ওদিকে স'রে দাঁড়াও, সোমনাথ। তুমি আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, তুমি পতিত! এখন আমাদেরও ছুঁয়ো না। শিশুটিকে নিয়ে যেতে হবে ত? ওঠো বেণুগোপাল, এখনি যা' করবার করতে হবে। অমৃতযোগ থাকতে থাকতেই কার্য সমাধা করতে হবে!—

বেণুগোপাল আচারীর যেন আর কাঁদবারও শক্তি নেই, বললেন, —নিয়ে যাবে! এখনই নিয়ে যাবে!

সোমনাথ চোখ তুলে তাকায়, হ্যাঁ সকাল হ'য়ে গেছে। পূবের আকাশ রক্তের মতো লাল। গলিতে অনেক লোক। পাড়ার ক্ষৌরকারদের দু'জন বৃদ্ধ এসেছে, একজনের হাতে সানাই, অপরের হাতে ঢোল। অতি সমারোহেই ত শুরু হয় এই অন্তিম পথযাত্রা! চিরাচরিত রীতি। কিন্তু অভাব সেই সমারোহের স্মৃতিকে আজ ব্যঙ্গই করছে! কোথায় সেই রাজকীয় শোভাযাত্রা, আর কোথায় এই ভাঙা ঢুলি আর ভাঙা সানাই! ভেঙে যাচ্ছে—সবই ভেঙে যাচ্ছে!

পার্বতী-মাও দাঁড়িয়েছিলেন একটু সরে, তাঁকেও কেউ ছোঁবে না, মিথ্যা অপবাদ এই করুণাময়ী মহিলাটিকেও ওদের কাছে অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছে! সোমনাথ ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালো ওঁর কাছে।

দেখতে লাগল অপরূপ অনুষ্ঠানের অভিনয়। ভাঙা সানাই বেজে উঠল সবার কান্নাকে চাপা দিয়ে। জীর্ণতার বেসুর আর্তনাদ !··· শিশুটিকে অবশেষে ছিনিয়ে আনল ওরা মায়ের কোল থেকে। শুরু হ'লো মহাযাত্রা ! তারপর এক সময় শোভাযাত্রা তাদের সরু অপরিষ্কার গলি থেকে মিলিয়ে গেল।

পার্বতী-মার ডাকে আচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠল সোমনাথ। সেই সরু গলি, সেই স্যাঁতসেঁতে পুরানো তাদের বাড়ি, একপাশের দেয়াল ভেঙে অশ্বত্থচারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে !

—সোমনাথ ?

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে পার্বতী-মা বললেন, ধরা-ধরা কান্নাভরা কণ্ঠস্বর,—ঘরের দিকে চল্ বাবা। তোর বুড়ো বাপ বোধ হয় অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছে !

—অজ্ঞান !

ছুটে ঘরেব মধ্যে এলো সোমনাথ,—বাবা-বাবা !

সত্যিই অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে প'ড়ে আছেন বৃদ্ধ, যেন দেহ থেকে হৃদ্‌পিণ্ডটাই কেউ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে ! মাথায় জল দিয়েছে কৃষ্ণবেণী, কোলের ওপর বৃদ্ধেব মাথাটা টেনে নিয়ে পাখার বাতাস করছে। এবারেও সে নীরব,—এবারেও ধৈর্য সে হারায় নি !

কবে থেকে এ'রকম হ'চ্ছে ?—সোমনাথের এই প্রথম কথা বলা কৃষ্ণবেণীর সঙ্গে। কৃষ্ণবেণী মুখ তুলল, পরক্ষণেই নামালো মুখ, ধীর শান্তকণ্ঠে বলল,—কিছুদিন থেকেই এ'রকম হ'চ্ছে। আজ কিছু বেশী।

পার্বতী-মা একঘটি জল নিয়ে এসে ওঁর মুখচোখে দিতে লাগলেন জলের ছিটে। কিছুক্ষণ পরেই জাগরণের লক্ষণ দেখা গেল, মৃত শিশু কন্যার নাম মুখে নিয়ে বৃদ্ধ ক্রমশ ফিরে আসতে লাগলেন চেতনার রাজ্যে।

কৃষ্ণবেণী ঠিক তেমনি শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল,—তোমরা এবার ঘরে যাও। কী করবে আর এখানে থেকে ?

শিশুটির গায়ে কোনো অলংকার নেই, সব খুলে নেওয়া হ'য়েছে। নিরাভরণ শিশুটি যেন সমস্ত ভার থেকে মুক্ত হ'য়ে মহাযাত্রার প্রতীক্ষা করছে! সত্যিই সুন্দর! মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ চুল, ভ্রূদুটি যেন নিপুণ তুলিকায় আঁকা। চোখ দুটি বুজে র'য়েছে, চোখের পাতায় ঘনপল্লব! ওকে সে কী একবার বুকে তুলে শেষবারের মতো আদর ক'রে নেবে!

—তুমি ঘরের ভিতরে যেও না সোমনাথ, ওকে ছুঁয়ো না।

—ছোঁব না!—বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো চম্‌কে ওঠে সোমনাথ, ফিরে আসে ঘরের দরজা থেকে। তার বাবা নয়, তার স্থবির জেঠামশায়, আর তাঁর দুই ছেলে। জেঠামশায় আবার বললেন,—ওদিকে স'রে দাঁড়াও, সোমনাথ। তুমি আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, তুমি পতিত! এখন আমাদেরও ছুঁয়ো না। শিশুটিকে নিয়ে যেতে হবে ত? ওঠো বেণুগোপাল, এখনি যা' করবার করতে হবে। অমৃতযোগ থাকতে থাকতেই কার্য সমাধা করতে হবে!—

বেণুগোপাল আচারীর যেন আর কাঁদবারও শক্তি নেই, বললেন,—নিয়ে যাবে! এখনই নিয়ে যাবে!

সোমনাথ চোখ তুলে তাকায়, হ্যাঁ। সকাল হ'য়ে গেছে। পূবের আকাশ রক্তের মতো লাল। গলিতে অনেক লোক। পাড়ার ক্ষৌরকারদের দু'জন বৃদ্ধ এসেছে, একজনের হাতে সানাই, অপরের হাতে ঢোল। অতি সমারোহেই ত শুরু হয় এই অন্তিম পথযাত্রা! চিরাচরিত রীতি। কিন্তু অভাব সেই সমারোহের স্মৃতিকে আজ ব্যঙ্গই করছে! কোথায় সেই রাজকীয় শোভাযাত্রা, আর কোথায় এই ভাঙা ঢুলি আর ভাঙা সানাই! ভেঙে যাচ্ছে—সবই ভেঙে যাচ্ছে!

পার্বতী-মাও দাঁড়িয়েছিলেন একটু সরে, তাঁকেও কেউ ছোঁবে না, মিথ্যা অপবাদ এই করুণাময়ী মহিলাটিকেও ওদের কাছে অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছে! সোমনাথ ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালো ওঁর কাছে।

দেখতে লাগল অপরূপ অনুষ্ঠানের অভিনয়। ভাঙা সানাই বেজে উঠল সবার কান্নাকে চাপা দিয়ে। জীর্ণতার বেসুর আর্তনাদ!... শিশুটিকে অবশেষে ছিনিয়ে আনল ওরা মায়ের কোল থেকে। শুরু হ'লো মহাযাত্রা! তারপর এক সময় শোভাযাত্রা তাদের সরু অপরিষ্কার গলি থেকে মিলিয়ে গেল।

পার্বতী-মার ডাকে আচ্ছন্নতা থেকে জেগে উঠল সোমনাথ। সেই সরু গলি, সেই স্যাঁতসেঁতে পুবানো তাদের বাড়ি, একপাশের দেয়াল ভেঙে অশ্বত্থচারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

—সোমনাথ?

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে পার্বতী-মা বললেন, ধরা-ধরা কান্নাভরা কণ্ঠস্বর,—ঘরের দিকে চল্ বাবা। তোর বুড়ো বাপ বোধ হয় অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছে!

—অজ্ঞান!

ছুটে ঘরেব মধ্যে এলো সোমনাথ,—বাবা-বাবা!

সত্যিই অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে প'ড়ে আছেন বৃদ্ধ, যেন দেহ থেকে হৃদ্‌পিণ্ডটাই কেউ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে! মাথায় জল দিয়েছে কৃষ্ণবেণী, কোলের ওপর বৃদ্ধেব মাথাটা টেনে নিয়ে পাখার বাতাস করছে। এবারেও সে নীরব,—এবারেও ধৈর্য সে হারায় নি!

কবে থেকে এ'রকম হ'চ্ছে?—সোমনাথের এই প্রথম কথা বলা কৃষ্ণবেণীর সঙ্গে। কৃষ্ণবেণী মুখ তুলল, পরক্ষণেই নামালো মুখ, ধীর শান্তকণ্ঠে বলল,—কিছুদিন থেকেই এ'রকম হ'চ্ছে। আজ কিছু বেশী।

পার্বতী-মা একঘটি জল নিয়ে এসে ওঁব মুখচোখে দিতে লাগলেন জলের ছিটে। কিছুক্ষণ পরেই জাগরণের লক্ষণ দেখা গেল, মৃত শিশু কন্যার নাম মুখে নিয়ে বৃদ্ধ ক্রমশ ফিবে আসতে লাগলেন চেতনার রাজ্যে।

কৃষ্ণবেণী ঠিক তেমনি শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল,—তোমরা এবার ঘরে যাও। কী করবে আর এখানে থেকে?

ঠিক। কী সে করবে এখানে বসে? ছিন্নবৃন্তের মতো প’ড়ে আছে সে একদিকে, এদের সঙ্গে কোনো সংযোগই নেই! হৃদয়াবেগের কোনো মূল্য আছে এ সংসারে? পার্বতী-মার অপ্রস্তুত করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে গোদাবরীর দিকে চলতে লাগল। পার্বতী-মা বোধ হয় পিছন থেকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

গোদাবরীর তীর। উঁচু পাড় থেকে নেমে সোজা চলে গেল সে জলের দিকে। ঠিক সামনেই অদূরে কয়েকটা বড়ো পাথর নদীর বুকে জেগে আছে, জলটুকু সাঁত্‌রে পার হ’য়ে বসবে গিয়ে সে ঐ পাথরের ওপরে! জল ছলছল ক’রে ব’য়ে যাবে পাথরের পাশ কাটিয়ে, মৃদু ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস স্পর্শ করে যাবে অবসন্ন শরীর! আর সে ভাববে তার হারানো মায়ের কথা! মাকে তার আজ বড্ড মনে পড়ছে।

জলের ওপর জেগে থাকা ঐ বড়ো পাষাণখণ্ডটি যেন একটি নির্জন নিস্তব্ধ দ্বীপ,—একটি সাদা বক নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে তপস্বীর মতো, একা, চুপচাপ,—যেন কোনো এক নিগূঢ় চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে।

জল ঠেলে পাথরটার দিকেই এগিয়ে আসছিল সোমনাথ, ঐ ধ্যানী বকটির দিকে চোখ পড়তেই থম্‌কে দাঁড়াল। দেখতে বড়ো ভাল লাগছিল। সাদা মসৃণ পালকগুলির ওপরে প্রথম উষার আলো এসে পড়েছে,—লাল লাল আভা,—অপরূপ উজ্জ্বলতা।

দরকার নেই ওর শান্তি ভঙ্গ ক’রে। সোমনাথ মুখ ফিরিয়ে ঘাটের দিকে তাকালো। যেখানে সে নেমেছে, সেটা ঘাট নয়। ঐ বকটির মতো সে-ও একা,—ঘাটের ভিড় থেকে দূরে এসে স্নান করছে। তার চারিদিকে তীর ঘেঁষে অজস্র কাঠ ভাসছে। গুছি

ক'রে বেঁধে কাঠের ব্যাপারীরা এমনি ক'রে ভাসিয়ে রাখে বেশ কিছুদিন, তারপরে তুলে নেয় ওপরে। বর্ষার সময় বনের কাঠ কেটে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে আসে,—কাঠের কারবারীদের এটা বহুদিনের রীতি।

আকণ্ঠ ডুবে থেকে ভেসে-থাকা কাঠের স্তূপের দিকে তাকিয়ে থাকে সোমনাথ। একটা মোটা কাঠের মুখ এমনভাবে কাটা যেন মনে হয় ওটা কাঠ নয়, অতিকায় কুমীর,—তার ওপরে এখুনি এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, নিয়ে যাবে দূরে—দূরে—হয়ত ঐ বিরাট সেতুটির কাছে, যেখানে গোদাবরী এখনো গভীর, সেখানে তাকে নিয়ে দেবে ডুব,—একেবারে জলের তলায়!

না, কুমীরের উৎপাতের কথা এ নদীতে শোনা যায় না। আর, গোদাবরীর তলদেশ? কতো পাথরের স্তূপ, হয়ত কতো অনাবিষ্কৃত রত্ন! শোনা যায়, জগদ্বিখ্যাত কোহিনূর এই গোদাবরী থেকেই পাওয়া গিয়েছিল; প্রথম অবস্থায় কোহিনূরের ওজন ছিল চারশো আশি গ্রেণ। কে জানে, হয়ত গোদাবরীর কোনো অংশে আছে হীরের খনি, কে বলতে পারে? আজো মাঝে মাঝে রত্নসন্ধানী চেট্টির দল নৌকো নিয়ে ভেসে পড়ে গোদাবরীতে, আরো উজিয়ে যায় ভদ্রাচলমের দিকে। ঐ রকম জলের বুকে জেগে-থাকা পাথরের স্তূপগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখে, হীরে না হয়ত পোখরাজ, পোখরাজ নয়ত বৈদূর্যমণি,—কী ওরা পায় কে জানে,—উদ্যমের ওদের আজো শেষ নেই!

আ! অবগাহন-স্নানে কী আরাম! জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে নিজের মনে শিশুর মতো খেলা করে সোমনাথ। দুটি হাত দুদিকে বিস্তৃত ক'রে বাঁ-হাত দিয়ে জল ছুঁড়ে দেয় ডান হাতের দিকে, ডান হাতের জল বাঁয়ের দিকে! মনটা কৌতুকের নেশায় মুহূর্তে ভ'রে ওঠে। নিজের সঙ্গে নিজের এ' এক অপূর্ব খেলা! জল নিয়ে এভাবে তাড়না করতে করতে আরেকটি খেলার কথা মনে পড়ে যায় সোম-

নাথের। ইতিহাস-বিখ্যাত 'শালিবাহন' বা 'সাতবাহন' রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অন্ধ্ররাজা সিমুক সাতবাহনের গল্প এটা। রাজা ভালো লেখাপড়া শেখেন নি, সংস্কৃত তেমন জানতেন না। একদিন তাঁর রাণীদের নিয়ে তিনি স্নানে নেমেছেন, সরোবর কলহাস্যে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে, আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই! কেউ ডুব দিয়ে রাজাকে ছুঁয়ে একটু দূরে গিয়ে ভেসে উঠে কৌতুকে হেসে উঠছে, রাজা হাত বাড়িয়ে ধরতে এলে কেউ-বা জল ছুঁড়ে দিচ্ছে রাজার চোখে। রাজাও জল-ছোঁড়াছুঁড়ি খেলায় অবশেষে গেলেন মেতে। এক রাণী জলসিঞ্চন সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন,—"দেব, মোদকৈঃ পরিতাড়য়।" অর্থাৎ আর জল নিক্ষেপ করবেন না।···রাজা ভাবলেন, রাণী ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হ'য়ে মোদক অর্থাৎ মোয়া খেতে চাইছেন। তৎক্ষণাৎ রাণীর জন্য মোয়া আনালেন রাজা। হেসে উঠল সবাই।

"মোদকৈঃ পরিতাড়য়।"—না, না, আর জল নিক্ষেপ ক'রো না! সোমনাথের হাতদুটিও ক্লান্ত হ'য়ে এলো। রৌদ্রের তেজ দেখে বোঝা যায়, বেলা অনেক বেড়ে গেছে। ঐ ত দূরে রজকদলের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ চলেছে, হয়ত বা কাজ ওদের এতক্ষণে শেষ হ'য়ে এলো। হয়ত নাগমণি আর লছমী আজ এক সঙ্গে পাষাণখণ্ডের ওপরে কাপড়ের গোছা আছড়াতে ব্যস্ত। নাগমণি বারবার করছে ভুল, লছমী ব'কে উঠছে, খিলখিল ক'রে হেসে উঠছে নাগমণি। হয়ত কাপড়-আছড়াবার ভঙ্গিতে অলক্ষিতে তার দেহে ফুটে উঠছে নাচের কোন সূক্ষ্ম ভঙ্গিমা! মেয়েটার জীবনী শোনবার পর থেকে সোমনাথ যতটুকু ওকে লক্ষ্য ক'রেছে, মনে হয়েছে, সব সময়ই একটা নৃত্যের হিল্লোল যেন জেগে আছে মেয়েটির দেহে-মনে! দেহ নয়, যেন কালো-মেঘ-ঢাকা ঝঞ্ঝাদিনের প্রমত্তা গোদাবরীর একটি ঢেউ।

গোদাবরী! ভেসে-থাকা-কাঠগুলির কাছে জলের মৃদু শব্দ উঠছে, —ছল্‌-ছল্‌-ছলাৎ! কান পেতে শোনা যায় সেই মৃদু কাকলী! ছল্‌-

ছল্-ছলাৎ! গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে বালক সোমনাথ পড়েছে ঘুমিয়ে মেঝের ওপরে মায়ের পাশে,—মা হয়ত এক সময় ঘুম থেকে উঠে তার পাশে সেইখানটিতে বসেই গল্প করছেন প্রতিবেশিনী কারুর সঙ্গে,—ঘুম ভেঙে আসছে সোমনাথের,—চেতনার রাজ্যে ধীরে ধীরে ফিরে আসছে সোমনাথ,—মায়ের কণ্ঠস্বর অস্ফুট কাকলীর মতোই কানে এসে বাজছে! গোদাবরীর জলে মায়ের সেই কাকলীই যেন শুনতে পায় সোমনাথ—ছল্-ছল্-ছলাৎ!

কিন্তু স্নানের বিলাসে কতক্ষণ ডুবে থাকা যায়? উঠতেই হবে। তার মত অকেজো লোকের হাতেও এবার কাজ এসে প'ড়েছে। নোকন্নাদের জন্য দরখাস্ত নিয়ে দরবার করতে হবে,—সোডা নইলে ওদের কাজের সত্যিই অসুবিধা। কাল রাত্রেই দরখাস্তের একটা খসড়া ক'রে রেখেছে সে, ওটা টাইপ ক'রে নিতে হবে। তার চেনা টাইপ-শেখার ইস্কুলটায় গিয়ে কাজটা ক'রে নেওয়া সহজ, কিন্তু তা' সে করবে না। এই যক্ষ্মারোগীকে দেখে তার ভূতপূর্ব বন্ধুদের চোখে মুখে ফুটে উঠবে ভয়,—হয়ত সে হেসেই উঠবে তাদের রকম-সকম দেখে। যক্ষ্মারোগীকে দেখে বেশী ভয় পায় যক্ষ্মারোগীরাই। সত্যিই ক্ষয় ধ'রেছে ওদের মনে। হিংসা-দ্বেষ-নীচতা কুটিলতাটুকু নিয়ে কোন-ক্রমে বেঁচে আছে ওরা,—থাক্—দরকার নেই ওদের শান্তি ভঙ্গ করে। সে যাবে অপরিচিত কোনো জায়গায়—দরকার হ'লে এক ক্রোশ হেঁটে রাজমহেন্দ্রী শহরে। টাইপ করতে পয়সা লাগুক, তাতেও ক্ষতি নেই। জল থেকে ধীরে ধীরে উঠে পড়ল সোমনাথ। ভিজে শরীরেই বাসায় ফেরা যাক্। শরীর কী আর ভিজে থাকবে, বাসায় পৌঁছতে না-পৌঁছতেই হয়ে যাবে শুকনো খটখটে। স্নানের স্নিগ্ধতা শুষে নেবে গ্রীষ্মের এই প্রখর রৌদ্র!

পাড় পেরিয়ে পথের ওপর উঠে মুখ ফেরাতেই পার্বতী-মার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল সোমনাথের। হাতে জলের ঘটি, ইনিও আজ ওরই মতো বেলায় স্নান সেরে ফিরছেন। ম্লান একটু হেসে

বললেন,—তোরই জন্য বসেছিলাম বাবা। ঐ অশ্বত্থ দেবতার ছায়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোরই স্নান দেখছিলাম।

—কেন পার্বতী-মা, আমার জন্য এত বেলা পর্যন্ত বসেছিলে কেন?

—ছিলাম।—পার্বতী-মা আবার তেমনি একটু হাসলেন,—কতো কথা জ'মে আছে, কেন জানি না, তোর কাছে সব বলতে ইচ্ছা করে। আমার ত আর কথা বলার কেউ নেই, বাবা!

অপূর্ব কারুণ্যে ভ'রে গেল সোমনাথের মন, বলল,—পার্বতী-মা! চলো তোমাকে তোমার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি!

—না-না, তোকে তাহ'লে বড্ড ঘুরতে হবে, এই ভিজে কাপড়ে অতখানি ঘুরে কাজ নেই! এই এখানেই দাঁড়িয়ে দু'চারটে কথা। না-না, বেশী বেলা করব না।

চুপ ক'রে থাকে সোমনাথ। মনের আবেগ মনেই মিলিয়ে আসে। পার্বতী-মার বাড়ি যাওয়া তার হবে না। ওর বাড়ি যেতে গেলে নিজেদের বাড়ি মাঝে পড়বে, সেখানে যাওয়া সোমনাথের পক্ষে আর সত্যিই অসম্ভব। তবু, বৃদ্ধ পিতার অসহায় মুখখানা মনের কোণে ভেসে ওঠে।

—পার্বতী-মা!

—কী-বাবা?

সোমনাথ প্রশ্ন করে,—শ্মশানযাত্রীরা কী ফিরে এসেছে?

—না বাবা, এখনো আসেনি।

—বাবার অবস্থা এখন কেমন দেখে এলে?

একটু থেমে থেকে পার্বতী-মা বলল,—ভালো না। শয্যা নিয়েছেন আচারীমশায়। বাঁচবেন না।

—আমার বোনটিকে খুব ভালবাসতেন, তাই না?

—ভালবাসা?—পার্বতী-মা বলল,—শিশুটি ছিল যেন তোর বাবার বুকের একটি পাঁজর!

—বোনটি দেখতেও হয়েছিল খুব সুন্দর!

—হ্যাঁ, কৃষ্ণবেণীর মুখখানা একেবারে বসানো! সেই রকম টানা টানা চোখ, সেই রকম রেশমের মতো নরম চুল, একেবারে মুখের ডৌলটি পর্যন্ত হুবহু এক!

কৃষ্ণবেণী! ভালো ক'রে মুখখানা সে কখনই বা দেখল! বাবার সন্দেহাকুল অদ্ভুত আচরণগুলির ফল হ'য়েছিল এই, সে ওঁর কাছে কোনদিন যেতে পারেনি, ওঁর মুখের দিকে তাকাতে পারেনি, একটা অসহজ সংকুচিত মনোভাব নিয়ে সে দিন কাটিয়েছে!

পার্বতী-মা জিজ্ঞাসা করলেন,—কী ভাবছিস্ সোমনাথ? চল্ তোর সঙ্গে একটু হাঁটি, না হয় কথা বলতে বলতে তোর বাসা পর্যন্তই গেলাম!

ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে সোমনাথ,—না-না, সে কী! তুমি অতোটা হাঁটবে কেন পার্বতী-মা, এই এতো রোদ্দুরে? খুব কষ্ট হবে।

—কষ্ট?—হাসলেন পার্বতী-মা,—পথ চলতে আমার কষ্ট নেই! এই গতবারও কাশী-বিশ্বনাথের মন্দির পরিক্রমা ক'রে এসেছি চৌষট্টিবার। জানিস্ সোমনাথ। এদেশের যেখানে তুই আমাকে হাঁটতে বল্, মনের আনন্দে হেঁটে যাব। নাসিকে এক অবধূত আমাকে ব'লেছেন, এ'দেশের যে-কোনো পথই তীর্থপথ! এ'দেশের যে-কোনো স্থানই তীর্থস্থান! চল্ সোমনাথ, তোকে একটু এগিয়ে দেই। আমি ত কোটিলিঙ্গম্স্বামীর মন্দিরে যাবই! চল্!

একটু অবাক্ই হ'য়ে যায় সোমনাথ,—কী সহজেই না পার্বতী-মা বলতে পারলেন, এ'দেশের সমস্ত পথই তীর্থপথ! কী সহজ বিশ্বাস! এ' পথের কোন আবিলতাই কী ওঁর চোখে পড়ে না!

চলতে চলতে পার্বতী-মা বলে,—কৃষ্ণবেণী সত্যিই সুন্দরী। কিন্তু কিছু মনে করিস্ না, আচারীমশায়ের পাশে কী মানায় ঐ কাঁচাবয়সের মেয়েকে!

—এসব কথা তুলছ কেন, পার্বতী-মা!

প্রৌঢ়া হেসে বললেন,—কী জানি, তোর কথা ভাবতে বসলেই আমার কৃষ্ণবেণীর কথা মনে পড়ে যায়। সবই ত জানি ওর।

—কী জানো ?

হেসে উঠলেন পার্বতী-মা,—ঠিকই হ'য়েছে। এই গোদাবরীর তীরে এই ঘটনাই ত বারবার ঘটেছে। আশ্চর্যের কিছুই না। শোন্ সোমনাথ, একটা গল্প বলি।

—না, পার্বতী-মা, আজ তোমার গল্প থাক্। তোমার দেরি হবে বাড়ি ফিরতে।

—না-না, শোন্ না তুই !—পার্বতী-মা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ওঠেন, —আমার কিছু দেরি হবে না। নগরের এক কোণে এক সমৃদ্ধ পরিবারে জন্ম নিল এক শিশু-কন্যা, অপরূপ সুন্দরী ! আনন্দের সীমা নেই সংসারে। সুলক্ষণা মেয়ে ! জ্যোতিষী বললেন,—দেশজোড়া নাম কিনবে এই মেয়ে।

কে জানে এ' আবার কার গল্প শুরু করল পার্বতী-মা। চলতে চলতে নদীর তীরের দিকে তাকায় সোমনাথ—কোটিলিঙ্গম্-মন্দিরের ওদিকে নোকন্নার দল তাদের কাজে ব্যস্ত। শাড়ির ঘের দিয়ে তিনদিক্ ঢাকা কাপড় সিদ্ধ করবার সেই শাড়ি ঘরগুলি দূর থেকে চোখে পড়ে। হয়ত সব-থেকে-দূরের ঐ সবুজ ঘরটি লছমী আর নাগমণির। সবুজ মন নিয়ে সবুজ ঘর ক'রেছে ওরা !

—শুনছিস্ ? সোমনাথ ? পার্বতী-মার কণ্ঠস্বর আবার তার মনকে নাড়া দেয়,—শুনছিস্ ? মেয়েটি বড়ো হ'লো। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল তার রূপের খ্যাতি। শুধু রূপ ? নাচ-গানেও সমান পটু। সম্বন্ধ আসতে লাগল বহু বড়ো ঘর থেকে। অবশেষে এলেন শ্রীরাজরাজ নরেন্দ্র মহারাজ। কন্যার বাপ-মা ত স্বর্গ পেলেন হাতে ! স্বয়ং মহারাজ এসেছেন সম্বন্ধ নিয়ে। মেয়ের এর থেকে সৌভাগ্য আর কী কল্পনা করা যায় ? আর, রূপ ? মেয়ের রূপের খ্যাতি যেমন রটেছে চারিদিকে, তেমনি যুবরাজেরও। কতো চিত্রকর এসেছে দেশ-বিদেশ থেকে, যুবরাজের ছবি এঁকে নিয়ে গেছে। সেই যুবরাজের সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে স্বয়ং আসছেন বৃদ্ধ মহারাজ, মেয়ের

বাড়িতে উৎসবের ঘটা পড়ে গেল। নিজের ঘরের অলিন্দের পাশে ব'সে মেয়েও গোপনে বার করে আঁচলের আড়াল থেকে যুবরাজের ছবি। দেখে দেখে তৃষ্ণা আর মেটে না—বার বার দেখে। দাঁড়ে-বসা কাকাতুয়াকে অনর্থক ত্যক্ত করে,—রূপোর খাঁচায় সোনার খাঁচায় দুলছিল দুই হীরামন, তাদের কাছে এসে তাদের সঙ্গে কল-কাকলীতে মুখর হয়ে ওঠে মেয়ে। সখীরা আসে, হাসি-তামাশায় মুহূর্তগুলি স্বপ্নের মতো কেটে যায়। ঝুঁটিদার সাদা পায়রাটিকে ধ'রে অকারণ আকাশে উড়িয়ে দেয়, দিয়ে খিলখিল করে হাসে। উড়তে থাকে পায়রাটি আকাশে—মেয়ে আনন্দে করতালি দিয়ে ওঠে। কিন্তু উড়তে উড়তে দৃষ্টির আড়ালে গেলে ভয়ে কেঁপে ওঠে মন। ডাকতে থাকে পায়রার নাম ধ'রে; আসে না, দুচোখ জলে ভ'রে ওঠে অকস্মাৎ। সখীরা বলে,—কী হ'লো—কী হ'লো? মেয়ের কান্না হয়ে ওঠে দ্বিগুণ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অকারণ উচ্ছ্বসিত কান্না। ঝুঁটিদার সাদা পায়রাটি কিন্তু ঠিক ফিরে এসেছে,—তার কোটরটিতে ফিরে এসে ডাকছে তার প্রিয়াকে, বক্‌বকুম্-বক্-বকুম্!···

কান্নাও শেষ হয় কন্যার, হেসে ওঠে। মেঘ ও রৌদ্রের শোভা একসঙ্গে। মধ্যাহ্ন পার হ'য়ে বেলা ক্রমে গড়ায় বিকেলের দিকে, শুরু হয় সাজসজ্জার সমারোহ! গোধূলি-লগ্নেই মহারাজ দেখবেন তাঁর ভাবী পুত্রবধূ—চিত্রাঙ্গীকে।

—চিত্রাঙ্গী!—চম্‌কে ওঠে সোমনাথ। ততক্ষণে কোটিলিঙ্গম্-মন্দিরের প্রায় সামনে এসে প'ড়েছে ওরা!···বুঝতে পারে সোমনাথ এ' কার গল্প বলছে পার্বতী-মা। চিত্রাঙ্গীর কাহিনী এ' অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা কে না জানে! পার্বতী-মার বর্ণনার ভঙ্গিতে চির-পুরাতন কাহিনীটিই নূতন হ'য়ে উঠেছে, এ'কথা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই! কিন্তু ইনিয়ে-বিনিয়ে এ' গল্প কেন যে বলছেন পার্বতী-মা, তা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে সে। না, না, দরকার

নেই শুনে। অস্ফুটকণ্ঠে প্রৌঢ়াকে কী যেন বলে সোমনাথ, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে দেয় সামনে।

শোন্—সোমনাথ—শোন্—দাঁড়া!—পার্বতী-মা পিছন থেকে ডাকতে থাকেন।

—পরে শুনব—আজ নয়—কাজ আছে!—বলতে বলতে যেন পালাতে থাকে সোমনাথ। বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় দ্রুত কাঁপতে থাকে, যদি কানে যায় পার্বতী-মার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর,—পার্বতী-মার প্রতি মমতায় কোমল হ'য়ে যদি সে পথের মধ্যে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে?

কিন্তু ডাক আর আসে না, সোমনাথ প্রায় ছুটেই চলে আসে তার বাসায়। তাদের ভাড়াটে কনট্রাক্টর মাধবরাও সাইকেল নিয়ে কাজে বেরুচ্ছিল, তার দ্রুত-সিঁড়ি-দিয়ে-উঠে-যাওয়ার ভঙ্গি দেখে কৌতুক অনুভব করে, সাইকেলে উঠবার আগে পথের দিকে সতৃষ্ণ চোখে পিছন ফিরে তাকায়, কিন্তু বৃথা, রজকদের সেই কোমলাঙ্গী মেয়েটা ত ছুটে আসছে না সোমনাথের পিছনে-পিছনে!

না, লছমী বাড়িতে নেই। জানালায় এসে দাঁড়ায় সোমনাথ। বাড়িটা খালি। উনুনে কাঠ পড়েনি এখনো। কারুরই সাড়াশব্দ নেই। এখনো ওরা বোধ হয় ফিরে আসেনি নদীর তীর থেকে।

সোমনাথ দেয়ালে পিঠটা হেলান দিয়ে বসে পড়ে। চট্ করে যাহোক্ কিছু ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপর বেরিয়ে পড়তে হবে দরখাস্তটির খসড়া হাতে নিয়ে। নোকন্নাদের কথা সে একটুও ভোলেনি।

কিন্তু তার দেহ আজ ক্লান্ত, মনেও অবসন্নতা। যন্ত্রের মতো হাতের কাজগুলি ক'রে যায়, কিন্তু মনটা নিঃসঙ্গ পাখির মতো চিন্তার অনন্ত আকাশে এদিক্-ওদিক্ সাঁতার দিয়ে ফেরে ইচ্ছামতো, তাকে জোর ক'রেও ফেরানো যায় না।

ঘুরে ঘুরে বারবার মনে পড়ে তার ছোট্ট বোনটির প্রাণহীন নিথর মুখখানা। কী অপূর্ব সুন্দর সে মুখ! পার্বতী-মা বলেছিল, কৃষ্ণ-

বেণীর মুখখানা নাকি একেবারে বসানো। তাকে সে ভালো ক'রে দেখল কবে? মনেই পড়ে না তার মুখ। তার কথা মনে আনতে গেলেই জেগে ওঠে তার মরে-যাওয়া ছোট্ট বোনটির মুখখানা!

নিঃসঙ্গ তুপুরে একা-একা ঘরে শুয়ে কতো-কী স্বপ্নের জাল বুনে যায় মনে। চোখের পাতা ভারী হ'য়ে ধীরে ধীরে তন্দ্রা নামে। কতো মুহূর্ত কেটে যায়! একসময় মনে হয়, মা এসে আবার কাছে বসেছে।

—সোমা, বড়ো গরম প'ড়েছে, নারে?

—হ্যাঁ মা, বড়ো গরম।

মা যেন চুপচাপ ব'সে থাকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে। কেমন যেন করুণ বেদনাবিধুর মনে হচ্ছে মায়ের মুখখানা আজ! সেই দৃপ্ত মুখখানা আজ যেন কোনো নিগূঢ় ব্যথার আঘাত লেগে মলিন হ'য়ে গেছে! মা ব'লে ডেকে ওঠবার আগেই যেন কথা শুরু করলো মা, —জানিস্ সোমনাথ, এত গরম এ অঞ্চলে আগে ছিল না। গোদাবরীর তীরে তীরে ছিল ছায়া-সুনিবিড় কতো বিরাট শিমুলগাছের শ্রেণী। গাছ থাকায় হাওয়া ছিল স্নিগ্ধ, ছায়া ছিল মনোরম। এত গ্রীষ্ম ছিল না, এত কষ্টও ছিল না মানুষের। আজ কোথায় সেই গাছ, কোথায় সেই ছায়া? প্রখর রৌদ্রে সব-কিছুই যেন আজ-দাউদাউ ক'রে জ্বলছে! মানুষের কষ্টেরও সীমা-পরিসীমা নেই! সোমনাথ যেন উঠে বসতে যায়, যেন ব্যাকুল হ'য়ে বলতে যায়,—কিন্তু মা, তোমার কিসের কষ্ট, কিসের ব্যথা, আজ তোমার মুখখানা কেন এত ম্লান?

কণ্ঠে স্বর ফোটবার আগেই মিলিয়ে যায় মায়ের ছায়া। জেগে উঠে যেন তু'হাত বাড়িয়ে দেয় মায়ের দিকে,—মা—মা?

মা নয়, তার পায়ের কাছে ব'সে আছে লছমী। ধীরে, অতি ধীরে, হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তার পায়ে। নতমুখী লছমী, মুখখানা ম্লান, ব্যথায় বিধুর!

কতবার তার কাছে এসেছে লছমী, কতো সহজে, কতো নিঃসংকোচে,—কতো কথা ব'লেছে, কতোবার ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে, কিন্তু, এভাবে ওর একেবারে ঘরের মধ্যে এসে বসেনি সে কোনদিনও! আশ্চর্য হ'য়েই তাড়াতাড়ি উঠে বসলো সোমনাথ,—কী হয়েছে রে, লছমী ?

সেইভাবেই নতমুখে ব'সে আছে মেয়েটি, একবার মুখ তুললো, তারপর একটু হেসে বললো,—তোমার কাছেই এসেছিলাম।

—কেন রে ?

আবার মুহূর্তের জন্য মুখ তুললো লছমী, বললো,—এমনি। এসে দেখলাম, ঘুমিয়ে আছ। ডেকে তুললাম না। ব'সে পড়লাম। ভাবলাম, হাতে ত কোনো কাজ নেই, বসে বসে, তুমি বামুন, তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেই। সত্যি পণ্ডিত, তুমি ঘুমিয়ে থাকলে তোমাকে বড্ড অসহায় ব'লে মনে হয়। মা-হারা শিশুর মতো অনাথ! আমাদের মেয়েদের মনে বড়ো মায়া জাগে।

অপূর্ব মাধুর্যে ভ'রে গেল সোমনাথের মন, কিছুক্ষণ কোনো কথাই মুখে সরলো না, অনেকক্ষণ পরে বললো,—জানিস্? আমি মাকে স্বপ্ন দেখছিলাম। জেগে দেখি, মা নয়, তুই। এই যে কথাগুলি তুই বললি, মনে হলো আমার সেই হারানো মা-ই তোর মধ্য থেকে কথা ব'ললো! সত্যি লছমী, তোদের মন যখন স্নেহে কোমল হ'য়ে যায়, তখন তোদেব কাছে ব'সে আমার মায়েরই সঙ্গ পাই! ঠিক বোঝাতে পারছি না আমার মনের ভাব। আমি বয়সে তরুণ, কিন্তু কা'র আশীর্বাদে জানি না, আমার মন দিন দিন অন্যরকম হ'য়ে উঠছে! আমি নিজেকে আবিষ্কার ক'রে নিজেই অবাক্ হ'য়ে যাচ্ছি!

এবার লছমীরই অবাক্ হবার পালা। এত কথা সে সত্যিই বোঝে না, কিন্তু এটুকু বোঝে,—সাধারণ মানুষের দোষগুণের মাপকাঠি দিয়ে

এ লোকটির বিচার করা চলবে না। ঘুমন্ত মানুষটিকে অসহায় শিশুর মতো মনে হ'লেও জাগ্রত্ মানুষটিকে ইস্পাত ব'লে মনে হয়। এ ভাঙবার মানুষই নয়। ভেসে যায় যারা তারা একে আঁকড়ে ধরলে বন্যার হাত থেকে পার পাবে। কিন্তু, বড়ো কঠিন, বড়ো কঠিন এর ছদ্মবেশটিকে অপসারিত ক'রে ইস্পাতটির সন্ধান পাওয়া! হু-হু ক'রে কেঁদে ওঠে মন,—পণ্ডিত, বন্যার টান ধ'রেছে। আমি বোধ হয় ভেসে যাচ্ছি, আমাকে টেনে তোলো তুমি!.........

কিন্তু মনের কান্না মনেই ঢেউ তুলে আছড়ে মরে,—কণ্ঠে স্বর হ'য়ে ফুটতে চায় না, শুধু চোখ দুটি একটু ছলছল ক'রে ওঠে, ঠোঁটদুটি একবার একটু কাঁপে।

সোমনাথ কী ওর চোখের ভাষা পড়তে পারে? ওর চোখের দিকে তাকিয়ে সাগ্রহে আবার প্রশ্ন করে,—কী হয়েছে রে?

বলতে গিয়েও বলা হয় না,—কেমন-একটা অবিশ্বাস্য আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে। পিঞ্জরের মধ্যে ছট্‌ফট করে খাঁচার পাখি, বাইরে আসতে পারে না।

সোমনাথ ওর কাছে স'রে আসে, বলে,—কী হ'য়েছে, আমাকে বলবি না?

উঠে দাঁড়ায় লছমী—কী জ্বালা! ওকেই ত সব বলতে এসেছি, কিন্তু বলতে পারছি কই!

দরজার কবাটে দেহের ভারটা রেখে ছাদের-ওপর-এসে-পড়া জ্বলন্ত রৌদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে লছমী। আকস্মিক অস্থিরতার ঢেউটাকে সামলে নেবার চেষ্টা করে।

আজ সত্যিই দুর্বোধ্য লাগছে লছমীকে। খোলা জানালাটার দিকে একবার তাকায়,—ওর বাড়িতে কেউ নেই, কোনো সাড়াশব্দও নেই। লছমী তার কাছে, তার ঘরের দরজায়। নিশ্চয়ই কিছু-একটা হ'য়েছে। ধীরে ধীরে আবার কাছে এসে দাঁড়ায় সোমনাথ, কোমল কণ্ঠে বলে,—কী হয়েছে, আমায় বল্?

ওর মুখখানা তখনো রৌদ্রের দিকে ফেরানো, বলল,—নাগমণিকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—চ'লে গেছে বুঝি ?

মুখ ফেরালো লছমী, পণ্ডিতের প্রশ্নের ধরণ শুনে মনে হয় নাগমণির চলে যাওয়াটা যেন খুবই স্বাভাবিক ও সাধারণ। কেন, তাদের স্নেহ, তাদের ভালবাসা, তাদের আগ্রহ,—এ সবের কিছুরই কী মূল্য নেই ঐ অদ্ভুত মেয়েটার কাছে যে, এক নিমেষেই এ বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব ?

লছমী বলল,—চলে গেছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে কোণ্ডাকে।

স্নেহে আর করুণায় ভ'রে ওঠে সোমনাথের মন,—বুঝতে পারে ওর অন্তরের দুঃসহ বেদনাকে, বলে,—ওরা চলে গেল, তোরা কেউ একটুও জানতে পারলি না ?

—না।

—নোকন্না ?

—বাবা ? বাবা খুব দুঃখ পেয়েছে কোণ্ডার ব্যবহারে। ব'লেছে, ওরা চ'লে গেল কেন পালিয়ে ? আমি নিজেই ওদের দু'জনের বিয়ে দিতাম !

—তোর কী মনে হয় ? ওরা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে ?

লছমীর কণ্ঠস্বরে এবার কেমন যেন ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়,—ঠিক এই কথাটা। ঠিক এই কথাটাই আমি বুঝতে পারছি না পণ্ডিত ! ওরা বিয়ে করবে ত ?

—যদি করে ?

—করুক। বিয়ে করুক। খুব ভালো হবে।—বলেই ফিরে দাঁড়ায় রৌদ্রের দিকে তাকিয়ে, পেছন থেকে ওর মুখের ভাবটা ঠিক বুঝতে পারে না সোমনাথ।

কয়েক মুহূর্ত পরে ওকে সে ডাকে,—লছমী ?

—কী ?

—নাগমণিকে তোর কেমন মনে হয়, ঠিক ক'রে বল ত ?

ওর দিকে এবার ফিরে দাঁড়ায় লছমী, বলে,—সত্যি কথা বলব পণ্ডিত ? বড্ড মায়া প'ড়েছিল ওর ওপব। [illegible] ত বাপ-মায়ের কথা ? মা-বাপ ছেড়ে, ঘব ছেড়ে মেয়েরা কখন বাইরে আসে, পণ্ডিত ? যখন দুঃখেব অবধি থাকে না, তখনই, নয় কী ? আহা ! সত্যিই বড়ো দুঃখী মেয়ে ও' ?

মুগ্ধ মন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সোমনাথ ওর সামনে। মেয়েটি ভালো, কিন্তু এত ভালো ও' ? কোণ্ডাকে ও' ভালবাসে, অদ্ভুত, অভাবনীয় ভালবাসাব সেই রূপ ! সেই কোণ্ডা চ'লে গেছে হঠাৎ অন্য একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে,—ওর নারীমন বেদনায় বিপর্যস্ত,—তবুও ক্ষমাব শেষ নেই, স্নেহেব অবধি নেই ! অথচ, সাধাবণ রজক সম্প্রদাযেব মেয়ে, অশিক্ষিত।

একটু হেসে সোমনাথ বলে,—কোণ্ডার ওপব তোব বাগ হ'চ্ছে না, লছমী ?

—হচ্ছে না,—বিস্মিত, উত্তেজিত মুখখানা ফেরালো ওর দিকে, বলল,—নিমকহাবাম ! যাবার আগে একবাব আমাব সঙ্গে দেখা কবল না ?

উত্তেজনায়, ক্ষোভে, মুখখানা লাল হ'য়ে উঠেছে মেয়েটিব, কিন্তু আশ্চর্য, পবক্ষণেই নিভে এলো এ' উত্তেজনাব উত্তাপ, ধীরে ধীবে আবাব পূর্বেব মতই কোমল হ'য়ে এলো মুখেব ভাব, শান্ত কণ্ঠে বলল,—কিন্তু পণ্ডিত, বাগ কবব কাব ওপর ? অতো বড়ো জোয়ান পুরুষ, কিন্তু আমি ত এতদিন ওকে দেখে আসছি,—ও' একটি শিশু,—ওকে ভোলানোও সহজ, কাঁদানোও সহজ, হাসানোও সহজ। নাগমণি কেন, যে-কোনো মেয়ে ওকে যেখানে খুশী ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারে !

—লছমী ?

—বলো পণ্ডিত।

—একটা খবর কী জানিস্ ? নাগমণি কোন্ জাতের মেয়ে ?

—কোন্ জাতের পণ্ডিত ?

—নাগাস্থ ।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে গেল মেয়ের দুটি চোখ, অর্ধস্ফুট স্বরে বলল,—নাগাস্থ !

—হ্যাঁ ।

—কিন্তু, তুমি কী ক'রে জানলে পণ্ডিত ?

—আমাকে ও' স-ব ব'লেছে ।

—বলেছে !

—হ্যাঁ !

কথাটা শুনে নিজেকে আবার যেন একটু সামলে নিয়ে লছমী বলল,—এ'কথা আর কেউ জানে, পণ্ডিত ?

—না ।

—পণ্ডিত ?

—কী, লছমী ?

লছমী নিদারুণ ব্যাকুলতায় বলে উঠল,—কী হবে, কী হবে পণ্ডিত !

—কিসের কী হবে ?

—ওদের বিয়েব ! ওরা যে একজাতের নয় । কোণ্ডা যে আমাদের জাতের ছেলে ! কী ক'রে বিয়ে হবে ওদেব দুজনের ?

সোমনাথ একটু থেমে বলে, বিয়ে বোধ হয় হবে না ।—

—হবে না ! ওরা এভাবেই দিন কাটাবে ?

—কে জানে !

—কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াবে, অজানা গাঁয়ে ! অনেক কষ্ট পাবে যে ওরা পণ্ডিত !

সোমনাথ কিছু বলে না, চলে যায় একবার জানালার কাছে । না, কেউই ঘরে নেই, উঠানে উনুনেও আঁচ পড়েনি । আবার কাছে এসে দাঁড়ায় সোমনাথ, বলে,—বেলা যে পড়ে এলো ।

যেন অবসন্নতা থেকে জেগে ওঠে লছমী, বলে,—হ্যাঁ এলো।

—রান্না করিস্‌নি বুঝি আজ ?

কোনো উত্তর দিলো না লছমী, শুধু নিচু করে রইল মুখ।

সোমনাথ আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে জামাটি প'রে নেয়, কাছে এসে বলে,—নোকন্না কোথায় ?

—শহরে।

—ফিরে এসে ভাত চাইবে না ?

—তাই বুঝি রান্নার দিকে লক্ষ্য নেই ? নিজে খাবি কী আজ ?

হাসি ফুটল লছমীর মুখে, বলল,—তোমার হাঁড়িতে কিছু প'ড়ে নেই পণ্ডিত ? দাও না, প্রসাদ পাই আজ তোমার কাছে ?

সত্যিই লজ্জিত হ'য়ে ওঠে সোমনাথ, তাকে চা এনে, কোন সময় খাবার এনে, কতো খাইয়েছে মেয়েটি, আজ তাকে কিছুই দেবার নেই !

বলে,—আজ বড়ো লজ্জা দিলি লছমী, আয় আমার সঙ্গে, দোকান থেকে তোকে খাইয়ে আনি। আমি গরীব ব্রাহ্মণ—সামান্য যা কিছু জোটাতে পারি, আয়।

লছমী এবার হেসে ওঠে, বলে,—পাওনা রইল। আমার ক্ষিধে নেই, কিছু খেতেই ইচ্ছা করছে না। বাবা এসে নিশ্চয়ই বকবে, আমার আজ কোনো কাজই করা হয়নি। গোদাবরীর ধারে ব'সে ব'সে বেলা কেটে গেল, কিছুই হ'লো না।

—না,—আমি শুনবো না, তোকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে দোকানে।

মিনতি ফুটে ওঠে লছমীর কণ্ঠে, বলে,—না পণ্ডিত, অমন ক'রে বোলো না। আমি কী যেতে পারি ? আমি ঘাটে যাব এখন, কাপড়ের স্তূপ প'ড়ে আছে, নিয়ে আসব ঘরে। বাবা আসবে, কাজ হয়নি, তার ওপরে যদি দেখে আমিও ঘরে নেই, ওর মনের অবস্থা কী হবে বলো ত ?

—তবে, তুই বোস্, আমি খাবার কিনে নিয়ে আসছি।

—না-পণ্ডিত, আমি সামান্য মেয়ে, নিচু জাতের,—আমার জন্য তুমি এতো ব্যস্ত হচ্ছ কেন, পণ্ডিত ?

—কেন ?

কে এর উত্তর দেবে ? মা চ'লে যাবার পর স্নেহ-ভালবাসাও তাকে ছেড়ে চ'লে গেছে। একবিন্দু ভালবাসার জন্য তার মন তৃষিত হ'য়ে থাকে। সবাই তাকে ত্যাগ ক'রেছে, কিন্তু এরা তাকে কাছে টেনে নিয়েছে আপনার ব'লে। এই কোণ্ডা, লছমী, নোকন্নার দল,—এদের কাছে তার ঋণের বোঝা কী কম ?

লছমী একটু অবাক্ হয়, বলে,—চুপ করে রইলে কেন ?

চমক ভেঙে জেগে ওঠে যেন সোমনাথ, বলে,—ও হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার আমি যাই।

—কোথায় যাবে, পণ্ডিত ?

—যাব রাজমহেন্দ্রীতে।

—রাজমহেন্দ্রী ?

—হ্যাঁ, তোদের সেই দরখাস্তটা, সেটা টাইপ করিয়ে আনতে হবে।

—তার জন্য অতদূর যাবে ?

—হ্যাঁ লছমী, অতদূরেই যাব। কাছেই সব চেনা মানুষ, তাদের দৃষ্টি আমার ওপর কেমন, তা'ত জানিস্। তাই দূরেই যাব, অপরিচিত জায়গায়।

লছমী বলে,—শোনো, সত্যিই ভুলে যাচ্ছিলাম কথাটা। একটি ছেলে এসেছিল বাবার কাছে আজ। শার্ট-প্যাণ্ট-পরা। বোধ হয় ভদ্রলোকের ছেলে। বাবার সঙ্গে সবে আলাপ হয়েছে বুঝি। কী যেন ব্যবসা করে। তার কাছে নাকি তোমার ঐ দরখাস্ত ছাপবার যন্ত্র আছে। বলে গেছে, তুমি যদি যাও ও' ছেপে দেবে। বাবার সঙ্গে সব কথা হ'য়ে গেছে, তুমি গেলেই ও' তোমাকে চিনতে পারবে! যাবে সেখানে ?

—ঠিকানা!

—ঠিকানা? এসো আমার সঙ্গে। আমি দিচ্ছি। একটা কাগজে সে লিখে রেখে গেছে। তোমাকে কাগজটা দিচ্ছি। পড়লেই তুমি বুঝতে পারবে।

—চলো।

যেতে যেতে সিঁড়ির কাছে একটু থম্‌কে দাঁড়ালো লছমী, বলল,—একটা কথার জবাব কিন্তু তুমি দাওনি পণ্ডিত?

—কী?

—আমাদের জন্য তুমি কতো-কী করছ, এর জন্য দুঃখও পাচ্ছ কম নয়,—তোমাকে সবাই একঘরে ক'রে রেখেছে। কিন্তু কেন পণ্ডিত, আমাদের জন্য এতো করো কেন তুমি?

—কিছুই করি না। তোদের জন্য কিছু করতে পারাটাকে আমি বড়ো কাজ ব'লে মেনে নিয়েছি। কেন নিয়েছি, সে তোকে পরে বলব।

—না, আজই বলো।

সোমনাথ একটু হাসে, বলে,—বললেও বুঝবি না। তবে এটুকু শুনে রাখ্, আমি মরে গিয়েছিলাম। যে-জাতের মধ্যে জন্মেছি তারা আমাকে মৃত বলে ফেলে দিয়েছিল একধারে, তোদের জাতের ঐ কোণ্ডাই আমাকে বাঁচিয়েছে, আমাকে নতুন জীবন দান ক'রেছে। যক্ষ্মারোগী ব'লে সবাই ভয় পেয়ে পালিয়েছে, ঐ কোণ্ডাই তখন কাছে এসে আমার সব কিছু করেছে, একটুও দ্বিধা করেনি।

নির্মল হাসির আলোয় ঝলমল করে উঠলো লছমীর মুখ। বলল,—আমি জানি, তবু তোমার মুখে আবার এ'কথাটা শুনতে ইচ্ছা হলো। পণ্ডিত, কোণ্ডা বোকা, কোণ্ডা খামখেয়ালী, কিন্তু আমাদের জাতের মধ্যে ও-ই সব থেকে সেরা ছেলে! এসো তুমি।

ওর হাত ধরে টানতে টানতে ওকে এগিয়ে নিয়ে চললো লছমী।

লছমীর হাত থেকে সেই ঠিকানা-লেখা কাগজটা নিয়ে হাঁটতে লাগল সোমনাথ। পরিচিত পাড়াটা পার হ'য়ে স্বস্তি লাভ করল একটু। বেশ খানিকটাই যেতে হবে। স্টেশনটা পার হ'য়ে একেবারে রেল-লাইনের ওপারে। জনাকীর্ণ মূল রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে গলি পথই অবলম্বন করল সোমনাথ। পরিচিত কারুর সঙ্গে যেন দেখা না হয়, এই তার ইচ্ছা।

বহু গলিপথ পার হ'য়ে একটি ছোট্ট গলি। গলিব একপ্রান্তে অশ্বত্থ-গাছ-ওঠা দেয়ালে-ফাটল-ধরা পুরানো ক্ষুদ্রাকার দোতলা বাড়ি। নিচের দরজার কাছে একটি ছোট্ট কাঠের টুকরো নেম্-প্লেটের মতো ব্যবহৃত হ'য়েছে। কাঠের টুকরা, তার ওপর অপটু হাতে সাদা রঙ দিয়ে ইংবেজীতে অ-সমান কাঁচা হাতে লেখা, শ্রীপ্রকাশ রাও, ম্যাট্রিক।···অন্য একটা কাঠের টুকরায় অনুরূপভাবে তেলেগু ভাষায় লেখা রয়েছে, এখানে টাইপ রাইটিঙের যাবতীয় কাজ করা হয়।

অদ্ভুত ত! একটু হাসি ফুটে ওঠে সোমনাথের মুখে। ভদ্রলোক প্রবেশিকা পাশ করেছেন, সেটাও কী নামের পাশে এভাবে লিখে বিজ্ঞাপিত করতে হবে? আর টাইপ রাইটিঙের যাবতীয় কাজ মানে কী? ছাপানোব কাজ ছাড়া, ভাঙা টাইপ রাইটার-মেসিন সারানোর কাজও কী ভদ্রলোক ক'বে থাকেন নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—সোমনাথের কণ্ঠে প্রশ্নের আভাস পেয়ে প্রকাশ রাও ভদ্রলোক একটু হেসে বলেন, মেসিন সারাবার কাজটাও শিখে রেখেছি সঙ্গে সঙ্গে। দু' চারখানা চিঠি ছাপিয়ে আর ক' পয়সা পাই? একটি ত মাত্র মেসিন। বাড়িভাড়ার টাকাটাও ওঠে না।

—বাড়ি বুঝি ভাড়া?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—প্রকাশ রাও তরুণ, তারই বয়সী হবে, একটু প্রাণ-খোলা গোছের লোক মনে হলো ; বলল,—আমার এক বন্ধুর বাড়ি। এক সঙ্গে পড়েছি। কলকাতায় গেছে চাকরি করতে, রেল অফিসের কেরানী, সেখানেই থাকে। ছুটিতে এসে ভিতরের ঘরগুলিতে থাকে ফ্যামিলি নিয়ে, আমার তখন এই একখানিই ঘর। চিঠি ছাপানো, মেসিন সারানো সব এই ঘরে।

—আপনি একা ?

—আমি একাই।—প্রকাশ রাও বলল,—আর কেউ নেই। বুড়ো বাপ-মা মরে হেজে গেছে বহুকাল। ঝড়ের ঝাপট লেগে একবার এদিক্, একবার ওদিক্, এই ক'রে ক'রে মানুষ হচ্ছি আর কী!

একটু হাসল সোমনাথ, বলল, মিলে যাচ্ছে আপনার সঙ্গে কিছুটা। আমিও একা।

—শুনেছি আপনার কথা নোকন্না সর্দারের কাছে।

—শুনেছেন !—সোমনাথ জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়।—কী শুনেছেন আমার কথা ?

ওর চোখে চোখ রেখে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে প্রকাশ, বলে, —প্রশংসাই করেছে আপনার। বামুনেব ছেলে এদের সঙ্গে মেশেন বলে একঘ'রে করে রেখেছে আপনাকে আপনার আত্মীয় পরিজন, এই আর কি ! বেশী কথা হয় নি মশাই। নোকন্না-সর্দারের সঙ্গে পরিচয় আমার কতদিনের ? এই তো সেদিন। ডাইং-ক্লিনারদের একটা সিণ্ডিকেট হয়েছে, তার সম্পাদকের ঘরে সেদিন আমি ব'সে। জোর তর্কাতর্কি। আমি ওর পক্ষ নিলুম। হাত ধ'রে উত্তেজিত বৃদ্ধকে নিয়ে এলুম আমার বাসায়, আলাপের এই হলো সূত্রপাত। বেশ লাগে আমার বৃদ্ধকে। সরলপ্রাণ সাদাসিধে মানুষ। শহরে এলে প্রায়ই আমার কাছে আসে। একই জাত আমরা ত !

ও, তাই নাকি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ,—প্রকাশ বলে,—পদবী রাও, কিন্তু তা দেখে চমকাবেন

না, ওটা ভদ্রপদবাচ্য হবার নিশানা মাত্র। যে-কেউ আজকাল রাও উপাধি গ্রহণ করেছে। আসলে আমরাও চাকলে,—রজক।

সোমনাথ বলল,—'সত্যি, খুব খুশী হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে।

—আমার খুশীর কিন্তু অন্ত নেই,—প্রকাশ বলল,—আমার পরিচিতদের মধ্যে একজনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না, এবার আপনাকে পেয়ে আমার সে অভাব মিটল। হ্যাঁ, এবার অ্যাপ্লিকেশনখানা দিন, ছাপিয়ে ফেলব আজ রাত্রেই।

অ্যাপ্লিকেশনটা সোমনাথের হাত থেকে নিয়ে পড়তে লাগল প্রকাশ রাও। ছোটখাট দেখতে, রোগা, কথা বলে একটু তাড়াতাড়ি। একটু বাচালতাও আছে।

—বাঃ!—সপ্রশংস দৃষ্টি তুলে প্রকাশ রাও তাকালো ওর দিকে,—লিখেছেন চমৎকার। সত্যি বলছি মশাই, আমি লিখলে এত ভালো হতো না।···

—আপনি নিশ্চয়ই উচ্চ শিক্ষিত?

উঠে দাঁড়াল সোমনাথ, হেসে বলল,—একেবারেই না। কিছু শিখব, তার সুযোগই বা পেলুম কোথায়? আচ্ছা, আজ আসি। আপনি ওটা ছাপিয়ে রাখুন, আমি কাল ওটা নিয়ে সরকারী অফিসে যেতে চাই।

—কাল?—প্রকাশ সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিল, চিন্তান্বিত মুখে বলল,—কাল কী সুবিধা হবে? আমি বলি কী, এক কাজ করুন। এ সব অফিসে-টফিসে দেখা-করা-টরা কাজের কথা নয়। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক'রে একেবারে অফিসারের বাড়িতে গিয়ে দেখা করি, কী বলেন?

—আপনিও যাবেন আমার সঙ্গে?

—নিশ্চয়ই যাব। ব্যাপারটার গুরুত্ব কী কম? সোডা না পেলে ওদের ব্যবসাই যে উঠে যাবে।

সোমনাথ কোমল কণ্ঠে বলে উঠল,—বুঝছেন ত? এটা ওদের মরণ-বাঁচন সমস্যা বলতে গেলে।

আমাদের বলুন,—আমাদের,—আবেগকম্পিত কণ্ঠে প্রকাশ রাও বলল,—আমাদের সমস্যা। আমিও জাতে রজক, আমি উঠে পড়ে লাগব এটা নিয়ে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক'রেই আপনাকে খবর দেবো, কেমন?

বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে পথে নামল সোমনাথ, সঙ্গে-সঙ্গে কিছু দূর পর্যন্ত এলো প্রকাশ রাও, বলল,—সত্যিই আপনি আমাদের বন্ধু। আমাদের প্রদেশে ব্রাহ্মণরা আমাদের সঙ্গে মেশে না আজও, নিচু জাত ব'লে ঘৃণার চোখে দেখে, আপনি সেই ব্রাহ্মণ হয়েও আমাদের জন্য এত করছেন···।

—কিছুই না, কিছুই না। কিন্তু কিছু করতে পেলে কৃতার্থ হই।

লুকানো তির্যক্ দৃষ্টি মেলে তার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল প্রকাশ রাও, তারপর একটু হেসে বলল,—অভিনব। সত্যিই এটা অভিনব আমাদের সমাজে। বলা যায় না, কখন যে কার কিভাবে পরিবর্তন আসে।

—পরিবর্তন! সোমনাথ বলে,—হ্যাঁ, তা পরিবর্তনই বটে, আমূল পরিবর্তনই বলতে পারেন!

—কিন্তু কেমন ক'রে? জানতে ইচ্ছা করে এ পরিবর্তন আপনার জীবনে এলো কেমন ক'রে?

মনে মনে হাসে সোমনাথ। প্রকাশ রাও ম্যাট্রিক যে ধীরে ধীরে এই প্রশ্নেই আসবে এ যেন সে আগেই জানতে পেরেছিল। এ'ধরনের লোকের কৌতূহল অদম্য হওয়াই স্বাভাবিক। বলল,—মরেই গিয়েছিলাম, আমাকে সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তোলে ঐ ওদেরই একজন। এ' কথা কী কখনো ভুলব?

বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে আছে প্রকাশ রাও। একটু হেসে সোমনাথ বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেলেও পিছন-পিছন আবার

ছুটে এলো প্রকাশ। বলল,—আপনার জীবনকাহিনী শুনতেই হবে। গল্প লেখা যায়।

—গল্প লেখেন নাকি?

—আজ্ঞে না,—প্রকাশ রাও একটু অপ্রস্তুতের মতো হেসে বলল, আমার এক বন্ধু লেখে। কোবালী পরিবারের ছেলে, গল্প লিখে নিজেদেরই প্রেসে ছাপিয়ে দু'আনা চারআনা দামে চটি বইগুলি বিক্রি করে হাটে, বাজারে। এক একটা গল্প নিয়ে এক-একটা বই। আর গল্পের সব কাহিনীই এ অঞ্চলের। সব সাময়িক সত্যি ঘটনার ওপরে লেখা। বিক্রি খুব বইগুলির। পড়েন নি কখনো?

—না। তবে নাম শুনেছি বটে।

—পড়বেন। আমি দেবো।

—দেবেন, আচ্ছা, আসি।

প্রকাশ এরপরও চলছে ওর সঙ্গে। একটু পরেই গলিপথ পেরিয়ে নদীতীরের পথটিতে এসে পড়ল ওরা। গোদাবরী। এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে, নীড়ে ফিরে যাচ্ছে তারা। সন্ধ্যা আসন্ন। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে দু'জনেই। প্রকাশ বিদায় নিলো এইখানে এসে। বদ্ধগলির জীব যেন বদ্ধগলির দিকে ফিরে যাবার জন্য চঞ্চল হ'লো মুহূর্তে। যাবার আগে হঠাৎ ওর হাতটা ধরল জড়িয়ে, বলল,—আপনার কথাই ভাবছি। আপনার জীবনের।

এবার একটু অবাক্ না হ'য়ে পারে না সোমনাথ, কী এমন ও দেখল তার জীবনে যে এ'ভাবে দোলা লাগল মনে!

প্রকাশ বলল,—আপনাকে দেখেই মনে হয়, আপনি খুব রোমান্টিক। খুব ভাবুক। আচ্ছা, চলি।

গোদাবরীর ক্ষীণ শান্ত জলধারার দিকে তাকাতে তাকাতে আপন মনেই হেসে উঠল সোমনাথ, সে ভাবুক? রোমান্টিক?

রোমান্সই বটে। মাতা-পুত্রের রোমান্স, গোদাবরী-সোমনাথের রোমান্স। কিন্তু কে বুঝবে এ রোমান্সের স্বরূপ? পিছন ফিরে

একবার দেখে নিলো সোমনাথ, গলিপথে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে প্রকাশ রাও ম্যাট্রিক।···এ' রোমান্স বোঝেনি প্রকাশ। মৃত মানুষকে সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তোলার কথা যখন বলেছে সোমনাথ, তারই মধ্যে রোমান্সের গন্ধ পেয়েছে প্রকাশ ; তারই মধ্যে পেয়েছে গল্পের আভাস। হয়ত ওর বন্ধুর লেখা চার-আনার বইতে শীঘ্রই নিজেকে দেখতে পাবে সোমনাথ। একটি ব্রাহ্মণের ছেলে ব্যাধিতে মৃতপ্রায়, একটি রজকিনী মেয়ে সেবা ক'রে বাঁচিয়ে তুলেছে তাকে।

কিন্তু যে তাকে সত্যই সেবা ক'রে বাঁচালো, তার খবর কী? নাগমণিকে নিয়ে কী সত্যিই ঘর বাঁধবে নাকি ঐ পাগলা ছেলেটা,—কোণ্ডা? কে জানে কখন কিভাবে কার জীবনে কোন্‌টা সত্য হ'য়ে দেখা দেয়? হয়ত কোকনদ কিংবা সমলকোটা যাবার উধাও পথের ধারে একটি তালপাতার খুপরি ঘর থেকে তাকে দেখে হাসিমুখে বেরিয়ে আসবে নাগমণি, বেরিয়ে আসবে কোণ্ডা, হেসে বলবে, 'জমানা বদল গেয়া পণ্ডিত, জমানা বদল গেয়া!'

আশ্চর্য, মনের চিন্তা কী এভাবেই রূপ নেয়? 'পণ্ডিত'—'পণ্ডিত' ব'লে কে যেন তাকে সত্যিই ডাকছে! দাঁড়িয়ে পড়ল, এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকালো, তারপরে পিছন ফিরতেই দেখে ছুটতে ছুটতে সে আসছে, যে তাকে ডাকছিল এভাবে। ছুটে এসে হাঁপাচ্ছে। চট্‌ ক'রে কথাও বলতে পারছে না। অথচ পথচারীরা দাঁড়িয়ে প'ড়েছে তাকে দেখে, তার এভাবে-ছুটে-আসাকে লক্ষ্য ক'রে। সে নাগমণি।

—কতক্ষণ থেকে তোমাকে ডাকছি পণ্ডিত, শুনতে পাও না?

নাগমণি! বিস্মিত বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে সোমনাথ। ওকে এভাবে এ সময়ে হঠাৎ দেখবে, তা কল্পনাও করতে পারেনি সে। কোথা থেকে ছুটে এলো ও? এভাবে? একা একা?

—আঃ রাস্তায় যে ভিড় জ'মে গেল! শিগ্‌গির এসো না পণ্ডিত?

অস্ফুট কণ্ঠে সোমনাথ বলে,—কোথায়?

—নরকে। —একটু হেসে নাগমণি বলে,—রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা হয়? ঘরে এসো! লোক জমে গেল যে।

—চল্।

সোমনাথ চলতে থাকে ওর পিছনে পিছনে। কিন্তু ওর ধীরে চলা পছন্দ হয় না নাগমণির, বলে,—ছুটে এসো। রাস্তার লোকজন দাঁত বের করে তামাশা দেখছে, বুঝতে পারছ না?

দ্রুত চলতে চলতে সোমনাথ বলে,—কোণ্ডা কোথায়?

উত্তর নেই। বাসার কাছাকাছি এসে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করে সোমনাথ। খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে নাগমণি। বলে,—উঠে এসো ঘরে। সব বলছি। ভয় নেই, বাসায় আমি একা।

—একা!

—হ্যাঁ, একেবারে একা! বাবাঃ! তোমাকে বড়ো রাস্তায় দেখতে পেয়ে কতো ডাকলাম, শুনতেই পেলে না, আপন মনে কী যেন ভাবতে ভাবতে চ'লেছ ত চলেছই। অত কী ভাবছিলে পণ্ডিত? আমাদের কথা? খুঁজতে বেরিয়েছিলে নাকি আমাদের?

উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগে ঘরের খাটের বাজু ধ'রে দুলতে লাগল নাগমণি,—একবার এদিক্, একবাব ওদিক্। সাপিনী ফণা ধ'রে যেমন দোলে—এপাশে-ওপাশে, ঠিক তেমনি!

কিন্তু এ কার ঘর? কোন্ ধরনের ঘর? পাকা বাড়ি, হলদে রঙে বাইরের দিকটা রঙ-করা, সারি সারি চলে গেছে এক ধরনের ক্ষুদ্রকায় ঘরগুলি,—দেখায় যেন ব্যারাকের মতো। পাকা ঘর, কিন্তু ঘরের চাল তালপাতায় ছাওয়া, ঢালু হ'য়ে নেমে এসেছে সামনেকার দাওয়ার ওপর,—মাথা বেশ নিচু ক'রে ঢুকতে হয়। আর, ঢুকে প'ড়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালে যে-ঢুকল তাকে বাইরে থেকে চেনা অসম্ভব।

ঘরের শ্রীতেও বৈশিষ্ট্য আছে। ঘরে একখানিই খাট। খাটে ব'সে ভালো করে ঘরখানা লক্ষ্য করতে লাগল সোমনাথ। দেয়ালে

পেরেক ঠুকে তাতে টানিয়ে রাখা হয়েছে কতগুলি বাঁশের বাঁশী, তারই নিচে একটা আলপনা-আঁকা জলচৌকির ওপরে একটা মৃদঙ্গ, কাপড়ের ঠুলি ঢাকা বোধ হয় বীণা কী সারেঙ্গী, একপাশে ঘুঙুর। একটা সুদৃশ্য ধূপদান। চমৎকার সৌরভে ঘর ভরিয়ে দিয়ে ধূপগুলি একে একে পুড়ে যাচ্ছে তাতে, ধোঁয়ার রেখাগুলি ঊর্ধ্বে উঠে বাঁশের বাঁশীগুলি ছুঁয়ে দেয়ালের ওপর টাঙানো ফুলের-মালা-দোলা একটি বড়ো কৃষ্ণমূর্তির পায়ে গিয়ে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে যেন! শ্রীকৃষ্ণের মুখে বেণু, শিরের শিখীপাখার ওপরে বিস্তৃত কদম্ববৃক্ষে পুষ্পিত কদম্বফুল!

ইতিমধ্যে ভিতরের দাওয়াতে চ'লে গিয়েছিল নাগমণি, একটা জোরালো সেজ-বাতি নিয়ে সে ঘরে ঢুকল এইবার। ওটা ঘরের ক্ষুদ্রকায় টেবিলের ওপর রেখে খাটের বাজু ধ'রে দাঁড়ালো এসে। পরনে একটা ছাপা শাড়ি, লাল পাড়,—খোঁপায় রজনীগন্ধার মালা জড়ানো। মুখে হাসি, যেন কৌতুকের আর শেষ নেই ওর!

বলল,—পণ্ডিত, তোমার কোণ্ডা হারিয়ে গেছে!

এতবড়ো খবর শুনেও চুপ ক'রে রইল সোমনাথ, তেমনি নির্বিকার, তেমনি শান্ত। কী ভাবছে সে? এত কী ভাবে সব সময়? নাগমণি বলে,—কী হলো পণ্ডিত, এমন চুপ ক'রে আছো যে?

তবু নিরুত্তর সোমনাথ। হয়ত কিছু বলবে, এটা তারই প্রস্তুতি। অধৈর্য হয়ে নাগমণি বলে,—কথা বলো?

মুখ তুলে তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায় সোমনাথ, বলে,—নাগাসুদের মেয়ে, তুই কী শেষ পর্যন্ত ফিরেই গেলি তোদের চিরাচরিত নাগিনী বৃত্তিতে?

প্রশ্নটি শোনামাত্রই ব্যাকুল হ'য়ে বলে ওঠে নাগমণি,—না, পণ্ডিত, না।

—তবে?

একমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে আয়ত চোখ দুটি তুলে তাকায় মেয়েটি,—কৌতুকের স্পর্শমাত্র নেই,—দুটি স্নিগ্ধ কোমল চোখ।

—তোমাকে বলতে লজ্জা নেই পণ্ডিত,—রাত হোতে না হোতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম দুজনে।

সোমনাথ এইখানে বাধা দেয়, বলে,—তোরা যে বেরিয়ে পড়বি, আগে থাকতেই ঠিক করে নিয়েছিলি নিজেদের মধ্যে, নয় কী?

কেমন যেন অশ্রুর আভাস দেখা দেয় চোখের কোণে। তেমনি ব্যাকুল কণ্ঠে মেয়েটি বলে ওঠে,—না, পণ্ডিত না। আমি একাই বেরিয়েছিলাম। ওরা আমার যা করেছে তা আমি কোনদিনই ভুলব না। কিন্তু আমি যে নাগাসুর মেয়ে, আমি যে সর্বনাশী, রক্তে রক্তে আমার যে বিষ! আমি ওদের মধ্যে থাকলে যদি ওদের ক্ষতি হয়? যদি লছমীর হয় সর্বনাশ?

একটা অপরূপ মাধুর্যে ভ'রে ওঠে সোমনাথের মন, লছমী আর কোণ্ডার মধ্যে যে একটা অপূর্ব সম্বন্ধ লোকচক্ষুর আড়ালে গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে,—নাগমণি হয়ত তার নারীমন দিয়ে সহজেই বুঝেছে সেটা। কিন্তু বুঝেছেই যদি, তবে এ ভুল ও ক'রল কেমন ক'রে? লছমীর সর্বনাশ চিন্তা ক'রেও কোণ্ডাকে কেন নিলো ও সঙ্গে? নাগমণি বলে,—হয়ত একটা নেশায় পেয়ে বসেছে কোণ্ডাকে।

—নেশা?

একটু হেসে মেয়েটি বলে,—হ্যাঁ, যে-কোন একটা নেশা নইলে পুরুষ থাকতে পারে না। আমাকে ভালো-লাগার একটা নেশা ঐ পাগল লোকটাকে পেয়ে ব'সেছে। গোদাবরীতে চান ক'রে আমরা কতোদূরে চলে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে। দৌলেশ্বরম্ ছাড়িয়ে নদীর পাকা বাঁধটা পার হ'য়ে ওপারের গাঁয়ে।

যেন স্বপ্ন দেখছে মেয়েটি, এমনিভাবে বলতে লাগল। বলার মাঝে হেসেও উঠতে লাগল কখনো কখনো,—এক গ্রামের এক বাগান থেকে গাছের ফল চুরি ক'রে খেলাম আমরা, মালী দেখে তাড়া ক'রতেই ছুটতে লাগলাম আমরা উর্ধ্বশ্বাসে।

হেসে উঠল নাগমণি,—লোকটা শিশুর মতো—বাঁধনহারা—

কোনো জ্ঞান নেই, কিছু নেই। ওর সঙ্গে থাকলে আমি যেন আমার সেই ছোটবেলাটাকে ফিরে পাই পণ্ডিত। খুব দুষ্টু ছিলাম ছোটবেলায়।

একটু হেসে সোমনাথ বলে,—দুষ্টু কী এখনো তুই কম?

—কী করি বলো ত?—নাগমণি বলে,—আমি এমন কেন? সারাটা জীবন যেন ছুটে ছুটেই বেড়াচ্ছি!

গাঢ়কণ্ঠে সোমনাথ বলে,—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এমনি আনন্দময়ীই যেন তুই থাকিস্ চিরকাল।

—চিরকাল!

—হ্যাঁ।

চুপ ক'রে থাকে নাগমণি, বলে,—কোণ্ডা হয়ত আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। না-না, সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে ত, খুঁজে খুঁজে না পেয়ে এতক্ষণে ফিরে গেছে লছমীর কাছে!

—এটাই বা তুই কী করলি নাগমণি?

—ভালো করিনি?—নাগমণি বলে,—সারাদিন পেটে ভাত নেই—কিছু নেই—ফল খেয়ে—গাছের ছায়ায় ছুটোছুটি ক'রে দিনটা কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু এর পর? ওকে নিয়ে আমিই বা কী করব, ও-ই বা আমাকে নিয়ে কী ক'রবে? ফিরে আসছি শহরের দিকে। এ বাড়িগুলির কাছাকাছি এসে মনে পড়ল, এ বাড়ির অন্ততঃ একটি ঘর আমার ভয়ানক চেনা! ওকে যদি এড়াতে হয় ত, এই-ই সুযোগ!

বললাম, —চান করবি কোণ্ডা?

বলল,—হ্যাঁ। আয়।

দুজনে জলে নামলাম। ওকে জলের খেলায় মাতিয়ে দিয়ে আমি একসময় উঠে এলাম তাড়াতাড়ি। প্রায় ছুটেই পালিয়ে এলাম বলা যায়। গরম কালের নদী, বহুলোক চান করছিল। ভিজে-পায়ের দাগ বহু ভিজে-পায়ের দাগের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে উঠে এলাম এই ঘরে। হয়ত কোণ্ডা আমাকে খুব খুঁজেছে, কিন্তু পাবে কেমন ক'রে?

—এ কার ঘর ?

—বলছি পণ্ডিত। নাগাস্মুদের মেয়ে আমি, তোমার এ কথারও উত্তর দিতে পারব।

একটু হেসে সোমনাথ বলে,—তা' আমি জানি। কিন্তু থাক্। আমি বুঝেছি।

—এত সহজে, পণ্ডিত ?

—এর মধ্যে কঠিন ত কিছু নেই।

—আছে,—নাগমণি বলল,—আমাদের এ জগৎটাও অদ্ভুত,—এরও আছে বিচিত্র নিয়ম-কানুন, অদ্ভুত ধরন-ধারণ। তোমাদের সঙ্গে মিলবে না। এই যে ঘরগুলি দেখছ, এখানে নাগাস্মুদের দু'তিনটি মেয়ে আছে, বামুনের মেয়েও আছে, গানবাজনা নিয়ে দিন কাটায়, এমন কয়েকজন পুরুষও আছে। যে-যার নিজের-নিজের কাজ নিয়ে আছে, বাড়িওয়ালাকে তার ভাড়াটি মাসে মাসে নিয়মমত দিয়ে যে-যার জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত।

—কিন্তু বামুনের মেয়েদের কথা তুই কী বল্‌লি ?

—হ্যাঁ। দু'তিনটি মেয়ে আছে। মন্দিরে-মন্দিরে ভজন-গান গেয়ে তারা পেট চালায়।

—ভজন-গান ?

—হ্যাঁ গো। আর ঐ পুরুষরা ? গানবাজনাই ওদের জীবিকা। নাগাস্মুর মেয়েরা গানও গায়, নাচেও। বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে-টিয়ে উপলক্ষে কিংবা মন্দিরে, এই এদেরই ডাক পড়ে।

—তাহ'লে এ পল্লী……

—খারাপ নয়,—নাগমণি বলল,—তোমরা যাকে সম্মান বলো, মেয়েদের সম্মানের এই-ই শেষ ধাপ। আমার জীবন-কাহিনী ত তোমাকে ব'লেছি, নাচগান শিখতে এই ঘরেই আমাকে থাকতে হ'তো তখন।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। যাঁর কাছে শিখতাম, তিনি নেই, তাঁর মেয়ে এখন থাকে এখানে। আমাকে এ চিনত। আমাকে পেয়ে খুশীই হ'য়েছে। খুশী হবারই কথা, ওর মা বসন্ত্‌দেবী আমাকে খুব ভালবাসতেন।

—বসন্ত্‌দেবী?

—হ্যাঁ। নাম শুনেছ নাকি? তাঁর গান শুনে 'বসন্ত্‌ কোকিলম্‌' নাম দিয়েছিল সবাই। যেমন নাচে, তেমনি গানে!

—কোথায় তিনি এখন?

নাগমণি বলল,—তিনি সব ছেড়েছুঁড়ে ফিরে গেছেন 'মাণ্ডুলা' ব'লে এক গাঁয়ে, নরশাপুরম্‌ থেকে যেতে হয়, পাহাড়ের কোলে এক প্রাচীন গাঁ। পার্থসারথির মন্দির আছে গাঁয়ে। যে-কয়দিন বাঁচেন, ঐ মন্দিরে গান গেয়ে বাঁচা-ই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

—জীবিকা?

—নেই। মেয়েই মাসে-মাসে টাকা পাঠায় মাকে।

সোমনাথ বলে, বসন্ত্‌ কোকিলম্‌-এর নাম শুনেছি বই কী, খুবই শুনেছি। তাঁর মেয়েও মায়ের মতো হ'য়েছে নিশ্চয়ই?

—কে জানে! কিন্তু নিছক গান গেয়ে নাচ দেখিয়ে পয়সা পাওয়ার ভাগ্য দিন-দিন ক'মে আসছে মানুষের। মানুষ গরিব হ'য়ে পড়ছে দিন-দিন। খেতেই জোটে না পয়সা, তারপরে গান?

সোমনাথ বলে,—আজকাল সিনেমা ব'লে একটা জিনিস হ'য়েছে, শুনেছিস্‌ ত?

—শুনেছি। কিন্তু অতো বড়ো ব্যাপার আমরা ভাবতে পারি না! সিনেমায় যারা নাচে, গায়,—তারা নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী, খুব ভালো গায়, ভালো নাচে!

—জানি না। হয়ত তাই। আবার না-ও হ'তে পারে। শুনেছি, তোদের নাগাসুন্দরেরই দু'একটি মেয়ে সিনেমায় নাম ক'রেছে, টাকা পাচ্ছে প্রচুর!

—সত্যি!

—শুনেছি।

—হবে।—নাগমণি বলে,—ওদের ভাগ্য। আমরা তা' ভাবতেও পারি না।

কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি নেমেছে। এবার তার ওঠা উচিত। বলল,—কী ঠিক করলি? এখানেই কী থাক্‌বি?

—বেশীদিন নয়। আমার বন্ধুর অবস্থা ভালো নয়, ওর ওপরে আমার ভার চাপানো ঠিক হবে না। দেখি কী করা যায়।

—কোথায় তোর বন্ধু, নাগমণি?

মুখটা নিচু করল নাগমণি, একটা কালো ছায়া খেলে গেল ওর মুখের ওপর দিয়ে, তারপরে জোর ক'রে আপন মনেই হেসে উঠল সে, বলল,—এখানে আমি নাগমণি নয় পণ্ডিত, এখানে আমি চন্দ্রসেনা!

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে সোমনাথ, বলল,—সে প্রশ্ন আমি তোকে প্রথমেই করেছি নাগমণি। যে-জীবন থেকে একদিন ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়েছিলি, আজ কী ফিরে গেলি সেই জীবনেরই মধ্যে?

দৃঢ়কণ্ঠে নাগমণি বলল,—না। নাচ-গান আমার ভালো লাগে, কিন্তু এর নিচে আমি আর নামব না!

ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সোমনাথ, বলল,—আমি আসব। মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যাব তোব, কেমন?

আনন্দে যেন ভ'রে গেল মেয়েটার শবীর-মন, দুটি উজ্জ্বল চোখ ওর দিকে তুলে ধ'রে বলল,—আসবে!

—আসব।

—কিন্তু, যাবার আগে আমার বন্ধুর কথাটা শুনে গেলে না?

—বল্‌।

নাগমণি বলল,—আমি সর্বনাশী পণ্ডিত, যেখানেই যাই দুর্ভাগ্য আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

একটু আশ্চর্য হ'য়ে সোমনাথ বলে,—কী হয়েছে বল্ ত ?

—গান গেয়ে আর পয়সা হয় না। পয়সার জন্য—পেটের জন্য—আমার বন্ধুকে প্রায়ই কাঁচঘরে যেতে হয় আজকাল।

—কাঁচঘর ?

—নাম শোনোনি ? শহরের কুখ্যাত কাঁচঘর ?

সোমনাথ কিছুক্ষণ কিছু বলতে পারে না। নাগমণি বলে,—পণ্ডিত, এ কথা শুনে আমার বন্ধুকে কী তুমি ঘৃণা করবে ?

—না।

আবার উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে মেয়েটার দু'টি চোখ, বলে,—আমি জানি পণ্ডিত, তুমি অন্য ধরনের। তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম প্রথমে, কিন্তু তুমি দেবতার মতো !

—ও কথা থাক্,—সোমনাথ বলে,—একটা কথা বলতে পারিস্ ? শুনেছিলাম, কাঁচঘরের মেয়েরা কাঁচঘরেই থাকে।

থাকে। পেটের জন্য চুপি চুপি বাইরের মেয়েরাও কখনো-কখনো যায়। চিত্রাঙ্গীকে তার জন্য শুধু নয়, তার মায়ের জন্য……

—চিত্রাঙ্গী ?

—আমার বন্ধুটির নাম। তুমি এমন চম্‌কে উঠলে কেন পণ্ডিত, চেনো আমার বন্ধুকে ?

সোমনাথ চমকটা সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। বলল,—না।

তার মনে ধক্ করে জেগে উঠেছিল পার্বতী-মার বলা গল্পটা। এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ চিত্রাঙ্গীর গল্প। চিত্রাঙ্গীর কথায় মুহূর্তের জন্য মনে পড়ে গেল কৃষ্ণবেণীর কথা। কৃষ্ণবেণীর না-দেখা-মুখখানা তার মৃত বোনটির মুখে। বাবা ত অসুস্থ। কেমন আছেন এখন তিনি, কে জানে ?

—পণ্ডিত ?

—কী ?

—কোণ্ডাকে কিন্তু বোলো না আমার কথা।

—কেন ?

—না—না, কক্ষনো বোলো না, ও আবার তাহ'লে ছুটে আসবে লছমীকে ছেড়ে। আবার আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে চাইবে মাঠে-মাঠে, গাছের ছায়ায় ছায়ায় !

সোমনাথ একটু হাসে, বলে,—সত্যি ক'রে একটা কথা বল্ ত ?

—কী ?

ওর চোখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে সোমনাথ বলে,—ভালবেসে ফেলেছিস্ কোণ্ডাকে ? সত্যি বল্ ?

দুই হাতের মধ্যে মুখখানা লুকায় নাগমণি, বলে,—এমন ক'রে আমাকে তুমি জিজ্ঞাসা করো না পণ্ডিত ?

অপূর্ব মমতায় ভ'রে যায় সোমনাথের মন, বোঝে কোন্ দুঃখে কোণ্ডাকে লুকিয়ে এই কোটরে আজ আশ্রয় নিয়েছে নাগমণি !

দুর্দমনীয় প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরা আনন্দের কণা এই মেয়ে ঘরে-বাইরে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বিপর্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পেরেছিল ঐ রজকদের শ্রমকেন্দ্রিক সহজ সরল সমাজে এসে। লছমীর মধ্যে অনাবিল স্নেহ, কোণ্ডার মধ্যে নির্বাধ নির্মুক্ত প্রীতির নিবিড়তা !

—আমি আসি ! আসি, নাগমণি !

খাটের বাজু ছেড়ে একটু এগিয়ে এলো নাগমণি, বলল,—আবার আসবে ত পণ্ডিত ?

—আসব।

হেসে উঠল নাগমণি, ওর সেই অভ্যস্ত হাসি, বাঁধ-ভাঙা ঝরনার মতো। বলল,—এখানে এসে বন্ধু চিত্রাঙ্গীর শাড়ি পরে খোঁপায় ফুল জড়িয়ে নাগমণি হয়েছি চন্দ্রসেনা। কোণ্ডা আমাকে এ বেশে দেখলে কী করবে বলো ত পণ্ডিত ?

একটু হাঁসল সোমনাথ, বলল,—সে তোদের কথা তোরাই জানিস্।

নাগমণি আপন কৌতুকে আপনিই হাসতে লাগল। সোমনাথ বলল,—হ্যাঁ রে, নাগমণি ?

—কী ?

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

—করো।

একটুক্ষণ থেমে সোমনাথ বলল,—আমাকে তোরা সবাই সব কথা বলিস্। একটু সংকোচ করিস্ না, দ্বিধা করিস্ না। লছমীও না, তুইও না। কেন, ভয় করিস্ না আমাকে ?

—না।

—লছমী আমাকে কিছুদিন ধরে জানে। কিন্তু তুই ?

—আমিও জেনেছি। তোমাকে ভয় করার আমার কিছু নেই। ভদ্দরলোকদের ওপর রাগ আছে, ঘৃণা আছে। তোমাকে দেখেও আমি একটা জ্বালায় জ্বলে উঠেছিলাম। কিন্তু কী যে হলো, কোণ্ডার কাছে এসে, লছমীর ছোঁয়া লেগে আমি যেন নতুন চোখে তোমাকে দেখলাম। সব কথা আজ তোমাকে বলতে পারি, দুঃখ পেলে কাঁদতে পারি, আনন্দ পেলে হাসতে পারি! তবে, একটা কথা মনে হয়, নিজের জন্য তোমাকে না কোনদিন দুঃখ দিয়ে ফেলি!

—এ কথা কেন ?

—আমাকে ক্ষমা করো তুমি। আমি অবুঝ। সময় সময় আমি শিশুর মতো হ'য়ে যাই! কিছু জ্ঞান থাকে না! ঐ কোণ্ডাই আমাকে এ'রকম করে তুলেছে! আমি তোমাকে হাত ধরে পথ থেকে এ ঘরে এনেছি, তোমার চেনা লোক যদি কেউ দেখে থাকে ত তোমার অপমান ও অপবাদের সীমা থাকবে না!

হো-হো ক'রে হেসে উঠল সোমনাথ, বলল,—তাই বুঝি মনে করিস্ ? ওরে, অপবাদ আর কলঙ্কে আমার সবকিছু কালো হ'য়ে আছে, নতুন ক'রে কালিমা লাগবার আর ভয় নেই। আচ্ছা, আসি ?

—এসো। আবার কবে আসবে ? কাল আসবে ? আমার

বন্ধুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো। ভালো মেয়ে পণ্ডিত, শুধু পেটের দায়ে…।

—থাক্ ও কথা। আচ্ছা, পারি ত কালই আসব।

—আসবে!

—হ্যাঁ।

বাইরে আসতে আসতে আলপনা-আঁকা জলচৌকিটার কাছে একবার থমকে দাঁড়ালো সোমনাথ। মৃদঙ্গ, বীণা আর ঘুঙুরের কাছে ধূপদানে শেষ ধূপটি পুড়ে পুড়ে প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, অন্তিম ছুটি ক্ষীণ শিখা ঊর্ধ্বে উঠে আবার এক হ'য়ে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে হাতে বেণুধরা মুরারীর মূর্তিটির কাছে,—নৃত্যের শেষে যেন এক সূক্ষ্মদেহা দেবদাসী তার পরম দেবতার পায়ে জানাচ্ছে তার অন্তিম প্রণতি!

নোকন্না-সর্দারের বাড়িতে সে রাত্রে একটা ছোটখাটো উৎসবেরই সূচনা হয়েছে। জনকয়েক ছেলে মিলে কোন কাঠের গোলার মালিকের কাছ থেকে চেয়ে এনেছে একটা পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন, উঠানে বাঁশের আড়ায় টাঙিয়ে দিয়েছে সেটা শক্ত করে। উঠানে তালপাতার চাটাই পাতা, বহু লোক এসে জড়ো হয়েছে। নর ও নারী। আলোর নিচে বসেছে গানের আসর। একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক গান গাইছে। স্ত্রীলোকটি নিয়েছে ঢোল, পুরুষটির হাতে একতারের বীণা। এরা গেঞ্জিকোটলু। বছরে একবার ক'রে এরা আসে রজক-পল্লীতে, খায় দায়, গান বাজনা শোনায়, পাঁচ ছয় দিন ধরে পালাক্রমে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে বাস করার পর আবার চলে যায়।

রজকদের সঙ্গে ওদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ।

সোমনাথ ওদের উঠানে এসে পা দিতেই ওদের গানে একটু ছেদ পড়ে, নোকন্না মুখের চুট্টাটা ফেলে দিয়ে ওকে অভ্যর্থনা জানাতে উঠে

দাঁড়ায়, আসনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে লছমী ওকে নিয়ে এসে বসায় দাওয়ার ওপর আসন পেতে, উচ্চাসনে। ও একটু বিব্রত বোধ করে, হেসে বলে,—আজ এতো খাতিরের ঘটা কেন রে?

উত্তর দেয় নোকন্না, বলে,—আজকের মিলনটা যে সামাজিক পণ্ডিত। আর তুমি ব্রাহ্মণ, সবাব নমস্য, তোমার খাতিরই সবার আগে। আজ বিকেলে হঠাৎ এরা এসে হাজির—গেঞ্জিকোটলু।

গেঞ্জিকোটলু স্ত্রী-পুরুষ দুজনে ওকে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রণাম জানিয়ে গান ধরে। একটানা কাঁপা কাঁপা অদ্ভুত এক সুর।

সোমনাথদের অভ্যস্ত মার্গ সংগীতের ধারায় এটা পড়ে না। সুর তালে জটিলতা থাকলেও বৈশিষ্ট্য আছে। গানে গানে ওরা ওদের জন্মকথাই বলতে থাকে। বজকদেব কাছে এ কাহিনী সুপরিচিত। তবু তাবা একমনে শুনতে থাকে এই গান। নোকন্না তার কাছ থেকে ফিরে গিয়ে উঠানে বসেছে। মাথায় তাব পাগড়ি সুদৃশ্য ভঙ্গিতে বাঁধা আজ, হাতে পেতলে-বাঁধানো লাঠি। তার সর্দার পদের আভিজাত্যসূচক।

লছমী বসেছে সোমনাথের প্রায় পায়ের কাছে। দাওয়ার সিঁড়ির ধাপের ওপর বসেছে সে। সোমনাথেব কাছ থেকে একধাপ কি দু' ধাপ নিচে।

গেঞ্জিকোটলু পুরুষটি তখন মাথা নেড়ে নেড়ে জানাচ্ছে তাদের জন্মকথা। তেলেগু ভাষায় ভাতেব ফ্যানকে বলে 'গেঞ্জি'। মাড়কেও বলে। এই ভাতের মাড় রজকদের কাছে যে কতো দরকারী জিনিষ তা বলাই বাহুল্য। এই ভাতের মাড় থেকে 'গেঞ্জি-কোটলু' সম্প্রদায়ের জন্ম। এই কথাটা বহু রকমে এবং বহু অলৌকিকত্ব আরোপ করে বোঝানো হচ্ছে গানে গানে। যে কোন রজক, যত গরিবই সে হোক্ না কেন, কোনো 'গেঞ্জিকোটলু' এসে তার দ্বারে দাঁড়ালে সে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, ফিরিয়ে দেওয়া সত্যিকার রজকদের কাছে মহা পাপ। অথচ, নতুন যারা

'ডাইং-ক্লিনিং' খুলে বসেছে শহরে, তারা এটা মানে না। মানতে চায় না। গেঞ্জিকোটলু দরজায় গেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়! এতটা কি ধর্মে সইবে? 'ডাইং-ক্লিনিং'এর প্রসঙ্গও সুকৌশলে ওদের গানের মধ্যে ঢোকানো। এবং ওরা গানের মাধ্যমে এ' কথাগুলো বলতেই সমস্ত আসরে 'আহা-আহা' ধ্বনি ওঠে। শুধু 'গেঞ্জিকোটলু' নয়, ওদেরও মনের কথা যেন ব্যক্ত করছে গায়ক গায়িকা। ডাইং-ক্লিনিং ওদের জাত-ব্যবসার যে কতো বড়ো ক্ষতি, তা বোধ হয় মর্মে মর্মে বোঝে প্রতিটি রজক। এই 'আহা-আহা' ধ্বনি ওদের মর্মেরই হাহাকার।

গান আবার প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। সোমনাথ একটু সামনে ঝুঁকে চাপা কণ্ঠে ডাকে,—লছমী?

গান বোধ হয় লছমীকেও টানছিল ; বোধ হয় সেও ছিল আনমনা, বেদনাবিধুর। মুখখানা ওর দিকে ফিরিয়ে বলল,—কী পণ্ডিত?

—কোণ্ডা কোথায়? ওকে দেখছি না যে?

ওর প্রশ্নে একটু অবাক্ই হয় লছমী, বলে,—তোমাকে ত দুপুর বেলাই বলেছিলাম পণ্ডিত, ও নেই, চলে গেছে নাগমণির সঙ্গে।

—কিন্তু ফিরে আসেনি?

—না।

সোমনাথের কাছে রহস্যময় ঠেকে ব্যাপারটা। গেল কোথায় কোণ্ডা? নাগমণি তাকে যা বলল তাতে ত তার বহুক্ষণ পূর্বেই এখানে ফিরে আসার কথা? না কি এখনো শহরময় সে খুঁজে বেড়াচ্ছে নাগমণিকে? লছমী তার পায়ে মৃদু স্পর্শ ক'রে বলে,—পণ্ডিত, তুমি কী বিশ্বাস করো ওরা ফিরে আসবে?

একটু ইতস্ততঃ করে সোমনাথ। ওকে কী সব কথা বলা উচিত? হয়ত মুহূর্তে ব্যাকুল হয়ে উঠবে মেয়েটা। হয়ত অধৈর্য হয়ে উঠবে। কিন্তু একেবারে কিছু না-বলাটাও ক্ষতিকর, মেয়েটা মুখে যাই বলুক আকাশ পাতাল ভেবে মরবে।

—চুপ করে রইলে কেন পণ্ডিত ?

ওদের গানের আসরের যাতে অসুবিধে না হয়, এমনি ভাবে ফিসফিসিয়ে সোমনাথ বলল,—লছমী, আমি নাগমণির দেখা পেয়েছি। কোণ্ডা ওর কাছে নেই।

—তবে ?

ধীরে ধীরে সমস্তই বলে যায় সোমনাথ ওর কাছে। ওদের দৌলেশ্বরমে ঘোরাঘুরি করা, ফিরে এসে গোদাবরী-স্নান, নাগমণির লুকিয়ে-পড়া। চুপচাপ শুনে যায় লছমী, শুধু কোণ্ডার প্রসঙ্গে হেসে ওঠে, বলে,—এইবার খুব জব্দ হয়েছে ও। সারারাত খুঁজবে, কাল সকালে দেখবে ঠিক এসে হাজির হবে। হাতে পয়সাও নেই যে সিনেমা দেখবে। যাবার সময় আমাকে মুখ দেখিয়েও যায়নি। পয়সা কোথায় ? আসুক না ও, আমিও দেখাবো মজা, আমিও নোকন্না সর্দারের মেয়ে !

চুপচাপ কিছুক্ষণ কেটে যায়। লছমী আবার বলে,—কিন্তু নাগমণি ওকে ছেড়ে দিলো কেন পণ্ডিত ? একজাত নয় বলে ?

এই প্রশ্নে নাগমণির দিক্ থেকে একটা আত্মত্যাগের প্রয়াস আছে, কিন্তু সেটা পুরুষ হয়ে না-ই বা বলল সোমনাথ ? একদিন লছমী হয়ত নিজেই তা আবিষ্কার করবে। কিন্তু কী চমৎকার প্রেমের ক্ষেত্রে এই লীলার অংশ ! এ যেন এক পদ্ম-কোরকের ক্রম প্রস্ফুটন। পাপড়ির পর পাপড়ি খুলে এ যেন এক পরমাশ্চর্য আত্মদর্শন ! নিজেকে দেখতে দেখতে নিজেই বিভোর হয়ে যেতে হয়।

লছমী বলে,—আমি কাউকে বলিনি পণ্ডিত, ও যে নাগাসুর মেয়ে একথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দেইনি কাউকে। আমাকে নিয়ে যাবে পণ্ডিত ওর কাছে ?

—নারে, সে ভালো জায়গা নয়।

—কী বললে ? —উত্তেজনায় একেবারে উঠে দাঁড়ায় লছমী,

স্থান-কাল-পাত্র বোধ হয় ভুল হয়ে যায় মুহূর্তের জন্য, বলে,—তাহ'লে খারাপ? মেয়েটা খারাপ?

ঠিক সেই সময় গেঞ্জিকোটলু দম্পতির গানে বিরতি ঘটে, লছমীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর একটু উচ্চই শোনায়, সবাই ফিরে তাকায় ওর দিকে।

নোকন্না বলে,—খারাপ? কার কথা বলছিস্ রে? কোন্ মেয়েটা খারাপ?

ক্রোধের অনলে বোধ হয় ইন্ধন পড়ে। লছমী কণ্ঠস্বর আরো উচ্চে তুলে বলে, নাগমণি। তোমার আদরের নাগমণি।

উঠে আসে নোকন্না সর্দার, মেয়ের কাছে এসে ওকে শান্ত করার জন্য হাসিমুখে বলে,—কে খারাপ—কে ভালো বোঝা কী এত সহজ? কী বলো হে তোমরা?

সমাগত সবাইকে উদ্দেশ ক'রে এই কথা বলে গেঞ্জিকোটলুদের ডাক দেয় সে। বলে,—এসো হে তোমরা, এসো, এবার খাওয়া দাওয়া সারতে হবে, রাত হলো, লছমী-মা, ওদের শোবার ব্যবস্থা করে দে। ঐ কোণ্ডার ঘরেই শুয়ে পড়ুকনা ওরা, কী বলিস্?

লছমী উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে রোষভরে ঘরে চলে যায়।

নোকন্না হেসে ওঠে, সবাইকে উদ্দেশ করে বলে,—বোনে বোনে মান অভিমান, বুঝলে হে? আচ্ছা, এবার তোমরা বাড়ি যাও, কেমন?

বুঝতে পারে সোমনাথ, ব্যাপারটাকে ওদের কাছে হেসে হালকা করে দিতে চায় নোকন্না, ভিতরের কথা জানতে দিতে চায়না; নইলে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ দলপতি ঠিকই বুঝেছে মনে মনে, শান্ত শিষ্ট লছমী যখন উত্তেজিত হয়েছে, তখন যাই ঘটে থাকুক, ঘটনাটা খুব সহজ নয়।

সর্দারের নির্দেশে একে একে চলে যায় সবাই নিজেদের মধ্যে কলরব করতে করতে। শুধু দলের একটি তরুণী মেয়ে ওর দিকে একটু এগিয়ে এসে হাসিমুখে ওকে সম্ভাষণ জানিয়ে যায়।

—ঠাকুর নমস্কার।—প্রণামের ঘটাটা একটু যেন বাড়াবাড়ি।

উঠানের একপাশেই পাতা বিছিয়ে বসে পড়ে গেঞ্জিকোটলু দম্পতি। খাবার নিয়ে নিজেই পরিবেশন করে সর্দার। খুব খুশী হয় ওরা এতে। ওদের খেতে বসিয়ে দিয়ে হাত ধুয়ে ওর কাছে আসে নোকন্না। নাকে কাপড় দিয়েছে ইতিমধ্যে সোমনাথ। নিরামিষাশী ব্রাহ্মণের কাছে মাছের গন্ধটা বড়ো তীব্র।

মাথার পাগড়িটা খুলে ফেলে নোকন্না বলে,—নাগমণিকে—খারাপ বল্‌ছে ও? কিন্তু, খারাপ নয় কে? পণ্ডিত, এ তল্লাটে আমার দলের লোকদের দেখছ ত? একদিনে এ দল গড়েনি। কত বাউণ্ডুলে ভবঘুরে এসেছে ঐ কোণ্ডার মতো, আমি কাজে লাগিয়েছি, ঘব-গৃহস্থালী করে দিয়েছি। মেয়েলোকও আসেনি? ভুল করেছে জীবনে, ঠকেছে, পা পিছলে গেছে। আমি কাজে লাগিয়ে দিয়েছি, ঘরমুখী করেছি, বিয়ে দিয়েছি। আজ তারা চমৎকার ঘর সংসার করছে, তাদের ঘর আমার ঘর নিয়ে সমাজ তৈরী হয়েছে। গেঞ্জি-কোটলুরা আসে প্রতি বছব। জানো ত পণ্ডিত, ওরা ঘরে আসা মানেই হচ্ছে আমাদের 'চাকলে' বা রজক বলে স্বীকৃতি পাওয়া। ওরা যার ঘরে যাবে না, সে রজকই নয়।

সোমনাথ জানে তাদের প্রদেশে এখনো এই জাত-জাত ব্যাপারটা কম কথা নয়, তাই একটু আশ্চর্যই হয় সে নোকন্নার কথায়। শ্রদ্ধাও বাড়ে, বলে,—সর্দার তোমার দলের সবাই তাহলে জাতে সত্যিই রজক নয়! কিন্তু তোমাদের মধ্যে তা হয় নাকি?

—চুপ্‌ চুপ্‌, আস্তে আস্তে বলো, পণ্ডিত, আস্তে বলো—নোকন্না প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে,—তা হয় না কিন্তু আমি হইয়েছি। এ কথা আর কেউ জানে না আমি ছাড়া। আমি যে কী ভাবে আমার দল গ'ড়ে তুলেছিলাম পণ্ডিত, সে কথা শুধু ঐ কোটিলিঙ্গম শিবই জানেন! এবা জাত-জাত করেই গেলো! আমি জাত চাই না, পণ্ডিত, আমি চাই কাজ।

—জাতের কথা কিছু উঠেছে নাকি ?

—হরদমই উঠছে। যাদের জাত নেই, জাত-জাত করে চেঁচায় তারাই বেশী।

সোমনাথ বলে,—নাগমণিকে নিয়েই বুঝি উঠেছে এ সব কথা ?

—না-না, সে সব কিছু নয়। আসল কথা কী জানো, জনকয়েকের ঘরে জমেছে দু পয়সা, এ তারই গরম! নইলে মাথা ঘামাবার আমাদের সময় কোথায় ? সারাদিন খাটি, সন্ধ্যেবেলায় গান বাজনা নিয়ে বসি, রাত্রে ঘুমোই, এই-ই আমাদের জীবন। কিন্তু সহ্য হচ্ছে না ওদের! আমার সর্দারি ওরা আর মানতে চায় না। সর্দার বলে মানিস্ বা না-মানিস্, আমাব পাকা চুলকেও কী মানবি না তোরা ?

আশ্চর্য হয়ে সোমনাথ বলে,—বলো কি নোকন্না ?

—হ্যাঁ, পণ্ডিত,—ক্ষোভে-দুঃখে-অভিমানে অভিভূত বৃদ্ধ দলপতি বলতে থাকে,—বেশ বুঝছি, ভেঙে যাবে এই দল! আমারই হাতে গড়া মানুষগুলি আজ আমাকেই অপমান করে! এই যে এই গেঞ্জি-কোটলু, এরা আমার এখানে এলো, আমি সবাইকে ডাকলাম। কেউ কেউ এলো, কিন্তু অনেকেই এলো না। তারা যে বড় হয়েছে, পয়সা হয়েছে। ওরা যাবে তাদের বাড়ি, তারা নিজেরা আসবে না। তা' ওরা ত যাবেই, কিন্তু আমি ডেকেছি, আমার ডাক ওরা শুনল না। প্রতি বছর আগে আমার বাড়ি ভিড়ে গমগম করতো, আর আজ তুমি কী দেখলে পণ্ডিত ? জনকয়েক লোক মাত্র এসে উঠানে বসেছে! পণ্ডিত, আমি পঞ্চায়েত ডেকে এর বিচার করতে পারি, কিন্তু তা করব না। ওদের ভালো হোক্, আমি বেটীর হাত ধরে যেদিক্ দুচোখ যায়, চলে যাব!

সোমনাথ বলে,—এটা তুমি কী বলছো সর্দার ?

নিরুত্তর থেকে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে নোকন্না।

সোমনাথ বলে,—আমি তোমাদের সোডার দরখাস্ত ছাপতে দিয়ে এসেছি সর্দার। প্রকাশ রাওয়ের কাছে।

—আলাপ হয়েছে ওর সঙ্গে তোমার?—নোকন্না বলে,—বড়ো ভাল ছেলে। সুযোগ পাচ্ছে না তেমন, নইলে খুব বড়ো হতো।

—ও' আর আমি দুজনে এক সঙ্গে দরবার করবো তোমাদের সোডার জন্য।

উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বৃদ্ধের চোখ, বলে,—করবে ত? পণ্ডিত, সোডা নইলে আমরা মরে যাব। পারব না ডাইং-ক্লিনিং ওয়ালাদের সঙ্গে যুঝতে? তুমি জানো পণ্ডিত, গৃহস্থরা একে একে দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্ছে আমাদের ওপর!

একটু হাসে সোমনাথ, রহস্য করে বলে,—দেখো সর্দার, ওদের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে মাঝখানে হাল ছেড়ে দিয়ে বেটীর হাত ধরে যেন যে-দিকে দুচোখ যায়, চলে যেও না!

কিন্তু তবু বোধ হয় দূর হয় না অভিমানের মেঘ।

নোকন্না বলে,—হয়ত শেষ পর্যন্ত তা-ই যেতে হবে। কী রে, হয়ে গেল তোদের?

গেঞ্জিকোটলু-দম্পতি নীরবে তাদের খাওয়া শেষ করে সব কিছু পরিষ্কার করে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। বেরিয়ে আসে লছমী, ওদের হাতে দেয় পান, চুট্টা, দেশলাই। বাপের হাতেও একটা চুট্টা গুঁজে দিতে ভোলে না। চুট্টা হাতে পেয়ে তার পণ্ডিতকে সম্মান দেখাতে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেটা লুকিয়ে ফেলে বৃদ্ধ, বলে,—তোরা আয়, তোদের ঘর দেখিয়ে দি। অতদূর থেকে হেঁটে এসেছিস্, বিশ্রাম দরকার। আয় আয়!

ওদের নিয়ে বেরিয়ে যায় নোকন্না। গেঞ্জিকোটলু মেয়েটি যাবার সময় লছমীর দিকে তাকিয়ে একটু মুখ টিপে হেসে চলে যায়।

লছমীর মুখখানা আবার তেমনি আগের মত শান্ত, স্নিগ্ধ মনে হচ্ছে। এটাই ওর সত্যিকার রূপ। উত্তেজনাটা আকস্মিক একটা ঢেউ, ওর মন বনশ্রীর শোভামণ্ডিত নিস্তরঙ্গ সরোবরের মতোই প্রশান্ত, গভীর। আজ, এখন, এই মুহূর্তে একটা সলজ্জ অরুণাভার আভাসও

যেন দেখা যায় মুখে। নীরবতা ভঙ্গ ক'রে ও-ই বলে,—তোমার আজ দেরি হয়ে গেল, না পণ্ডিত ?

দেরি ? দেরি কোথায় ? তুই তো রোজই দেখিস্, আমি বেড়িয়ে ফিরি প্রায় এই সময়।

লছমী শাড়ির আঁচলের খুঁটটা আঙুলে জড়ায়। জড়ায় আর খোলে। এক সময় বলে,—পণ্ডিত, তোমার ভাড়াটে, তোমার নিচের ঘরে থাকে মাধবরাও, লোকটি কেমন ?

মাধবরাও ছোটখাট কণ্ট্রাক্টারি করে। ভাড়ার আদান-প্রদান ছাড়া তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই সোমনাথের। একটু আশ্চর্য হয়েই বলে,—'কেন বল্ ত ?

—না এমনিই জিজ্ঞাসা করছি।

সোমনাথ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে,—লোকটিকে ভদ্র বলেই ত জানি।

লছমী কেমন একটু বাঁকা হাসে, বলে,—ভদ্র ত নিশ্চয়ই, ভদ্র নইলে কী আর……

ওর অসমাপ্ত উক্তি এতক্ষণে আগ্রহ সঞ্চার করে। সোমনাথ বলে, কী হয়েছে বল্ ত ?

লছমী তেমনি হাসে, বলে,—কিছু না। আমাদের জাতের মধ্যে এ-সব কথা কারুর মনে হয়নি।

—কী কথা ?

—আমার কথা,—লছমী বলে,—মাধবরাও আমাদের জাতের সবার কাছে কী-সব যা-তা রটিয়েছে আমার নামে। দেখছ না, আমাদের জাতের অনেকেই আসেনি আমাদের বাড়ি ?

একটা সন্দেহ ধ্বক করে জ্বলে ওঠে সোমনাথের মনে, জিজ্ঞাসা করে, কী কথা রটিয়েছে তোর নামে, বলতে পারিস্ ?

কৌতুকে ঝলমল করে দুটি চোখের তারা লছমীর। কেমন অদ্ভুতভাবে ঠোঁট টিপে টিপে হাসে সে, বলে,—বলব ?

—বল্ না ?

—রাগ করবে না ?

—কী আশ্চর্য, রাগ করব কেন ?

লছমী বলে,—ওরা বলে তুমি নাকি আমাকে—

বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ একটা তীব্র স্পন্দনের তরঙ্গে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সোমনাথের। অস্ফুটভাবে বলে,—ভালবাসি ?

—না, না,—লছমী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,—তুমি নাকি আমাকে —আমাকে রেখেছ !

বলেই আর দাঁড়ায় না। স্ত্রীসুলভ স্বাভাবিক লজ্জার জড়িমা বোধ ক'রেই সম্ভবতঃ চট্ ক'রে ছুটে যায় ঘরের ভিতরে। আর, একটা তীব্র ক্রোধ যেন পুড়িয়ে মারতে থাকে সোমনাথকে ! শুধু মাধবরাও নয়, সমগ্র ভদ্র সমাজকে চরম আঘাত হানতে পারলে যেন তার জ্বালা মেটে। এ হীন অপমানকর উক্তি যে কতখানি পাশবিক মনোভাবের পরিচায়ক তা ভাবতেও সর্বশরীর ঘৃণায় শিরশির ক'রে ওঠে !

কিন্তু কী আশ্চর্য, ধীরে ধীরে আবার তার কাছে এসে তেমনি ভাবে দাঁড়ায় লছমী। চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকে।

সোমনাথ বলে,—এ অপমান যে তোর ওপর এ ভাবে এসে পড়বে, আমি ধারণাও করিনি। তোদের জাতের লোকেরা কেউ কোনদিন কিছু বলেনি এ নিয়ে, বা অসম্ভ্রম করেনি আমাকে। কিন্তু আমার নিজের জাতটাকে যে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, লছমী ! ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমার সঙ্গে সঙ্গে ওদের সহস্র চোখও এসে তোদের ঘরে ঢুকতে পারে। কী বলব ? আমার জন্যই এটা হয়েছে। আমিই অপরাধী।

লছমী বলে,—তুমি রাগ করবে না, আমাকে কিন্তু কথা দিয়েছিলে।

—রাগ ? রাগ নয় লছমী, দুঃখ।

—দুঃখ ?—লছমী একটু হাসে,—তা এ ধরনের দুঃখ সওয়া

আমাদের অভ্যাস আছে। তুমি জানো না পণ্ডিত আমাদের ঠিক অবস্থাটা, আমরা গৃহস্থ বাড়ি থেকে পরিষ্কার করব বলে নোংরা কাপড় মাথায় করে নিয়ে আসি, নোংরা কাপড়ের সঙ্গে অনেক নোংরা মনও আমাদের পিছু পিছু ধেয়ে আসে। অনেক নোংরা কথা, নোংরা ধারণা!

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর সোমনাথ বলে, জানি। কিন্তু—

বাধা দেয় লছমী, বলে,—'কিন্তু' নয়, তুমি কিছুতেই রাগ করতে পারবে না, কারুর ওপবেই না।

সোমনাথ বলে,—নোকন্না আমাকে শ্রদ্ধা করে। ওরও কানে উঠেছে ত কথাটা?

তেমনি হাসতে হাসতেই লছমী বলে,—তা উঠেছে বৈ কী। বাবা ওদের কী বলেছে জানো?

—কী?

—বলেছে,—তেমনি মিটি মিটি হাসতে হাসতে কী অদ্ভুত তরল কণ্ঠেই না লছমী বলতে থাকে,—বলেছে, আমার মেয়ে যদি ব্রাহ্মণের ভোগে লাগে ত ধন্য মনে কবব! এ ত নতুন কিছু নয়, উঁচু জাতের লোকেরা আমাদের মেয়েদের নিয়ে চিরদিনই ছিনিমিনি খেলেছে!

সোমনাথ আর দাঁড়াতে পারে না, তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় দরজার দিকে। লছমী কিন্তু ছুটে আসে, দরজাটা আড়াল করে দাঁড়ায়, বলে,—এ ভাবে যেতে দেবো না।

মাথা নিচু করে ফিরে আসে সোমনাথ দাওয়ার কাছে। লছমীর মুখের দিকে না তাকিয়েই বলে,—কী বল্‌বি বল্?

লছমী বলে,—আমি জানি তুমি কী ভাবছ। আমাদের জাতের ছেলে হ'লে এ সব কিন্তু ভাবত না, হেসেই উড়িয়ে দিতো!

—কথাটা ত হেসেই উড়োবার, লছমী!

—তবে?—লছমী আরও কাছে এগিয়ে আসে,—তবে এত অস্থির হচ্ছো কেন? আমার কথা ভাবছ? পণ্ডিত, যে লোকের মুখ দিয়ে

ও ধরনের কথা সহজেই বেরুতে পারে, তার মেয়ে কী ধাতু দিয়ে গড়া, তা কী বোঝ না তোমরা ?

চট্ করে ঘুরে দাঁড়ায় ওর দিকে সোমনাথ, উত্তেজিত কণ্ঠেই বলে, —সব বুঝি। যদি ভালবাসার কথা নিয়ে ওরা কানাকানি করতো, আমি কিছুই গ্রাহ্য করতাম না, কিন্তু—শেষ পর্যন্ত তুই আমার ভোগের বস্তু !

লছমী আরও এগিয়ে আসে ওর দিকে। চোখে যেন সেই কৌতুকের দীপ্তি, হাসিমাখা ঠোঁটে যেন স্নেহের বিচ্যুতি। ওর চোখে চোখ রেখে সে যেন কী খুঁজে বেড়ায় ! মুহূর্তের জন্য যেন অসহ্য মনে হয় সে দৃষ্টির উত্তাপ এই জ্যোৎস্না-ভেঙে-পড়া রাত্রে। কিন্তু মুখ ফেরাতে গিয়েও ফেরাতে পারে না সোমনাথ। জ্যোৎস্নার আলো-ছায়া যেন তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে অকস্মাৎ মুর্ছনা তোলে, বিহ্বল বিস্মিত চোখে সেও চেয়ে থাকে লছমীর মুখের দিকে। একেবারে ঠিক তার মা ! তার মায়ের সুধাঝরা স্নিগ্ধ দুটি চোখের দৃষ্টি তার অন্তর্জ্বালাকে অবগাহনে মুহূর্তে শীতল করে তুলেছে।

কী মৃদু—কী অস্ফুট কণ্ঠেই না লছমী কথা বলতে পারে ! প্রায় ফিসফিসিয়েই লছমী বলে, ভিতরে ভিতরে এতটা ছেলেমানুষ তুমি, পণ্ডিত !

মুখটা নামিয়ে আবেগ মথিত একটা চাপা কণ্ঠস্বরে বলতে থাকে সোমনাথ,—ভিতর—ভিতরটা এক-এক সময় হাহাকার করে ওঠেরে, বড়ো একা আমি, বড়ো একা !

দ্রুত পায়েই ও' চলে আসে লছমীর কাছ থেকে। কোণ্ডার ঘরে গেঞ্জিকোটলুদের সামনে উচ্চহাসির লহর তুলেছে তখন নোকন্না সর্দার, একটা ছোট কেরোসিন বাতির লালচে আলো এসে পড়েছে তার প্রসন্ন মুখের ওপরে। পথটা চট্ করে পেরিয়ে উঠে আসে নিজের ঘরে। বাতিটা ধরায়। প্রায় রাত্রিই তার কাটে অরন্ধনে। ফলাহারে।

এইবার ছাতে গিয়ে মাহুর পেতে শুয়ে পড়বে। বাতিটা নিভিয়ে ছাদে যাবার ঠিক আগে একবার গিয়ে দাঁড়ায় জানালার কাছে। নোকন্নার উচ্চকণ্ঠ এখনো ভেসে আসছে কোণ্ডার ঘর থেকে। আর সব অন্ধকার। অস্পষ্ট আলোয় শুধু দেখা যায় কে যেন দাওয়ার ওপরে সিঁড়িতে পা রেখে বসে আছে চুপচাপ। নিশ্চয়ই লছমী,—একা!

একা, আজ নিজেকেও বড়ো একা মনে হচ্ছে সোমনাথের। নিসঙ্গ, নিঃঝুম, ছাতে শুয়ে আকাশের অজস্র তারার দিকে তাকিয়ে উদ্বেল হয়ে ওঠে মন আত্ম-জিজ্ঞাসায়। লছমীকে তার ভালো লাগে; কেমন একটা স্নেহ জাগে ওর ওপর, এই মাত্র। নাগমণি? নাগমণিকেও ভালো লাগে। বড্ডো মায়া পড়ে ওর ওপর, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

এ কী চিন্তায় সে এলোমেলো হয়ে উঠল আজ! মাধবরাও কণ্ট্রাক্টর তার সর্বনাশ করেছে। যেন ঝাঁকি দিয়েছে তার দেহ আর মনকে দু'হাতে! লছমী নয়, নাগমণি নয়, অন্য কেউ,—অন্য এক অধরার দিকে তার মন পাখির মতো উড়তে লাগল তারাময় রাত্রির আকাশে। একবার তার মৃত বোনটির মুখখানা ভেসে উঠল মানসপটে।

সর্বনাশ, ও যে তার মায়ের মুখ,—কৃষ্ণবেণী!

নীল—নীল এক সমুদ্র পার হয়ে যেন এক নীল দেশে এসে সে উত্তীর্ণ হলো অকস্মাৎ। গাছ—পালা—নদী—প্রান্তর সব নীল! কেউ কোথাও নেই, শুধু সে, আর তার হাত ধরে তার মা, এক অপার্থিব আনন্দময়ী মূর্তি। 'সোমলু এইখানে তুই থাকবি; এইখানে তুই বাঁধবি ঘর, বিয়ে করে বউ নিয়ে আসবি!'

বউ? পাখি-ডাকা ঊষার আভাস এসে তার চোখে লাগে, ধীরে ধীরে ঘুচে যায় স্বপ্নের ঘোর, উঠে বসে। আরেকটি প্রভাত। বেরিয়ে পড়ে গোদাবরীর তীরে। স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়—

সূর্যোদয়ের অব্যক্ত আশীর্বাণী যেন ছড়িয়ে আছে নদীর জলে—তার গোদাবরী,—তার মা! ঘর বাঁধা তার হবে না, বাঁধলেও এই নদীতট ছেড়ে সে কোথাও যেতে পারবে না।

ওরা ততক্ষণে এসে পড়েছে। ওদের কাজের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এক অপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য! সমস্ত দিনটাই আজ কেমন যেন এক ছন্দে বাঁধা, সুরে বাঁধা; দূর থেকে লছমীকে দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে বুঝি সর্দার নিজেই। দুহাতে ধরা কাপড়ের গোছাটা নদীর জলে ছুঁইয়ে সজোরে আছড়ে ফেলছে পাথরের ওপরে, মনে হচ্ছে, অমিতবিক্রমে ওরা যুদ্ধ করছে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে। জীবন সংগ্রাম। কিন্তু সেখানেও সুর। কোটিলিঙ্গম্-শিবের মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠছে মাঝে মাঝে, ঢং ঢং! সে সুরের সঙ্গে এ সুর যেন চমৎকার মিলে গেছে আজ।

সে বেশী বেড়াবে না। পার্বতী-মার সঙ্গে দেখা হলেই শুরু করবে চিত্রাঙ্গীর গল্প। আজ দরকার নেই সেই সর্বনাশা কাহিনী শুনে। লছমীকেও হয়ত আজ সে এড়িয়ে চলতো। কিন্তু তাকে দেখতে পেয়ে তাকে দূর থেকে ডাকতে ডাকতে নিজেই ছুটে এলো মেয়েটা। অদ্ভুত এক খুশীতে হিল্লোলিত হয়ে উঠছে তার সর্বাঙ্গ, আনন্দে ঝলমল করছে তার মুখ।

—কী রে লছমী?

লছমী ওর কাছে এসে হাঁপাতে লাগলো। একটু দম নিয়ে বলল,—কোণ্ডা এসেছে।

—এসেছে! কোথায়?

—ঘুমুচ্ছে ঘরে। আমি আর ডাকলাম না। ঘুম ভাঙলে নিজেই আসবে'খন।

লছমীর এই খুশী হয়ে ওঠাটাও যেন আজকের সুরের সঙ্গে সুর মেলানো। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল,—নাগমণি?

—নাগমণির খোঁজ ও' পায়নি। খুব খুঁজে ছিল নাগমণিকে!

বলেই হেসে উঠলো লছমী, বলল,—আমি ওকে জ্বলে ফেলেছি পণ্ডিত। বড়ো কষ্ট হলো ওর অবস্থা দেখে।

—কী বলেছিস্?

—নাগমণির কথা। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। নদী-তীরের সেই খারাপ জায়গায় থাকার কথা। স—ব।

—কেন, এ-সব তুই বল্‌তে গেলি?

আবার একটু দম নিয়ে একটু ফিসফিসিয়েই লছমী বলল,—আমাদের জাতের এক বখাটে ছেলের সঙ্গে মিলে ও' কাল খুব তাড়ি খেয়ে এসেছে!

—তাড়ি?

হ্যাঁ, পণ্ডিত! আমাদের জাতের অনেকেই খায়। ও' একেবারে মাতাল হয়ে ফিরে এসেছে কাল।

—তারপর?

মুখে কাপড় দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো লছমী, আমি ওর চোখে মুখে মাথায় জল ঢেলে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করছি, আমার আঁচল ধরে কী কান্না পুরুষ মানুষটার। বলে, 'তোকে ছেড়ে কোথাও যাব না লছমী! আমার পয়সাগুলি সব তুই রেখে দিস্। আমি কখনো চাইব না'। ওঃ সে এক দেখবার মত ব্যাপার!

লছমীর বলার ভঙ্গিতে সোমনাথও হেসে ফেলল, বলল,—নাগমণির কথা তুলছিল না?

—একদম না—লছমী বলল,—আমিই বরং খ্যাপাবার জন্য নাগমণির কথা তুললাম!

—আচ্ছা দুষ্টু তুই! সোমনাথ বলল,—নাগমণির সব কথা শুনে ও' বুঝি খুব গম্ভীর হয়ে গেল?

—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপরই আমার আঁচলটা তেমনি ভাবে—ব'লে আবার হাসতে লাগল লছমী।

উঁচু পাড়টার ওপর দিয়ে জোরে বেল-টা বাজাতে বাজাতে

সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে কন্ট্রাক্টর মাধবরাও। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। তবু সে ঘন ঘন বেল বাজিয়ে গেল কেন, তা বুঝতে কষ্ট হলো না সোমনাথের। একটু অপ্রতিভ হয়েই সরে গেল সে লছমীর কাছ থেকে। লছমী ধীরে ধীরে ফিরে গেল জলের ধারে তার বাবার কাছে। বুড়ো নোকম্মা তখন পুরোদমে কাজ করে চলেছে।

কেটে গেল সারাটা তুপুর। কোণ্ডাকে সারাদিন দেখতে পেলো না সোমনাথ। তুপুরে বাড়ি এসে রান্না করে ভাত নিয়ে লছমী চলে গেল নদীর দিকে। সারাদিন রোদে পুড়ে আজ কাজ করবে নোকম্মার দল, ফেলে-রাখা কাজগুলি শেষ করবে। কোণ্ডাও গেছে পরে, অসুরের মত সে নাকি খাটছে আজ।

তুপুরটা যেন ছটফট ক'রে কাটালো সোমনাথ। ঘুম এলো না। এলো সেই চিন্তার ঝড়। ফাঁকা মনটা যেন ভরাট হয়ে উঠতে চায়। কল্পনার শাখায় ভর দিয়ে যেন উড়ে যেতে লাগল এক সোনালী পাখি রোদের সোনা মেখে নীল নীল আকাশ পেরিয়ে দূর দিগন্তে!

বিকেলে সূর্যের উত্তাপ যখন স্নিগ্ধ হয়ে এসেছে, উঠে দাঁড়ালো সোমনাথ। আর শোওয়া নয়, এবার বেরিয়ে পড়তে হবে। বেরুতে বেরুতেও কিন্তু সময় কেটে গেল! এলোমেলো চিন্তার আবর্তে পড়ে কেমন মন্থর হয়ে আসে মনের সমস্ত উত্তম! ঘুরে ফিরে মৃত বোনটির কথা মনে হচ্ছে। বাবাও সুস্থ হয়ে উঠেছেন কি না কে জানে। পার্বতী-মার সঙ্গে দেখা হলে ভালো হতো। অতি পরিচিত চিত্রাঙ্গীর গল্পটার শেষটুকু শুনে আসতো পার্বতী-মার মুখে। কিন্তু এ কী অদ্ভুত অস্থিরতা জাগলো তার মনের মধ্যে?

নামবে বলে সিঁড়ির দিকে এগিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দ্রুত পায়ে নিচে থেকে ওপরে উঠে এলো লছমী। সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল—কী ব্যাপার?

—একটু কফি এনেছি তোমার জন্য। বাবা পাঠিয়ে দিলো।

একটু হেসে ধূমায়িত কাঁচের গেলাসটি হাতে তুলে নেয় সোমনাথ, বলে,—কোথায় নোকন্না ?

—বাড়িতে বসে আছে।

—কাজ হয়ে গেল তোদের ?

—হ্যাঁ।

—কোণ্ডা ?

লছমী মাথা নেড়ে জানালো,—নেই।

—বলিস্ কী ?

লছমী বলল,—আমি আগে এসেছি বাসায়। বাবা আর ও' আসছিল পিছনে পিছনে নদীর তীর থেকে। পথের মাঝে বাবার মাথায় সব মোট চাপিয়ে দিয়ে বলেছে,—'তুমি যাও, আমি একবার ঘুরে আসি শহর থেকে',—বাবাও ভাল মানুষ, ওকে ছেড়ে দিল!

—নাগমণিকে খুঁজতে বেরুল নাকি ?

লছমী বলল,—তাহলে ত বাঁচতাম, পণ্ডিত। বুঝতাম স্থিতি হলো যা হোক্, কিন্তু তা ত হবে না। ও' গেছে নিশ্চয়ই তাড়ির খোঁজে। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করলাম, বাবা বলল,—'তা একটু নেশা-টেশা না করলে চলবে কেন!' দেখ ত পণ্ডিত, যদি পুলিসে টের পায়!

—ও' ত এ রকম ছিলো না লছমী ? আমার অসুখের সময় দিনরাত কাছে কাছে থাকত, কখনো ত ঠিক এমনটি দেখিনি!

—না পণ্ডিত, এ রকম ছিল না। খেয়াল। খেয়ালের বশে হঠাৎ এই সব করছে।

—খেয়াল ? আজ নিজের মনের চাঞ্চল্য দিয়ে কোণ্ডাকে যেন নতুন করে অনুভব করে সোমনাথ। পুরুষের এই খেয়ালের অন্ত নারী কোনদিনই বুঝি পায় না!

কী একটা অব্যক্ত আবেগ হঠাৎ আসে বন্যার মতো পুরুষের অন্তরে, মথিত হতে থাকে সমস্ত হৃদয়, অজানা-অচেনার দিকে পাড়ি দিতে চায় মন, সমস্ত দৈনন্দিনতাকে ছাপিয়ে যেতে চায়!

—কী ভাবছ পণ্ডিত ?

লছমীর বিস্মিত মুখখানির দিকে তাকায় সোমনাথ। লাল টকটকে একটা শাড়ি পরেছে। পড়ন্ত রোদের আভা বুকের কাপড়ে ঠিক্‌রে মুখে এসে পড়েছে।

সোমনাথ বলে,—কিছু নারে, কিছু না। আমি যাই,—বলে ওকে পাশ কাটিয়ে হনহন করে নেমে যায় পথের দিকে।

বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ ছাতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে লছমী। হ'লো কী হঠাৎ এই ভালো মানুষটির ?

নরেন্দ্রকোটার দিকে কখনো-সখনো বেড়াতে যায় সোমনাথ। চিত্রাঙ্গী-কাহিনীর শেষ পরিণতির কিংবদন্তী বহন করে আজো নির্জন-নিস্তব্ধ পড়ে আছে জায়গাটা। বড়ো একটা টিপি। একটা ক্ষুদ্র কুঠুরীর ধ্বংসাবশেষ ঘিরে গাছ-গাছালি বেড়ে উঠেছে। কেউ কেউ জায়গাটাকে বলে—শারঙ্গধর। সেই হতভাগ্য রাজকুমারের নাম। পথ দিয়ে যেতে যেতে পথিকের দল একবার থম্‌কে দাঁড়ায় এখানে, আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে কুঠুরীর দিকে, বলে,—এই সেই সর্বনেশে জায়গা !···

কাছে এসে তৎক্ষণাৎ আবার কিন্তু ফিরে যায় সোমনাথ। নিজের মনটাকে যেন কশাঘাত ক'রে শাসন করতে চায়। কেন সে এলো এখানে আজ ? কেন তাকে হঠাৎ এক ভাবালুতায় এমন ভাবে পেয়ে বসল ? তার থেকে যাওয়া যাক্ বরং 'প্রকাশ রাও—ম্যাট্রিক'—ছেলেটির কাছে। সোডার ব্যাপার নিয়ে কতদূর কী সে করল, জানা যাক্। একটা কাজের সূত্র পেয়ে মনটা আবার ভরে উঠলো উদ্যমে। দ্রুত পা চালিয়ে দিলো সোমনাথ। কিন্তু রেললাইন পেরিয়ে ওপারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই নামল সন্ধ্যা।

স্টেশনের রাস্তার মোড়টা বিপণির নিওন্ আলোর নীলাভায়

বিচ্ছুরিত। মোড়ের কোলাহলের মধ্যে না গিয়ে ডানদিকের সরু পথটি ধরল সোমনাথ গোদাবরীর দিকের। পার হ'তে লাগল অনেকগুলি গলিপথ।

প্রকাশ রাও কিন্তু বাড়িতে ছিল না। বাইরে নামের ফলকটা ঠিক তেমনি ঝুলছে, দরজায় প্রকাণ্ড তালা। সন্ধ্যা ততক্ষণে বেশ ঘোর হয়ে গেছে। আবার নদীর দিকে ফিরে এলো সোমনাথ।

কেন সে এখানে আছে এভাবে পড়ে? ভাড়াটেদের ক'টি টাকায় কোনক্রমে টিকে থাকাই বা কেন? কাজের খোঁজে অনায়াসেই সে যেতে পারে দক্ষিণে মাদ্রাজে অথবা উত্তরে বিশাখাপত্তনে। ওখানে কেউ তাকে অনর্থক যক্ষ্মারোগী ব'লে এভাবে দূরে ঠেলে ফেলে রাখবে না!

কিন্তু কার জন্যে সে যাবে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টায়? কে-ই-বা আছে তার? কিন্তু যদি কেউ থাকত? নদীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কতো কী কল্পনায় ভরে যায় তার মন! বিরস জীবনের মূলদেশে ধীরে ধীরে হ'তে থাকে রস-সঞ্চার। অন্যমনস্ক চিত্তে পায়চারি করতে থাকে নদীর পথটি ধ'রে!

চিন্তারও বিরতি ঘটে এক সময়। যখন ঘটে, তখন চম্‌কে চেয়ে দেখে সোমনাথ তার সামনেই হল্‌দে রঙে রঙ করা সেই সারি সারি ব্যারাকের মত ঘরগুলি। ঠিক কথাই ত! আজ ত তার আসার কথা ছিলো এখানে! ওর বন্ধুর সঙ্গে নাগমণি আলাপ করিয়ে দেবে। কিন্তু তেমন মনেই ছিলো না কথাটা! 'চিত্রাঙ্গী' নামটাই কেমন ভয়ে কাঁপায় মনটাকে!···একদিক থেকে ভালোই হ'লো, কোণ্ডার খবরটা দিয়ে যেতে পারবে নাগমণিকে। দীর্ঘ বারান্দাটার একটা ঘরের সামনে বসে কে একটি লোক বেহালা বাজিয়ে চলেছে এক মনে, তাকে ঘিরে পথ পর্যন্ত জুড়ে বেশ বড়ো একটা জনতার ভিড়। খুঁজে খুঁজে নাগমণির সেই বন্ধুর ঘরখানা বা'র করবার চেষ্টা

করতে লাগলো সোমনাথ। অবাক্ কাণ্ড, নাগমণির কথাটা তার একবারও মনে হয়নি।

ঘরখানা চিনে নিয়ে দাওয়ার ওপর উঠে এলো। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর আভা বাইরে এসে পড়েছে। আর আসছে নূপুরের ঝংকার। মৃদঙ্গের তালে তালে চলেছে কার নৃত্যের আরতি। বাইরে বেহালার রেশ, আর এদের বন্ধ ঘরে নাচের হিল্লোল। ফিরেই ওর যাওয়া উচিত। কিন্তু স্বরের মূর্ছনা। আর মৃদঙ্গ-রঙ্গ তাকে যেন আবিষ্ট করে ফেলেছে মুহূর্তে,—যেতে গিয়েও যেতে পারছে না সে!

পণ্ডিত!

খট্ ক'রে এক সময় খুলে গেল দরজা,—নাগমণি ওকে দেখে বিস্ময়ে আনন্দে যেন অভিভূত হয়ে পড়ল। বলল,—ভিতরে এসো। কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছ? ডাকতে পারনি?

নাগমণির পায়ে ঘুঙুর, কোমরে নীলশাড়ির আঁচলটা শক্ত করে জড়ানো,—নৃত্যের শ্রমে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জ'মেছে, আলো লেগে মুক্তার মতো চিকচিক করছে!

—ভিতরে এসো?

—কেন?

মাথা নেড়ে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে নাগমণি বলে,—কেন আবার! বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? লোকে দেখে কী বলবে? এসো?

একপ্রকার হাত ধরে টানতে টানতেই তাকে ভিতরে নিয়ে গেল নাগমণি। একটু হেসে বলল,—নাচের অভ্যাস করছিলাম, আমার বন্ধু বাজাচ্ছিল মৃদঙ্গ।

বলেই বন্ধুর সঙ্গে সাড়ম্বরে পরিচয় করিয়ে দিলো নাগমণি। ওর গুরু-মা, যিনি তাঁর কণ্ঠের জন্য 'বসন্ত-কোকিলম্' বলে খ্যাত ছিলেন, তারই মেয়ে চিত্রাঙ্গী।

সূক্ষ্ম রূপালী পাড়ের সাদা শাড়ি-পরা, বেণীবদ্ধ কেশরাশির ঊর্ধ্বমূলে মুকুটের মতো পরেছে রজনীগন্ধার শুভ্র স্তবক। কর্ণে আর

নাসিকায় জ্বলজ্বল করছে সাদা পাথরের সূক্ষ্ম আভরণ। দেহের বর্ণ গৌর, অনবদ্য স্বাস্থ্যশ্রী, অপরূপ স্নিগ্ধ মুখখানা, চিবুকের কাছে সামান্য একটু টোল থাকায় একটা ছেলেমানুষীর ভাব ফুটে আছে। ভয়ানক চেনা-চেনা মনে হচ্ছে মেয়েটিকে। যেন কোথাও দেখেছে সে এ'কে। কে-এ' ?

মেয়েটি করজোড়ে জানালো,—নমস্কার।

নাগমণির বলা সেই কুখ্যাত কাঁচঘরের কথা একবার ধক্ ক'রে জ্বলে উঠল সোমনাথের মনে। কিন্তু এ'কে দেখে মনেই আনা যায় না কাঁচঘরের ঐ উচ্ছৃঙ্খলতার স্বরূপ। শিশির ধোওয়া ফুলের মতই পবিত্র, কাঁচঘরের মালিন্য যেন এ কাঞ্চনটিকে ছুঁতেও পারেনি। কিন্তু কোথায় সে দেখেছে ওকে ? ঠিক মনে পড়েও যেন পড়ছে না।

ওর এই বিহ্বল ভাব লক্ষ্য ক'রে হেসে উঠল নাগমণি,—আমার বন্ধুকে দেখে কারুরই চোখের পলক পড়ে না। কেমন, সুন্দর নয় ও' ?

সোমনাথ অপ্রতিভ হয়ে মুখ নিচু করে, চিত্রাঙ্গী হাত তুলে ওকে তাড়না করতে যায়, খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে ঘরময় যেন ছুটে বেড়াতে থাকে নাগমণি। এক সময় বলে,—জানো পণ্ডিত, আমারি জাতের মেয়ে, কিন্তু আমার মত মুখ্যু নয় ও, অনেক কিছু শিখেছে, অনেক কিছু জেনেছে !

—আবার !—ওর দিকে এগিয়ে যায় চিত্রাঙ্গী। হাসির লহর তুলে এঁকে বেঁকে সাপিনীর মতই আবার পালাতে চায় নাগমণি। অদ্ভুত এক লীলার নেশা পেয়ে ব'সেছে যেন আজ ওকে,—মনে হয় খুশী যেন উপছে পড়ছে ওর দেহ-মনের পেয়ালা থেকে! হঠাৎ-আসা এ আনন্দ-কল্লোলের কী তুলনা আছে ? মন যেন মুহূর্তে ভরে ওঠে! মেয়েটি নাগমণিদেরই জাতের মেয়ে, অর্থাৎ নাগাস্থ! এইবার বুঝতে পারছে সোমনাথ,—স্বচ্ছ হ'য়ে আসছে স্মৃতির কুয়াশা! কাছে আসে নাগমণি, বলে,—তুমি বসো পণ্ডিত!

—নারে, বস্‌ব না,—সোমনাথ বলে,—তোকে কোণ্ডার খবরটা দিয়ে যাই।

—কী খবর পণ্ডিত ?

সোমনাথ সবই ওকে বলে। নেশার কথা। আজ বিকেলে শহরের দিকে বেরিয়ে পড়বার কথা। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার তেমনি বাঁধভাঙা ঝর্ণার মতো হাসির লহর তোলে নাগমণি, বলে,—কী পাগল ! কী পাগল ঐ লোকটা !

চিত্রাঙ্গী ওকে থামিয়ে দেয়, দিয়ে ঘরের একদিকে নিয়ে যায় ওকে টেনে, কানে কানে কী যেন বলে ফিসফিস করে, তারপরে তুজনেই চলে যায় ভিতরের বারান্দার দিকে। ঘরে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সোমনাথ একা। জলচৌকীর ওপরে রাখা ধূপদানীতে তেমনি আজও পুড়ে পুড়ে গন্ধ বিকীরণ করছে ধূপ,—ধোঁয়ার রেখাগুলি উর্ধ্বে উঠে তেমনি শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিটির পায়ের কাছে বিলীন হয়ে যাচ্ছে !

পরক্ষণেই ভেতরে আসে ওরা তুজনে। নাগমণি খুব কাছে সরে আসে। তেমনি তুষ্টুমিভরা হাসিহাসি মুখ। বলে,—বোসো পণ্ডিত, আমি এখুনি আসছি।—

বলেই ছুটে যায় দরজার কাছে। দরজাটা পার হ'তে হ'তে তুষ্টুমি করে ব'লে যায়,—গল্প করো আমার বন্ধুর সঙ্গে, আমি আসছি।

চলে যায়। কিন্তু কতো কঠিন যে আজ ওর বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা, সেটা যদি বুঝতে পারত মেয়েটা ? এ যে সেই মেয়ে, তা কী ক'রে বুঝবে সোমনাথ নাগমণির কথা শুনে ? তুর্বলতায় তুরু তুরু কাঁপছে বুক—জোরে বাতাস দিলেই অমূল তরুর মতো সে বুঝি লুটিয়ে পড়বে মাটিতে ! এমনটি তার আর কোনদিন হয়নি।

'মহাজনলো !'·····

মনে পড়্‌ছে সেই ভজন-গান থামিয়ে উপহারের ডালি হাতে তুলে নেওয়া, আর কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলে সমাগত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন,— 'মহাজনলো ! শ্রীরামের গানে আনন্দ পেয়ে কোনো এক ভক্ত

শ্রীরামের এই দাসীকে শাড়ি উপহার দিচ্ছেন, শ্রীরাম এঁকে শতবর্ষ-আয়ু দান করুন এবং এঁকে আর এঁর পরিবারের সবাইকে সুখে রাখুন!'

ব'লে শাড়িটি বাদকদের সামনে অন্যান্য উপহার-সামগ্রীর পাশে নামিয়ে থালাটি দাতাকে ফেরত দিয়ে আবার পায়ে-পায়ে তাল রাখছে মেয়েটি, পদ-সঞ্চালনে নূপুরের একটা ঝংকার জাগছে, আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করছে মেয়েটি তার থামিয়ে-দেওয়া গানের কলি। পরনের সেই গোলাপী শাড়ি আর টকটকে লাল ব্লাউজের ওপরে বুকে তুল্‌ছে রক্ত-করবীর-গুচ্ছ-সাজানো ফুলের মালা,—কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই,—গানের গভীরে যেন অবগাহনে নেমেছে মেয়েটি,—একেবারে একা!

ধূপের ধোঁয়ার কাছে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তারই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে চিত্রাঙ্গী দুটি আয়ত চক্ষু মেলে। কিন্তু কোথায় আজ ওর গোলাপী শাড়ি আর রক্তকরবীর মালা! নীরবতা ভাঙতে কিন্তু অন্য প্রসঙ্গেই চলে আসে সোমনাথ, বলে,—তোমার কথা সব শুনেছি নাগমণির কাছে।

চোখ নামালো চিত্রাঙ্গী, কেন যেন হঠাৎ আরক্ত হয়ে উঠল তার মুখ। লজ্জার জড়িমা কাটাবার জন্যই যেন জোর ক'রে সে বলে উঠল,—নাগমণি বলেন বুঝি, আমরা বলি চন্দ্রসেনা। এক কথায় চন্দ্রা। কিন্তু আপনি বসুন?

—না—না, আমি যাব।

কেমন-এক ধরণের অনুনয়-ভরা কণ্ঠে চিত্রাঙ্গী বলল,—চন্দ্রা এখুনি আসবে।

অগত্যা বসতেই হলো খাটের এককোণে, বল্লল,—জানা নেই শোনা নেই, এমন লোককে ঘরে ঢুকতে দেওয়া সব সময় নিরাপদ কী?

বিচিত্র এক হাসি ফুটল চিত্রাঙ্গীর মুখে, কিন্তু বলল না সে কিছুই। বুঝতে পারল সোমনাথ, তার প্রশ্নটা এর কাছে কতো নিরর্থক! জানা নেই শোনা নেই—এমন লোকের সংস্পর্শে আসা

ত নতুন নয় ওর জীবনে ! এবার নীরবতা ভঙ্গ করে চিত্রাঙ্গীই, বলে, —চন্দ্রার মতো মেয়ে হয় না ! আমরা যা পারিনি, ও' তা পেরেছে। ও ছিট্‌কে বেরিয়ে গেছে গণ্ডি থেকে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে সোমনাথ বলে,—কোণ্ডার কথা জানো ?

—জানি। সবই ও বলেছে। প্রথমটায় রাগ হয়েছিল। পরে, ওর ওপর আমার ভালবাসাই বেড়ে গেল।

একটু হেসে সোমনাথ বলে,—ওর মতো তোমারও বুঝি ঘৃণা ভদ্রলোকদের ওপর ?

তেমনি বিচিত্র ম্লান একটা হাসি ফুটল ওর মুখে, কিছু বলল না। একটু পরেই ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢুকল নাগমণি, হাতে তার খাবারের ঠোঙা, সেগুলি চিত্রাঙ্গীর কাছে নামিয়ে রেখে প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে বলে উঠল,—কোণ্ডা !

—সে কীরে ! কোথায় ?

—নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বাড়িগুলি দেখছে ! আমি যাই। নিশ্চয়ই খুঁজছে ও' আমাকে !

বলেই ছুটে যায় ভিতরে। নীরবেই কেটে যায় কয়েক মুহূর্ত। ভিতর থেকে আবার ঝড়ের মতো বেরিয়ে আসে নাগমণি। ভালো শাড়ি ছেড়ে পরেছে সেই আগের বেশ। ওর অপস্রিয়মান দেহটাকে চকিতে ধ'রে ফেলে চিত্রাঙ্গী, বলে,—ছুটিস্ না এমন পাগলের মতো ! আর, এ কী পোশাক !

—না-না, ছাড়্-ছাড়্ !—বলে এঁকেবেঁকে নিজেকে কোনক্রমে ছাড়িয়ে নিলো নাগমণি, একবার থম্‌কে দাঁড়ালো, বলল, আমাকে দেখতে না পেলে ও' নিশ্চয়ই নেশা করতে ছুটবে ! আমি যাই।

চলে গেল। একটা ঝড় অকস্মাৎ উঠে অকস্মাৎই মিলিয়ে গেল যেন !

হাসির উজ্জ্বল আভায় ভরে গেছে চিত্রাঙ্গীর মুখ, বলে, আপনি অবাক্ হলেন ? ও' চিরকাল অমনিই।—

তারপর খাবারগুলি থালায় সাজিয়ে পরিপাটীরূপে সোমনাথের সামনে ধরল মেয়েটি।

—একি করেছো! আমি ত···

বাধা দিয়ে অদ্ভুত মিনতির সুরে মেয়েটি বলে,—আপত্তি করবেন না।

—না-না, আপত্তি নয়, কিন্তু এত···

—এত কিছুই নয়।—আবার সেই অনুনয়,—খান আপনি।

কয়েকটা মুহূর্ত পার হতে থাকে। অভূতপূর্ব এক তৃপ্তির আলো ফুটে ওঠে মেয়েটির মুখে চোখে। এক সময় খাওয়া শেষ হয়, প্লেট আর জলের গেলাস নামিয়ে নিয়ে চলে যায় মেয়েটি, আবার ফিরে আসে। বলে,—সারাদিন ধরে আপনার কথাই কেবল শুনেছি নাগমণির মুখে। আপনাকে ও যে কী ভক্তি করে!

তারপরে এক সময় একটু হেসে তরল কণ্ঠে বলে,—বামুনের ছেলে হয়ে আপনি নাকি পৈতে ফেলে দিয়েছেন?

—সবই শুনেছো দেখছি!

—স-ব শুনেছি,—বলতে বলতে মুখ নামায়, একটু বোধ হয় ইতস্ততঃ করে, তারপরে সেইভাবেই ধীরে ধীরে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠেই ব'লে ওঠে,—দেখেছিও আপনাকে।

মনে-মনে একটু চম্‌কেই ওঠে সোমনাথ। সে দেখা ত মুহূর্তের জন্য,—তা-ও দু'বছরের আগের কথা। তাকে মনে রেখেছে মেয়েটি!

চিত্রাঙ্গীর মুখখানা তখনো নত,—আস্তে আস্তে কথা বল্‌ছে,—যেন একথা কাউকে বলার নয়,—নিজের মনকেই শুধু শুনিয়ে যাবার। বলে,—কোটিলিঙ্গম্-মন্দিরের দরজায় পূজোর থালা নিয়ে সবে দাঁড়িয়েছি, দেখছি, কাছাকাছি কোনো পূজারী বামুন আছেন কি না,—এমন সময় চান ক'রে ফিরছিলেন আপনি,—না, না,—তখনো পৈতে ফেলে দেন নি,—নইলে বামুন ব'লে চিনেছিলাম কেমন ক'রে? বললাম,—পূজোটা দিয়ে দেবেন? আমি নাগাসুদের মেয়ে, ভিতরে

যাব না।···আপনি বললেন,—আমিও যাব না।···চ'লে গেলেন। আর অবাক্ হ'য়ে আমি চেয়ে রইলাম। বামুনের ছেলে হ'য়ে এ' বলে কী? আমাদের দেশে এ'তো ভাবাই যায় না। চন্দ্রার কাছে আপনার কথা সেদিন যখন শুনলাম,—তখনই কেমন যেন মনে হ'য়েছিল,—আর কেউ নয়,—এ' ঠিক সেই ছেলে।

সোমনাথ একটু হেসেই বলে,—এই কী একটা মনে-রাখবার মত ঘটনা!

—আপনার তাই মনে হয় বুঝি?—মেয়েটি বলে,—আমার দেখুন স্পষ্ট স-ব মনে আছে। যদি জিজ্ঞাসা করেন,—কেন?—তার উত্তর কিন্তু দিতে পারব না!

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সোমনাথ বলে,—আমাকে দেখেই তা'হলে চিনতে পারলে?

হাসির আভায় ঝলমল ক'রে উঠল মেয়েটির মুখ, মাথাটি একটু নেড়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে জানালো,—হ্যাঁ।

সোমনাথ বলে,—আমিও চিনতে পেরেছি।

চিত্রাঙ্গী কিন্তু একটু অবাক্ই হয় এবার, মুহূর্তের জন্য ওর চোখে চোখ রেখে বুঝতে চেষ্টা করে সোমনাথের মনোভাব,—তারপরে একটু হেসে মুখ নামিয়ে একটু তরলকণ্ঠেই ব'লে ওঠে,—এটা কিন্তু ঠিক পুরুষের মতো কথা হলো না।

—কেন!

অদ্ভুত একটা কৌতুকের ঢেউ জেগেছে চিত্রাঙ্গীর মনে,—মুখখানি চাপা হাসির আলোয় রাঙা, ঠোঁট-টিপে-হেসে-ওঠার মধ্যে দুষ্টুমি-দুষ্টুমি ভাব,—চিত্রাঙ্গী বলে,—মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে কত মেয়েই ত পূজো-দেবার অপেক্ষা করে,—তাদের মনে রাখে কয়জন পুরুষ?

—আমি রেখেছি,—সোমনাথ বলে,—তোমাকে দেখা সে-ই আমার প্রথম নয়। দৌলেশ্বরমের পথে এক ছোট্ট পুরানো মন্দির মনে পড়ে? ভজন-গান কর্‌ছিলে তুমি। গোলাপী শাড়ি,—লাল করবীর গুচ্ছ

দিয়ে গাঁথা মালা তোমার গলায়,—কিছুক্ষণের জন্য মাত্র দেখেছিলাম তোমাকে। পথে-যেতে-যেতে-থম্‌কে-দাঁড়িয়ে,—কী চমৎকার তন্ময় হ'য়েই না গাইছিলে তুমি গান!

সোমনাথের কথা শুনতে শুনতে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছে চিত্রাঙ্গী, মুখ তুলে তাকাতে গিয়ে কেন-যেন হঠাৎ জল এসে পড়ে চোখে,—তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে গোপন করতে চায় সেই অকারণ অবারণ অশ্রু!

—কী হলো তোমার!

—কিছু না,—একটু ফিরে দাঁড়িয়ে আঁচলে মুখ ঢেকে ধরা গলায় কোনক্রমে বলে ওঠে চিত্রাঙ্গী—এ-তো দেখতে ইচ্ছা করছিল আপনাকে! পার্থসারথী ঠিক তাই পাঠিয়ে দিয়েছেন!

—পার্থসারথী?

আঁচলে সন্তর্পণে চোখ মুছে আবার ওর দিকে ফেরে মেয়েটি, একটু অবাক্ হয়েই ওর দিকে চোখ তুলে তাকায়,—বলে,—শোনেন নি আমার মায়ের কথা?

দেয়ালে-টাঙানো শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিখানার দিকে আঙুল নির্দেশ ক'রে চিত্রাঙ্গী বলে,—ঐ ঠাকুরটিকে মা ডাকতো 'পার্থসারথী' ব'লে। ভেবে দেখুন ত, আমাদের জীবন-রথকে চালিয়ে নিয়ে যেতে ওর মতো সারথী আর কে আছে?

বিস্মিত হ'য়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে সোমনাথ। মেয়েটি বলে, —মার কাছে কুরুক্ষেত্রের কথা শুনতাম। আমরা নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়ে,—আমাদের এই অদ্ভুত জীবনটাই ত একটা কুরুক্ষেত্রের কথা। ঐ ঠাকুরটিকে আমাদের সারথী না ক'রে উপায় আছে?

এ কী অভিনব জীবন-দর্শন! উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায় সোমনাথ, বলে,—পড়াশুনা কতদূর করেছ তুমি?

—কিছুই না—মেয়েটি বলে,—পড়তে ইচ্ছা করে। আপনি শিক্ষিত শুনেছি, আমাকে পড়াবেন আপনি?

—আমি ভাবছি ঠিক বিপরীত কথা। তুমি আমাকে পড়াবে? যে বাঁধনে মনটাকে বাঁধতে পেরেছ, আমার এই চঞ্চল মনটাকে সেই বাঁধনে বেঁধে দিতে পারো?

মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ালো সোমনাথের,—মুক্তার বিন্দুর মতো অশ্রুকণা ঝলমল করছে তার চোখের কোণে, বলল, —সবই ত জানেন আমার। এমন কথা বললেন কেমন করে? বাঁধতে পেরেছি মনকে? ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি!

জোর করে যেন ওর সান্নিধ্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে আনল সোমনাথ, দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

—শুনুন?

—কী?

চিত্রাঙ্গী আবার কাছে এসে দাঁড়ালো, বলল,—এখনি যাবেন আপনি?

—তাই উচিত নয় কী?

—না,—অদ্ভুত লীলায়িত ভঙ্গিতে মেয়েটি বলে,—আরেকটু থাকুন।

—কেন?

—'কেন'!—মেয়েটির 'কেন' উচ্চারণ শুনে মনে হলো, সে যেন নিজেকেই নিজে করতে চায় এই প্রশ্ন। বলল,—আসুন, আপনাকে গান শোনাবো।

ফিরে দাঁড়ালো সোমনাথ, সাগ্রহে বলল,—শোনাবে?

—শোনাবো। আসুন?

আবার ভিতরের দিকে এলো সোমনাথ। একটুক্ষণ থম্‌কে থেমে একটু-যেন হেসে উঠল মেয়েটি, আপনমনে বলল,—কোনো যন্ত্র নয়, খালি গলায়, কেমন?

—বেশ। তা-ই।

ওর চোখের দিকে তাকায় চিত্রাঙ্গী,—গান শুনতে বুঝি খুব ভালো লাগে?

—কার না লাগে ?

মেয়েটি আবার হাসল,—আপনার বোধ হয় কিছু বেশী মাত্রায়। নইলে যেভাবে ছুটে পালাচ্ছিলেন, ধরে রাখাই দায় !

—আমাকে ধরে রেখে তোমার লাভ ?

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল মেয়েটি, মুহূর্তে নিভে গেল তার সমস্ত প্রগল্‌ভতা ! বড়ো করুণ, বড়ো অদ্ভুত মনে হয় মেয়েটিকে। ওর কণ্ঠস্বরে একটা কান্নার সুর, ওর হাসিতে কান্না, ভঙ্গিতে কান্না, যেন সমস্ত সত্তাটাই কাঁদছে অনুক্ষণ।

কী হয় সোমনাথের মনে, হঠাৎ বলে ওঠে,—তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো ?

বিদ্যুৎ বেগে ওর দিকে ফিরে দাঁড়ায় মেয়েটি, বলে,—কী ?

—একটু বাইরে আসবে ? একেবারে কাছেই।

—কী ?

সোমনাথ গাঢ়কণ্ঠে বলে,—আমার মা।

—মা ? শুনেছি তিনি ত··

বাধা দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে ব'লে ওঠে সোমনাথ,—না-না, বেঁচে আছে আমার মা। এসো-এসো, দেখবে এসো।

নিঃসংকোচে মেয়েটিও বেরিয়ে আসে পিছনে পিছনে। বেহালা তখনো চলেছে, সুব বদল হয়েছে মাত্র ! জনতার লক্ষ্য সেদিকেই বেশী থাকায় এরা তেমন কারুর নজরে পড়ল না। চট্ করে পথটা পার হয়ে নদীর ঢালু পাড়ে নেমে যায় ওরা দুজনে। বাঁধা ঘাটটা এখানে নয়, ডানদিকে বেশ কিছু দূরে। অন্ধকার নদীতীর। ক্ষীণ তোয়ধারা ব'য়ে চলেছে।

—এই দেখ আমার মা,—সোমনাথ বলে,—কান্নার ধারা আজ আনন্দের ধারার মতো বইছে।

ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে চিত্রাঙ্গী। সোমনাথ বলতে থাকে তার মায়ের কথা। তার মায়ের মতো কে পেয়েছে কষ্ট ? তার

মায়ের মতো কে করেছে আত্মত্যাগ? বলতে বলতে কখন যে অন্যমনস্কভাবে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে চিত্রাঙ্গীর কম্পিত কোমল হাতখানা,—সে ওর চেতনাই নেই।

চিকচিক করছে তারার আলো জলধারার ওপর, সেই আলোর আভা ওদের ললাট এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে, মায়ের আশীর্বাদের মতো!

চাপা ফিসফিসানির সুরেই চিত্রাঙ্গী বলে,—আমার ভয় করছে!

—কেন?

—কী জানি!

এতক্ষণে হঠাৎ যেন এক অবসন্নভাব থেকে জেগে ওঠে সোমনাথ, ওর ধরা-হাতখানা ছেড়ে দেয় তাড়াতাড়ি—না, না, এ কী! এ কী হলো তার জীবনে!

অদ্ভুত এক আতঙ্কে যেন কেঁপে ওঠে ওর বুক। সরে দাঁড়ায়। তারপরে নীরবেই ওরা ফিরে আসতে থাকে ঘরের দিকে। রাস্তায় উঠে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢোকে মেয়েটি, সোমনাথ দরজার সামনে দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। দরজা বন্ধ হয়নি, সোমনাথের নিজের মনই নিজেকে শাসন করছে শুধু!

দ্রুত ফিরে যেতে লাগল সোমনাথ। এক-একবার মনে হতে লাগল, অপূর্ব এক আনন্দরসে যেন ভরে উঠেছে ওর মন, অন্তরের হাহাকার হয়েছে শান্ত! আবার পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, এ' কী করল সে! কী অধিকার ছিল তার মেয়েটিকে নিয়ে নির্জন নদীতীরে নামবার? চিত্রাঙ্গী! চিত্রাঙ্গী না হয়ে অন্য নাম যদি হতো মেয়েটার, তাহলে বোধ হয় এতটা অস্বস্তি অনুভব করত না সোমনাথ! পার্বতী-মা কেন যে তাকে এমন করে বলল চিত্রাঙ্গীর গল্পটা, কে জানে!

রাত হয়েছে বেশ। নদীর মোড় ফিরে নিজের গলিপথে এসে পড়ল সে। কিন্তু ও কী! তার ঘরের সিঁড়ির নিচে লণ্ঠন জ্বালিয়ে বসে আছে,—ও' কারা? দুটি স্ত্রীলোক বলে মনে হয় যেন। তার সাড়া পেয়ে একজন চট্ ক'রে উঠে দাঁড়ায়, সে লছমী। ছুটে কাছে

আসে।—বলে,—পণ্ডিত! এখন এলে। পার্বতী-মা তোমার জন্য বসে আছে।

—পার্বতী-মা?

—হ্যাঁ, বাবা,—লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে প্রৌঢ়া উঠে পড়ে,—আর দেরি নয়, চল্ আমার সঙ্গে।

একটা আশঙ্কা জেগে ওঠে মনে, ব্যাকুল হয়ে সোমনাথ বলে,—কী হয়েছে পার্বতী-মা?

তোর বাবা—কী আশ্চর্য শান্ত পার্বতী-মার কণ্ঠস্বর,—তোর বাবার শেষ সময়। বাইরে বার করে রেখেছে।

—কী বললে!

—হ্যাঁ, সেই যে তোর বোন মারা গেল। তখন থেকেই বিছানা নিয়েছে।

অস্ফুট কণ্ঠে কোনক্রমে বলে সোমনাথ,—চলো।

লছমী হঠাৎ চোখে আঁচল চাপা দেয়, কিন্তু লুকোতে পারে না কান্না। এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে সোমনাথ—কিন্তু কীই বা বলার আছে ওকে। নীরবেই চলতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে অশ্বত্থ গাছটার তলা দিয়ে যাবাব সময় পার্বতী-মা ব'লে ওঠে,—মেয়েটি ভালো। আসতে চাইছিল, কিন্তু অন্ত্যজাতের মেয়ে বামুনের কাছে এ সময় আসবে কেমন ক'রে?

কানে কিন্তু কোন কথা যাচ্ছে না সোমনাথের। গোদাবরীকে বেঁধেছে যে দীর্ঘ সেতু, তার ওপর দিয়ে তখন একটা গাড়ি পার হয়ে যাচ্ছে, সারি সারি আলোর বিন্দুগুলি যাচ্ছে সরে সরে, নিচে নীরব নিথর গোদাবরী।

আবার পথের বাঁক। ছবির মতো শৈশবের ঘটনাগুলি চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। শৈশব, তারপরে যৌবন। সেদিন ঘাটে ভুল করে বাবাই তাকে বললেন, পিতৃ-তর্পণ করাবে! তখনই কেঁপে উঠেছিল ভিতরটা,—মনে হয়েছিল, সময় কী তবে আসন্ন?

আশ্চর্য এদের সংস্কার। অন্ধকার নির্জন ক্ষুদ্র গলিটায় তাদের বাড়ির দরজার কাছে খাটিয়া পেতে শুইয়ে রেখেছে মুমূর্ষু বৃদ্ধকে। কালো দরজাটার একটা কপাট মাত্র খোলা, সেই চৌকাঠের এক কোণে একটা প্রদীপ জ্বলছে মিটিমিটি, হাওয়ায় মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে ভীরু শিখা! ধারে কাছে কেউ নেই। মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ একাকী পথের ওপর শুয়ে শেষ মুহূর্তটির প্রতীক্ষায়!

লণ্ঠনের শিখাটি কমিয়ে শিয়রের কাছে পথের ওপর বসে পড়ল পার্বতী-মা। সোমনাথও হাঁটু মুড়ে বসলো বৃদ্ধের মুখের কাছে। বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেছে বহুক্ষণ, মাঝে মাঝে শ্বাস উঠছে, সমস্ত অঙ্গ ঠাণ্ডা—অসাড়। প্রাণ যেন চোখ দুটির কাছে এসে জানিয়ে যাচ্ছে তার শেষ চাঞ্চল্য!

—বাবা!

কিন্তু ওর এ' কান্নার কোনো সাড়া এলো না। শুধু মুমূর্ষুর দুই চোখের কোণ বেয়ে নামতে লাগলো অবিরল অশ্রু।

ফিসফিস-করা চাপা কণ্ঠে পার্বতী-মা বলে,—অবুঝ হয়ো না, সোমনাথ। কথাও কয়ো না।

—কিন্তু এভাবে ফেলে রেখেছে কেন?

—জানো না?—তেমনি চাপা কণ্ঠে পার্বতী-মা বলে,—এই সময় কারুরই কাছে থাকবার কথা নয়। দেবতারা আসবেন শেষ সময়ে, আসবেন মহাকাল। কান্নার রোল তুলে ওঁর যাবার পথ পিছল করে তুলো না।

—বাবা!

কিন্তু কাকে বারবার ডাকছে সোমনাথ? চক্ষু দুটি স্থির হ'য়ে আসছে, কী যেন দেখছেন বৃদ্ধ! হয়ত তার মা, মা এসে বসেছেন বাবার পাশে। কিন্তু, বড়ো কঠিন, বড়ো কঠিন সন্তানের পক্ষে নিজেকে এভাবে বেঁধে রাখা।

—আমাকে কেন খবর দেয়নি, পার্বতী-মা?

—কে দেবে খবর ? বোঝো ত সবই সোমনাথ।

এক সময় স্তব্ধ হতেই হয় সোমনাথকে। হয়ত এ' ভালই হলো। বৃদ্ধ বয়সে ঐ ভাবে ঘাটে ঘাটে ঘুরে যাত্রী ধরার প্রয়াস,—এ কৃচ্ছ্র সাধন থেকে ত বাঁচলেন অন্ততঃ! পার্বতী-মা বলে,—এবার সরে এসো সোমনাথ। এ সময় ছুঁতে নেই।

—ছুঁতে নেই!

পার্বতী-মা বলে,—না, এখন ছোঁবেন দেবতারা।

সরে আসে সোমনাথ। এই সব অমানুষিক নিয়ম-কানুনের ওপরে ঘৃণায় যেন জ্বলতে থাকে তার মন। কিন্তু কিছু করারও নেই। ধীরে চৌকাটে-রাখা প্রদীপটার পাশের কবাটটা খুলে যায়,—একটা অশরীরী উপস্থিতির মতো এসে দাঁড়ায় কৃষ্ণবেণী।

ক্রমে ক্রমে আসে সেই মহালগ্ন। একেবারে স্থির হয়ে যায় চোখের তারা দুটি। জেঠা-কাকাদের ভিড় বাড়ে। তার জেঠী ও কাকীর দল সমস্বরে একটা কান্নার সুর তোলে। সুরে-সুরে বিলাপ চলতে থাকে। বিস্মিত বিস্ফারিত চোখে সে দেখতে থাকে এ অপূর্ব অভিনয়ের পালা! শুধু চুপ করে থাকে পার্বতী-মা, চুপ করে থাকে কবাটের পাশে দাঁড়ানো কৃষ্ণবেণী। তার এক কাকী কৃষ্ণবেণীর গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে বিলাপের ঝড় তোলেন, কিন্তু এক খণ্ড পাথরের গায়ে ঢেউ লেগে ঢেউই ফিরে আসে, পাথর পাথরই থেকে যায়। কাকী অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকেন সেই পাষাণীর দিকে এক মুহূর্ত, তারপর কেমন ঠোঁট উল্‌টে অদ্ভুত বিরক্তি প্রকাশ ক'রে সরে যান তাঁর অন্য এক জায়ের কাছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধ'রে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকেন দুজনে।

মনে হলো, এ এক নতুন জগতে যেন এসে পড়েছে। সে যেন এদের কেউই নয়, অনাবশ্যক অবাঞ্ছিত এক আগন্তুক!

কিন্তু পারলৌকিক কাজ ত পুত্রকেই সারতে হবে! সারার আগে করতে হবে প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্তের প্রসঙ্গে বিদ্রোহ করেছিল মন—

কিন্তু পার্বতী-মার কথায় শান্ত হয় সে। যেন আত্মসমর্পণ করে শেষ বারের মতো স্থবির এই সমাজ-দেবতার পায়ে।

ক'টা দিন কাটে তার এদের মধ্যে। কাকা জেঠাদের বাইরের ঘরের বারান্দায় খাটিয়া পেতে রাত্রে শুয়ে থাকে। দিনে থাকে ভেতরে, —কাকা-জেঠাদের মধ্যে। কৃষ্ণবেণীকে দেখতে পায় না, পার্বতী-মা আসে কম। রাত্রের দিকে যখন সে একা শুয়ে থাকে বাইরে, তখন কখনো-সখনো আসে, হাতে সেই কালিপড়া-চিমনী পুরানো লণ্ঠনটা।

—সোমনাথ কী ঘুমিয়েছিস্ ?

—না, পার্বতী-মা।

প্রৌঢ়া কাছে এসে বসে। বলে,—শোক করিস্ না।

—না।

—যে গেছে, ভালই গেছে।

সোমনাথও উঠে বসে খাটিয়ায়, বলে,—আমারও তাই মনে হয় আজ।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রৌঢ়া বলে,—তোর বাপ তখন বড়ো হয়েছে। তোর মাকে আনল বৌ ক'রে ঘরে। মনে হয় যেন সেদিনের কথা।

—তোমাকে কখনো ভুলবো না পার্বতী-মা। তুমি না ডাকলে শেষ দেখাটা হতো না।

পার্বতী-মা বলে,—ওরা সব ভিতরে গেল, আমি একটু গিয়েও ফিরে এলাম। তখনো জ্ঞান আছে। বললাম,—চিনতে পারছ ?—পেরেছিল চিনতে। ঠোঁটে যেন হাসিও ফুটে উঠলো। বললাম, এই হাসিমুখ নিয়েই চলে যাও, তোমার ঘর রইল, সংসার রইল, ছেলে রইল। আমি যেদিন যাব সেদিন কিন্তু কিছুই আমার থাকবে না। আমার কথা শুনে সেই প্রথম চোখে তার জল নামল। ঠোঁট দুটো কাঁপল। থাকতে পারলাম না, বললাম,—সময় নেই, বলো কী বলতে চাও ? সোমনাথকে ডাকবো ? নিজের সন্তানকে দূরে সরিয়ে দিয়েছো ;

মিথ্যে সন্দেহের আগুনে জ্বলে পুড়ে,—ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে তাকেই আনলে নিজে বিয়ে ক'রে,—সে কী ছেলের দোষ? আজও কী ডাকবে না কাছে? মাথা নেড়ে জানালো,—হ্যাঁ,—আমি আর দেরি করলাম না,—পড়ি-কী-মরি ক'রে ছুটে এলাম তোর কাছে।

আজীবন কুমারী এই ব্রাহ্মণ-তনয়ার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সোমনাথ! পার্বতী-মা বলতে লাগল,—ছোট থেকেই ত তোর বাপকে জানি, কিন্তু বুড়ো বয়সে আর একটা ভুল সে ক'রে গেল। আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরেছি, শুধু দেবতার পায়ে এই প্রার্থনাই করেছি, বলেছি—ঠাকুর এই করো, ও' যেন আর ভুল না করে!—

কিন্তু আমার ডাক দেবতা শোনেন নি। তোর বিয়ে দেবে বলে নিজে কতো আগ্রহ করে গেল মেয়ে দেখতে। কিন্তু কী অদ্ভুত, নিজেই বিয়ে ক'রে বসল সেই মেয়েকে! যে তোর বউ হতো, সে হলো তোর মা!

বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে সোমনাথ,—ও-কথা থাক, পার্বতী-মা!

—ও' কাঁচা বয়সের মেয়ে, একা থাকবে সংসারে। ওর জীবনের সাধ-আহ্লাদ সবই বুঝি ঘুচল!

মিনতিব স্বরে সোমনাথ বলে,—এ-সব কথা থামাও, দোহাই পার্বতী-মা।

চুপ করে বসে রইল প্রৌঢ়া। নীরবে পার হয়ে গেল কিছু সময়।

—সব কাজ ত তোব হয়ে গেল,—প্রৌঢ়া আবার শুরু করে, —কালকের কাজটাই হলো শেষ কাজ। তা' শেষ হ'তে হ'তে বিকেল হয়ে যাবে। তারপর, করবি কী সোমনাথ? এখানেই থাকবি?

—না। পৈতেটা আবার ছিঁড়ে ফেলবো। চলে যাব যেখানে ছিলাম সেখানে। এদের থেকে ওরাই আমার ভালো।

—কৃষ্ণবেণী?

—ওঁকে দেখবার জন্য অনেকেই ত রইলেন।

—হুঁ।—চুপচাপ বসে রইল প্রৌঢ়া।

—তুমি বাড়ি যাবে না, পার্বতী-মা? রাত অনেক হলো!

—যাবো রে যাবো, বাড়ি ত প'ড়েই আছে!

প্রৌঢ়া আবার তেমনি চুপচাপ বসে রইল। ওঁর দিকে তাকাতে তাকাতে অদ্ভুত মায়ায় ভরে উঠল সোমনাথের মন। এখনো কী বুঝতে বাকি আছে কী বেদনায় মথিত হচ্ছে ওঁর বুকের ভিতরটা!

ওঁর কাছ ঘেঁষে ব'সে পড়ে সোমনাথ, বলে,—পার্বতী-মা?

—কী রে?

—গল্প বলো একটা। তোমার মুখে গল্প শুনতে বড়ো ভালো লাগে।

—কীসের গল্প রে? চিত্রাঙ্গীর?

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে সোমনাথ। তারপরে বলে,—বেশ, তাই বলো।

পার্বতী-মা বলে,—আমার ছোট বয়সে তোর বাবাই প্রথম আমাকে বলেছিল গল্পটা। শুনতে শুনতে কাঁটা দিয়ে উঠত গায়ে।

একটুক্ষণ থেমে আবার বলতে থাকে প্রৌঢ়া,—হাতিতে চ'ড়ে মহারাজ আসেন চিত্রাঙ্গীকে দেখতে। সে কী ধুমধাম—বাজনাবাদ্যি আর আলোর মেলা!

চিত্রাঙ্গীর কথায় হঠাৎ মনে পড়ে যায় নাগমণির বন্ধু সেই চিত্রাঙ্গীর কথা। সেই ধূপের ধোঁয়া উঠে উঠে শ্রীকৃষ্ণের পটের মধ্যে বিলীন হ'য়ে-যাওয়া! বেশ কয়েকদিন কেটে গেল তার এখানে, ওদের খবরা-খবর সে বিশেষ রাখেনি। একবার দেখা হয়েছিল কোণ্ডার সঙ্গে,—ঘাটে। তার পণ্ডিতজীর কথায় ছেলেমানুষের মতো হু হু করে কেঁদে ফেলেছিল লোকটা। সান্ত্বনা দিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলো সোমনাথ,—লছমীর খবর কী রে?

—ও'-ও কাঁদছে খুব,—বাড়িতে ব'সে।

এটুকু বুঝেছিল সোমনাথ, ক্ষ্যাপাটে কোণ্ডা আবার তা হলে ফিরে এসেছে লছমীদের কাছে। নোকন্নাও এসেছিল গতকাল দেখা করতে। দূর থেকে প্রণাম জানিয়েছিল। কিন্তু বাধা বিপত্তি না মেনে সে এগিয়ে গিয়েছিল তার কাছে।—কী খবর সর্দার ?

—সোডা আমরা পেয়েছি, পণ্ডিত। আমাদের জয় হয়েছে।

—পেয়েছিস্ !

—হ্যাঁ।—নোকন্না বলে,—রীতিমত লড়াই, প্রকাশ রাও ছেলেটি আমাদের জন্য খুব করেছে।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সোমনাথ বলেছিল,—আমি তোদের কিছুই করতে পারলাম না রে !

—আশীর্বাদ করো পণ্ডিত,—নোকন্না বলেছিল,—বাহাদুর ছেলে বটে প্রকাশ রাও। দরখাস্তে কিছু হলো না দেখে আমাদের সব একজোট করলো। মাঠে দাঁড়িয়ে আমাদের ডেকে নিয়ে সভা ক'রে কতো-কী বলল একদিন। সবাই মিলে একসঙ্গে গেলাম সরকারী অফিসে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দাবি জানালাম,—আমাদের হয়ে ঐটুকু ছেলে প্রকাশ রাও খুব করল বটে !

প্রকাশ রাও—ম্যাট্রিক,—তাহলে সোমনাথের অপেক্ষা আর করেনি। ভালই করেছে।

পার্বতী-মার কণ্ঠস্বরে চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল সোমনাথের। পার্বতী-মা তাকে একটু ঠেলা দিয়ে বলল,—ঘুমুলি নাকি ?

—না।

—শুনছিস্ ত গল্প ?

—শুনছি, তুমি বলো।

পার্বতী-মা বলতে থাকে। মহারাজ এবার ফিরবেন, নিজের গলার গজমতির হারখানা খুলে পরিয়ে দিলেন সেই রূপমতীর গলায়। চারদিকে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল,—জয় মহারাজের জয় !

…আবার বাজল বাঁশী, আবার সাজল হাতি, লোকলস্কর। দেশে ফিরে গেলেন মহারাজ। তিনি চলে যেতেই সখীরা এসে জড়িয়ে ধরল চিত্রাঙ্গীকে। চুপচাপ পাষাণ-প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আছে কন্যা, দুটি নিটোল মুক্তার মতো দুই ফোঁটা চোখের জল শুধু ঝলমল ক'রে উঠল তার সেই বড়ো-বড়ো টানা-টানা চোখ-দুটির কোণে। সখীরা বলে,—কান্না কেন রাজকন্যা? তুমি ত রাণী হতে চলেছ!

চিত্রাঙ্গী ছুটে গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে, বিছানায় লুটিয়ে প'ড়ে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল কান্নায়। না-না, চায়নি সে রাণী হ'তে! সে হ'তে চেয়েছিল যুবরাণী,—রাজরাণী নয়। কিন্তু কী এ' ভাগ্যের লীলা! ছেলের জন্য মেয়ে পছন্দ করতে এসে নিজেই মুগ্ধ হয়ে মহারাজ বিয়ে করছেন সেই মেয়েকে!

রাণী হয়ে রাজপ্রাসাদে এলো চিত্রাঙ্গী! কত শাড়ি, কত গয়না, কত ধরনের কত উপহার! কত পোষাপাখি,—হীরামন-ময়না-টিয়া আর পারাবতের দল! বৃদ্ধ মহারাজ তরুণী ভার্যার জন্য রীতিমত অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু মন যে কাঁদে চিত্রাঙ্গীর। সে যে ছবি দেখে ভালবেসেছিল তরুণ-রাজপুত্র শারঙ্গধরকে। ভাট এনেছিল কুমারের ছবি,—চিত্রাঙ্গী জানত,—এই তার স্বামী,—এই তার সর্বস্ব! কিন্তু ভাগ্যের দোষে এ কী হলো তার শেষ পর্যন্ত?

কুমার থাকেন অন্য এক প্রাসাদে। তার সঙ্গে দেখা হবার কোনো সুযোগই নেই। মাত্র একবার—একবারের জন্য দেখা পাওয়া যায় না তার! হয়ত চিত্রাঙ্গীর আকুল প্রার্থনা ভগবান শুনলেন। হঠাৎ একদিন হ'য়ে গেল যোগাযোগ। লোকে বলে, রাজকুমারের সব থেকে প্রিয় সাদা পায়রাটি কী ক'রে যেন পালিয়ে এসে উড়ে বসলো রাণীর অলিন্দে। পায়রাটাকে ধরতে এগিয়ে যায় কুমার, তাড়া পেয়ে উড়ে যায়,—আবার ছোটেন, এমনি করে করে অজ্ঞাতসারে একেবারে রাণীর মহলে।…ঢেউ-খেলানো অলিন্দ-প্রাচীরের এক কোণে ব'সে আছে সাদা পায়রাটি। একটা পুষ্পিত কুর্চি-গাছের আড়ালে দেখা

যাচ্ছে তাকে অস্পষ্ট,—সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন কুমার,—আস্তে আস্তে চুপিচুপি পা ফেলে ফেলে। একেবারে কাছে গিয়ে নিচু থেকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেন পায়রাটিকে,—হাত পড়ল গিয়ে কোমল একটি হাতের ওপর। অপর দিক্ থেকে নতুন রাণীও এসেছিলেন চুপিচুপি এগিয়ে পায়রাটিকে ধরবার জন্য। রাণীর হাতের তলায় কাঁপছে ভীরু সাদা পায়রা,—সেই হাতের ওপর গিয়ে পড়ল কুমারের হাত। চম্‌কে তুজনেই সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে মুখ তুললেন তুজনকে দেখতে। এ'পাশে চিত্রাঙ্গী, ও'পাশে শারঙ্গধর। নির্জন ফুলের কুঞ্জে এইভাবে তুজনের হঠাৎ দেখা হ'য়ে যাওয়া!·· ···

বাধা দিয়ে সোমনাথ ব'লে ওঠে এই সময়,—অনেক রাত হয়ে গেল পার্বতী-মা! আজ থাক্।

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে পার্বতী-মা বলল,—বাকিটা পরে শুনবি বলছিস্?

—হ্যাঁ।

—বেশ।

লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় পার্বতী-মা, বলে,—আবার ঘুরতে বেরুবো রে, আবার যাবো তীর্থে তীর্থে।

কোমলকণ্ঠে সোমনাথ বলে,—কেন পার্বতী-মা, অনেক ত ঘুরলে!

—তা ঘুরলাম! নাসিকে গিয়েছিলাম ত? গোদাবরীর সেতুটা পার হয়ে বড় রাস্তা দিয়ে তা প্রায় ক্রোশ তুই পথ হাটতে হয়। তারপরে ডানদিকে একটা গলি। গলি ধরে যেতে হয় পঞ্চবটীর তপোবনে। ভারি ভালো জায়গা রে। নাসিকে গোদাবরীও দেখবার মতো। একটা জায়গাকে বলে গোদাবরী আর কপিল গঙ্গার সঙ্গম!

একটু হেসে সোমনাথ বলে,—এ জায়গাটাকে তুমিও ছাড়তে পারবে না, পার্বতী-মা!

—কেন !

—বাইরে বেরিয়েও সেই গোদাবরী !

—তোকে সেই শাপভ্রষ্ট দেবকন্যার গল্প বলেছিলাম,—মনে আছে ? পার্বতী-মা বলে,—যিনি গোদাবরী হ'য়ে তপস্যা করছেন ? সেইজন্যই ত বলে, দেবকন্যা গোদাবরী !

—মনে আছে।

একটু থেমে, করুণ কণ্ঠে পার্বতী-মা বলে,—সে তপস্যার আজও শেষ নেই।···আচ্ছা তুই ঘুমিয়ে পড় সোমনাথ, আমি এবার যাই।

গলির বাঁকে কালিপড়া পুরানো লণ্ঠনটা ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিকেল কেন, সন্ধ্যাই হয়ে গেল সোমনাথের সমস্ত কাজ সেরে সেদিন এদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরুতে বেরুতে। জ্ঞাতিদের মধ্যে অতিথির মতই কয়েকটা দিন সে কাটালো ওদের বাইরের বাড়িতে। তাদের নিজের বাড়ির অংশে প'ড়ে আছে কৃষ্ণবেণী, একা। কাকী-জেঠীরাই খোঁজ নিয়েছে তার, পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপের সময় দু'একবার বাইরে এসেছে। এর আগে কোনদিন সে ভালো ক'বে দেখেনি ওকে। তাব সেই মৃত বোনটির মুখই যেন বসানো একেবারে ! সেইরকমই টানা-টানা চোখ, ছোট্ট কপালের নিচে ভ্রূ-দুটি ঘন,—নাসিকার ওপরে দুটি ভ্রূ-ধনু জোড়া হ'য়ে মিশে গেছে। ভারী কোমল মুখখানা, বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিচের ঠোঁটটি একটু স্থূল, চিবুকের কাছে একটা ভাঁজ, ফরসা গায়ের রঙে একটু হল্‌দের আভা আছে।

পরপর কোলের মেয়ে আর স্বামীকে হারিয়ে যেন সমস্ত অনুভূতি অসাড় হ'য়ে গেছে কৃষ্ণবেণীর। একরাশ রুক্ষ চুল পিঠের ওপরে এলানো, স্থির শূন্য দৃষ্টি কাছের মানুষ ছাড়িয়ে দূরের দিকে নিবদ্ধ, হাত ধ'রে যজ্ঞবেদীর ধারে এনে বসিয়ে দিয়েছে কাকী-জেঠীরা, পাষাণ-

মূর্তির মতো ব'সেই আছে, একধারে, নীরব—নিথর। তারপরে সময় হ'য়ে গেলে নিজেই উঠে চ'লে গেছে, কোনো চাঞ্চল্য নেই, কিছু নেই, একটা নিষ্প্রাণ যন্ত্র যেন চলাফেরা করে গেল তার সামনে!

কিন্তু এই মৃত সমাজ তার কাছে অসহ্য। প্রাণশক্তিতে পূর্ণ কয়েকটি নরনারীর সঙ্গে মিশবার পর ওদের যেন মৃত বলেই মনে হয়। কতগুলি মৃতলোক যেন জীবন্তের অভিনয় করে যাচ্ছে, এই মাত্র।

এ তার ভালো লাগবে না। বেরিয়ে পড়ল সোমনাথ, বাড়ি যাবার আগে একবার ঘুরে যাবে। স্টেশনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, দৈত্যের মতো অতিকায় ইঞ্জিনটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হিসহিস করছে! আর কেন মিছে দেরি, এখুনি যে পূর্ণ উদ্যমে ছুট্‌তে হবে তাকে!

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা পার হ'য়ে গেল। স্টেশনের রেল লাইনের নিচের নাতিদীর্ঘ টানেলটা পেরিয়ে যেতে যেতে দুজন বৃদ্ধ চেট্টির কথা কানে গেল সোমনাথের। চেট্টিরা বণিক। চুপি চুপি কথা বলতে বলতে চলেছিল দুজনে। বাড়িতে মাটির নিচে গোপন ঘর তুলে তাতে লুকিয়ে রেখেছে অজস্র চালের বস্তা। উর্বরা গোদাবরী-জেলার চাল সমস্ত অন্ধ্র দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে বলা চলে। সেই গোদাবরীর চাল জমিয়ে বণিকরা সৃষ্টি করেছে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, চালু রেখেছে কালোবাজার। কিন্তু মাটির নিচে ঘর তুলে চালের বস্তা রাখার ফন্দীটা অভিনব বটে!

এই বণিক-বৃত্তিও বুদ্ধিজীবী সমাজেরই অন্যতম বৃত্তি। ক্রমে ক্রমে ঘৃণাই ধ'রে যায়। এরই প্রতিক্রিয়া হয়ত তার অবচেতন মনকে টানে দ্রুত নাগমণিদের ঘরের দিকে। পার্বতী-মার বলা চিত্রাঙ্গীর গল্প মনে পড়ে। কুমার শারঙ্গধর পেলো চিত্রাঙ্গীর দেখা! কিন্তু, তারপর?

দরজা খোলাই ছিল। খাটের ওপর ব'সে বীণার তারে অন্যমনস্ক ভাবে দুটো-একটা ঝংকার তুলছে মেয়েটি, ঘরে আর কেউ নেই। সোমনাথের সাড়া পেয়েই খাট থেকে নেমে এলো তাড়াতাড়ি।

—আসুন।

চৌখাট পেরিয়ে ভিতরে দু'এক পা এগিয়ে এসেছে সোমনাথ, বলল,—নাগমণি কোথায় ?

এই ত ছিল,—চিত্রাঙ্গী বলল,—বেরুল সেই ছেলেটার সঙ্গে।

—ছেলেটা ?

—হ্যাঁ,—মেয়েটি বলে,—সেই রজকের ছেলে। কোণ্ডা।

বিস্মিতই হয় সোমনাথ, কোণ্ডা না ফিরে গিয়েছিল লছমীর কাছে? বলল,—কোণ্ডা !

একটু হেসেই বলে চিত্রাঙ্গী,—কোণ্ডা। এই ত এতক্ষণ দাওয়ায় বসে আমরা গল্প করছিলাম। সিনেমায় গেল ওরা দুজনে। ও' যাবে না, কোণ্ডা ওকে নিয়ে যাবেই।

—কোণ্ডা তোমাদের বাড়িটা চিনেছে দেখছি !

একটু হাসল মেয়েটি, বলল,—যা দেখলাম, ছেলেটা এমন প্রকৃতির যে, যা' ধরবে, তা' ক'রে ছাড়বেই। এমন লোকের পক্ষে ক'দিন ঘোরাঘুরির পর বাড়ি চেনা কঠিন নয় !

—তা' ঠিক। এই বুঝি তুমি ওকে প্রথম দেখলে ?

চিত্রাঙ্গী বলল,—হ্যাঁ। আপনি বসুন ?

বীণাটির কাছে গিয়ে বসলো সোমনাথ খাটের ওপর। পুরানো ধরনের কারুকার্য-খচিত এই বীণা। বলল,—সুরের মধ্যে অসুরের মতই বোধ হয় প্রবেশ করলাম।

—কী বললেন ?

—তুমি নিশ্চয়ই গান গাইছিলে ?

সলজ্জ একটা হাসির আভা জাগল চিত্রাঙ্গীর মুখে, অস্ফুট কণ্ঠে বলল,—না।

তারপর কাছে এসে বীণাটি খাট থেকে তুলে যথাস্থানে রেখে দিলো। ভালো ক'রে চেয়ে দেখল সোমনাথ। সাধারণ একটা শাড়ি পরনে, একরাশ ঘন কালো চুল বেণীর শাসন থেকে মুক্ত হয়ে কটিদেশ ছাপিয়ে ছড়িয়ে প'ড়েছে। মুখখানা কেমন যেন ম্লান, পাণ্ডুর

যেন মুখশ্রী, শুধু বড়ো-বড়ো চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। খাট থেকে উঠে ওর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সোমনাথ, বলল,—কী হ'য়েছে তোমার ?

ভিতরের দরজার কবাটের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো চিত্রাঙ্গী, মুখখানা নিচু ক'রে তেমনি অস্ফুট চাপা কণ্ঠেই বলল,—কিছু না।

ওর কাছেই দাঁড়িয়ে রইল সোমনাথ। ধূপের গন্ধে ভ'রে গেছে ছোট্ট ঘরখানা, ব্যারাকের অন্য কোনো ঘরে কোনো মার্গ-সংগীত-শিক্ষক হয়ত শেখাচ্ছে তার ছাত্রীকে কঠিন তানের ঝংকারগুলি। মাঝে মাঝে পুরুষকণ্ঠ, মাঝে মাঝে স্ত্রী-কণ্ঠ, কখনো বা উভয়ের মিলিত কণ্ঠ। গানের ভাষা ছেড়ে যখন শুধু তানের সাধনায় আসছে ওরা, তখন মনে হচ্ছে—একটা খরস্রোতা ঝরনাধারা যেন কঠিন উপলখণ্ডের ওপর আছ্ড়ে পড়ে পথ ক'রে সহস্র ধারায় নিচে নেমে যাচ্ছে !

সোমনাথকে অবাক্ করে চিত্রাঙ্গীর ঘন কেশের বন্যা ! যেন বহু ঢেউ উঠে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে ! ধীরে ধীরে অলকগুচ্ছ স্পর্শ করে সে,—যেন পুঞ্জীভূত রেশমের মধ্যেই হাত পড়ে তার।

কিন্তু সেই মৃদু ছোঁয়াতেই বীণার তারের মতো কেঁপে ওঠে চিত্রাঙ্গী। কী হয় তার মধ্যে কে জানে, হু-হু-করা কান্নায় হঠাৎ ভেঙে পড়ে। সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত সংশয়ের তীরে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে আজ সোমনাথ। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্থবির মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী জীবন ও মনের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। এই মুক্তির আস্বাদ তার অলক্ষ্যে তার মনের মধ্যে কী মাধুর্যের মালা যে গেঁথে চলেছিল, তার সন্ধান সে-ই কী রাখত ? কান্নায় কেঁপে-ওঠা মেয়েটিকে বুকের মধ্যে অকস্মাৎ দু'হাতে টেনে নিলো সোমনাথ, আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলল,—কাঁদছ কেন ?

তেমনি বুকে মুখ লুকিয়েই মেয়েটি বলল, আমি কী জানতাম, বাবা চলে গেছেন এ'ভাবে ! আমি ভীষণ রাগ করেছিলাম।

—রাগ ?

—হ্যাঁ। মাকে দেখিয়ে তুমি চলে গেলে, আর এলে না।

ভারি ভালো লাগল ওর এই অন্তরঙ্গ 'তুমি' সম্বোধন। বলল, —দেখেছ তুমি আমার মাকে?

—কতো সময় আমার কেটে যেতো নদীর তীরে,—তেমনি অস্ফুট-কণ্ঠেই বলতে থাকে মেয়েটি ওর বাহুবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে,—নদীকে বলতাম, তুমিও আমার মা। কিন্তু এমন হলো কেন আমার? কেন সে আসে না?

—এই ত এলাম।

দুই ভ্রূর মাঝখানে একটা কুঙ্কুমের টিপ পরেছিল মেয়েটি, ধীরে ধীরে মুছে যায় সেই কুঙ্কুম ব্যাকুল আতপ্ত ওষ্ঠের আশ্লেষে। এক মুহূর্ত মুখখানা ঘন করে ছুঁয়ে রাখে সোমনাথের বুকে। তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চট্ করে চ'লে যায় ভিতরে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে আরক্ত মুখে, নববধূর মতো লজ্জাজড়িত ধীর পদক্ষেপে।

মুখ তুলে তাকায়, সোমনাথের চোখে চোখ মিলিয়ে হঠাৎ খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে মেয়েটি। আঁচল চাপা দেয় মুখে। বিমূঢ় বিস্মিত সোমনাথের কাছে এসে সেই আঁচল দিয়েই মুছিয়ে দেয় সোমনাথের মুখ। বলে,—চন্দ্রা ফিরে এসে তোমাকে এভাবে দেখলে ঠাট্টায় একেবারে অস্থির করে তুলত।

ব্যাপারটা তখনো বোধ হয় ভাল করে বুঝতে পারেনি সোমনাথ, বলে,—কী বল্ছ?

একটু হেসে ওর দুটি হাত দু'হাতে শক্ত ক'রে ধ'রে তুলতে শুরু করে চিত্রাঙ্গী, গুনগুন ক'রে একটা সুর তোলে, অস্ফুট গুঞ্জন-তোলা একটা গানের কলি, বলে, ক্ষেত্রায়ার একটা পদ আছে। রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে। গোপিকার কাছ থেকে কৃষ্ণ এবার চ'লে যাবেন। গোপিকা বলছে, তুমি চলে যাচ্ছ, মুছে যাচ্ছ আমার আঁচলে মুখ, কিন্তু অনুরাগের কুঙ্কুম মুছবে কেমন করে? মুকুরে মুখ দেখ, ধরা পড়বে

না। কিন্তু আমার মনের মুকুরে তোমার ছায়া ফেল দেখি, দেখবে, কিছুই মোছেনি গো, কিছুই মোছেনি।

সংকোচের জড়িমা থেকে ধীরে ধীরে সংগীতের সুধায় ডুবে যায় সোমনাথ, বলে,—গুনগুন ছেড়ে জোরে গাও না।

চিত্রাঙ্গী বলে,—উঁহু। জোর দিলেই অন্যলোকের কানে যাবে। এ শুধু তোমার-আমার গান।

সোমনাথ বলে,—ক্ষেত্রায়া কে? নামটা শুনেছি-শুনেছি মনে হচ্ছে।

—ষোড়শ শতাব্দীর কথা,—চিত্রাঙ্গী বলে,—ক্ষেত্রায়ার পদ দেবদাসীদের মুখে মুখে ফিরত তখন। আজ সবাই ভুলে যাচ্ছে ঐ মধুর পদগুলি। আমরা কিছু-কিছু শিখে রেখেছি। কিন্তু যাদের কাছে পয়সার বদলে আমরা গান করতে যাই, তাদের মধ্যে বড়োরা শুনতে চায় ভজন, ছেলেরা সিনেমার গান। ক্ষেত্রায়ার কথা শুনতে চায় ক'জন?

—কেন এমন হয় বলতে পারো?

চিত্রাঙ্গী ওকে আরও অবাক্ ক'রে দিয়ে বলে,—আজকের দিনে এ মধুব ভাবের সাধন করে কয়জন? কয়জনই বা হৃদয় নিয়ে কারবার করে?

ক্রমশই ওকে অবাক্ করছে চিত্রাঙ্গী। শুধু রূপ নয়, গুণেরও আধার এই মেয়ে। খাটের কাছে ওকে টেনে নিয়ে আসে, বলে, —বোসো তুমি। কী খাবে? কফি খাবে? আমি কফি করতে জানি।

সোমনাথ মাথা নেড়ে জানায়—না, এই ত শেষ বেলায় 'ভোজন' শেষ করলাম।

—একটা পান খাও—বলে জলচৌকিতে রাখা শ্বেত পাথরের রেকাবি থেকে একটা সাজা পানের খিলি ওর মুখে পুরে দেয়। তারপর উঠে বসে খাটের ওপর, ওরই পাশে।

—ক্ষেত্রায়ার আরও পদ শুনবে?

চুড়ি-পরা সুডৌল হাতখানা তুলে নেয় নিজের হাতে সোমনাথ। বলে,—গাও।

'নীল মেঘ',—চিত্রাঙ্গী বলে,—মেঘ কখনো নীল হয়? ক্ষেত্রায়া বলেছেন,—কৃষ্ণের বিরহে গোপিকার সব-কিছুই নীল বলে ভ্রম হচ্ছিল। ঝড়ের কালো মেঘ ছুটে আসছে প্রবলবেগে, এখুনি দুর্যোগ আরম্ভ হবে। কিন্তু গোপিকার মনে জাগছে অন্যভাব। সে বলছে·····

এইটুকু কথকতার মতো টেনে-টেনে ব'লে তারপর চাপাকণ্ঠে সুরের গুঞ্জন তুলল চিত্রাঙ্গী। গানে গানে বলতে লাগল—ঐ ত তুমি আসছ, বিশাল রূপে, আমার সবকিছু চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে। বড়ো-বড়ো—এত বড়ো তুমি প্রিয়তম,—ক্ষুদ্র তুচ্ছ আমি যে তোমার ঐ সর্বব্যাপী রূপের মধ্যে ডুবে গেলাম—হারিয়ে গেলাম!

কাঁপা-কাঁপা গানের সুর ধীরে ধীরে থেমে গেল। সোমনাথের বামবাহু-মূলে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে চিত্রাঙ্গী; চুপি চুপি বলছে,—সত্যিই যে হারিয়ে গেলাম আমি!

কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল নীরবে! সোমনাথ বলে,—এ' কী করে হলো, বলতে পারো?

সোজা হ'য়ে উঠে বসলো মেয়েটি। সোমনাথের হাত দুটো ধরে আকর্ষণ করে বলল,—ক্ষেত্রায়ার পদ শোনো আরেকটা।

বলেই সুরে সুরে শুরু করে,—তোমাকে প্রথম দেখলাম সেদিন। দেখামাত্রই আমার এ কী হলো বলতে পারো? কাজে মন লাগে না, খালি ঘর-বার করছি, ভিতরটা থেকে থেকে হায়-হায় করছে! কখন তুমি আবার আসবে, কখন তোমাকে আবার দেখব! দেখে দেখে আশ মেটে না! কত লোককেই ত দেখি, কিন্তু তোমার মতন ত কেউ না! তুমি আমার মনের সমস্ত মালিন্যকে ধুইয়ে নিজেই করে নিচ্ছ নিজের স্থান। এই যে কাছে আছ তুমি, তোমার হাত আমার হাতে, তোমার মুখ আমার মুখে,—কিন্তু এ'ত আমার দেহ নয়, আমার

মনও নয়, এ' তোমার! আমার সব কিছু তোমাতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে!

স্নায়ুতে-স্নায়ুতে যেন একটা অশ্রুত রাগিণীর আলাপন! শুনতে শুনতে চিত্ত চলে যায় সব কিছু গ্লানির ঊর্ধ্বে, একটা পবিত্র মাধুর্য এসে মনকে ভরিয়ে দেয়। মেয়েটির উরু-উপাধানে মাথা রেখে এক সময় শুয়েই পড়ে সোমনাথ। তার শিরোদেশে সস্নেহে আঙুল চালনা করে চিত্রাঙ্গী, ঘুম-পাড়ানী সুরের মতো বলে,—তোমাকে প্রথমে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, যাকে খুঁজছি, তুমি সেই-ই!

—কিন্তু তারপর?

—তার পরের কথা পার্থসারথীই জানেন।—ব'লে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলে ওঠে,—ভালো কথা, জানো?

—কী?

—মাকে চিঠি লিখেছিলাম। উত্তব এসেছে, দেখবে?

—তুমি মুখেই বলো না!

চিত্রাঙ্গী বলে,—নদীর ধারে তুমি আমাকে নিয়ে গেলে, মাকে সব কথা লিখেছিলাম। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মা, কত লোককে ত জীবনে দেখলাম। কিন্তু ওকে একবার মাত্র দেখেই আমার এমন হলো কেন, ···মা লিখেছে, পার্থসারথীর দয়া। ওরই জন্য যে তুই এসেছিস্! বিশেষ মুহূর্তে তোদের দেখা হবে, সঙ্গে সঙ্গেই তোরা ত্বজনকে চিনে নিবি। ভালোই হলো মা চিত্রাঙ্গী। ভালবাসার সোপানে তুই প্রথম পা দিলি! মধু—মধু—মাধুর্যে তোর জীবন ভ'রে উঠুক!···

আবার পার হয়ে যায় নীরব কয়েকটি মুহূর্ত! চিত্রাঙ্গী আবার গুনগুন করতে থাকে হয়ত ক্ষেত্রায়ার কোনো পদ, ভাষা বোঝা যায় না, শুধু সুরের গুনগুনানি। নিমীলিত নয়ন, আচ্ছন্ন মন; সোমনাথের যেন মনে হয়, মধুলোভী এক ভ্রমর সদ্যফোটা ফুলের চারপাশে গুঞ্জন তুলে বেড়াচ্ছে! ক্রমশ গুঞ্জনও থেমে যায়, ব্যাকুল অধর ঢেউয়ের মতো ভেঙে পড়তে চায় প্রিয়তমের অধর-তটরেখায়!···

হঠাৎ শব্দ করে খুলে যায় বাইরের দরজার ভেজানো কবাট, সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় একটা তীক্ষ্ণ খিলখিল হাসি। ওরা দুজনেই অপ্রস্তুত হ'য়ে উঠে বসে তাড়াতাড়ি। কৌতুক হাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নাগমণি। চিত্রাঙ্গী উঠে গিয়ে মৃদু একটু ঠেলা দেয় হাস্যপরায়ণাকে, বলে,—দূর পোড়ামুখী!

বলেই ত্বরিৎ পায়ে চলে যায় ভিতরের দিকে। তেমনি হাসতে হাসতেই এগিয়ে আসে নাগমণি, বলে—পণ্ডিত, তোমাকে ভাল মানুষ বলে জানতাম, তোমার পেটে পেটে এত!

ভয়ানক অপ্রতিভ বোধ করে সোমনাথ। এই মুহূর্তে সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারলে বোধ হয় বাঁচত!

ওর অবস্থাটা বুঝল নাগমণি, হাসি থামিয়ে বলল,—তুমি বিশ্বাস করো, আমি খুব খুশী হয়েছি পণ্ডিত। আমার গুরুমার মেয়ে ব'লে বলছি না, চিত্রাঙ্গী ছোট থেকেই একটু অদ্ভুত ধরনের মেয়ে। গান গাইতে গাইতে কেঁদে আকুল হতো। জানো বোধ হয়, আমাদের মধ্যে একটা প্রথা আছে, নাচ শেখবার পর আমাদের জীবনের প্রথম নাচ নিবেদন করতে হয় মন্দিরে, দেবতার কাছে! পূজার পর যখন শুরু হলো ওর নাচ, ও' যেন নাচতে নাচতে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলল! নাচের শেষে মন্দিরের দেবমূর্তির পায়ের কাছে একেবারে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। গুরুমার চোখ জলে ভ'রে উঠেছিল আনন্দে। বলেছিল,—ও-ই সত্যিকার দেবদাসী। মানুষের মধ্যে ও' দেবতাকেই খুঁজে বেড়াবে,—একদিন পাবেও।

উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে সোমনাথ, বলল,—আমি এবার যাই?

—পণ্ডিত!—নাগমণি বলে—আমি ঠাট্টা করেছিলাম ব'লে রাগ করেছ?

—না।

—তবে?

—তবের উত্তর কী দেবো?—সোমনাথ বলে,—নিজেকে দেখে নিজেই আমি অবাক্ হয়ে গেছি!

—কেন, পণ্ডিত?

—এত পাওয়াও আমার ভাগ্যে ছিল!

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হেসে ওঠে নাগমণি। তারপরে বলে,—গুরুমার মেয়ে চিত্রাঙ্গী আমার বোন হলো না? তুমি হলে তাহলে আমার ভগ্নীপতি, কেমন?

বলেই হাতে তালি দিয়ে দিয়ে নাচের ভঙ্গিতে ছুলতে লাগল নাগমণি, গানের সুরে শুরু করল গ্রাম্য ছড়া:

"বোনের পতি ভগ্নীপতি।
কৃপা করো মা সরস্বতী।
সুরের সঙ্গে সুরের ঠাঁই,
আমার কিছু চিন্তা নাই!"

বাইরের দরজার কাছে সোমনাথ, ভিতরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো চিত্রাঙ্গী।

নাগমণি ওকে বলল,—ওখানে কেন? এদিকে আয়? একবার যুগল-রূপ দেখি ছুচোখ ভ'রে!

নীরবে একটা চড় তুলল চিত্রাঙ্গী। নাগমণি বলল,—চলো পণ্ডিত, বোন আমার চড় তুলেছে, আমরা পালাই।

বলেই আবার ভঙ্গিভরে শুরু করে সেই গ্রাম্য ছড়া:

"মন যে করে পালাই-পালাই
নিয়ে যাব সকল বালাই।"

—সত্যি অনেক রাত হয়েছে—নাগমণি বলে,—ওলো বোন, তোর বরকে চুরি করব না, ভয় নেই, একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। কূজনে-কূজনে কম রাত করেছ তোমরা! চলো পণ্ডিত, চলো। ভয় নেই রে বোন, আমি বলছি, আবার কাল আসবে'খন!

পথ সত্যিই নির্জন হয়ে গেছে। সোমনাথ বলে,—তুই মেয়ে-

মানুষ আমার সঙ্গে কতদূর আসবি? একা-একা ফিরবি কেমন ক'রে?

—আমার জন্য ভেবো না, আমার অভ্যাস আছে।

একটুক্ষণ চলবার পর নাগমণি বলে,—এখন কী মনে হচ্ছে, জানো পণ্ডিত? যেন সত্যি সত্যিই তুমি আপনার হয়েছ। এখন তুমি আমাদের।

সোমনাথ বলে,—তোদেরই ত। ওদিককার শেষ বাঁধনটিও কেটে গেছে—বাবা চলে গেছে।

—শুনেছি পণ্ডিত কোণ্ডার কাছ থেকে।

সোমনাথ বলে, কোণ্ডা তোকে আজ সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। এক হিন্দী বই। কিছু বুঝি না। মিছিমিছি কতগুলি পয়সা খরচ করল পাগলটা!

—ফিরে গেছে বাড়ি?

—হ্যাঁ।

সোমনাথ বলে,—তোর কাছে ও খুব আসে বুঝি? ধরা দিলি ত শেষ পর্যন্ত?

মুখ টিপে হাসে মেয়েটা, বলে,—অত সহজে ধরা দেবার মেয়ে আমি নই!

—তবে?

মুহূর্তে কেমন গম্ভীর হ'য়ে যায় মেয়েটা, বলে,—কোণ্ডা একটু অদ্ভুত ধরনের পুরুষ মানুষ, পণ্ডিত! এমনটি আর দেখিনি! আমাকে নিয়ে এত বেড়ায়, এত ঘোরে, ছুটোছুটি করে ছেলেমানুষের মতো, হয়ত রাস্তার মধ্যেই হাত ধরে টানে। তোমাকে বলতে বাধা নেই—ও' আমার সঙ্গটুকুই শুধু চায়, আর কিছু নয়। আমি দিন-দিন অবাক্ হচ্ছি, পণ্ডিত!

—বাঃ!

—আমারও তোমার মতো বলতে ইচ্ছা করে—বাঃ!...আমি যেন

ওর কাছে নেশার মতো। আমাকে পেলে ও' তাড়ির দিকেও যায় না, না পেলেই নেশায় মত্ত হবে!···কী জ্বালা বলো ত পণ্ডিত! পায়ে যেন আমার শিকল পড়ে গেছে—আমি কী এইখানে বাঁধা পড়ব বলে বাড়ি থেকে ছুটে এসেছি? চিত্রাঙ্গীর কাছে ভার হয়ে আর ক'দিন থাকব?

সোমনাথ বলে, মরেই গিয়েছিলাম, যেন নতুন জোয়ার এসেছে জীবনে। আমি কাজ খুঁজব, কাজ পেলে কোনই অসুবিধা হবে না তোদের।

একটু চুপ করে থেকে তারপরে হেসে ওঠে নাগমণি, বলে,—বুঝেছি কী বলতে চাও। কিন্তু তোমার দেওয়া টাকা ও নেবে বলছ? চেনো নি চিত্রাঙ্গীকে। তোমার টাকা নিলে ওর পক্ষে ভয়ানক লজ্জার ব্যাপার হবে, সেটা বোঝো?

সবিস্ময়ে সোমনাথ বলে,—কেন!

—তুমি ত অতিথি নও। তুমি ওর···

বাধা দিয়ে সোমনাথ বলে,—সেখানেই আমার জোর। বিয়ে করব আমি ওকে!

এবার বিস্ময়ের পালা নাগমণির, বলে,—কী বললে! বিয়ে করবে!

—হ্যাঁ।

নাগমণি বলে,—নাগাস্থব মেয়ে ছু'বার বিয়ে করে না জীবনে।

—কী বলছিস!

—হ্যাঁ, পণ্ডিত—নাগমণি বলে,—আমার মতো ত নয়, ওকে যে সব নিয়মই মানতে হয়েছে। দেবতার সঙ্গে ওর হয়েছে বিয়ে। গলায় ওর মঙ্গলসূত্র লক্ষ্য করোনি?

—সেত আমারও ছিল। উপবীত। আমি ছিঁড়ে ফেলেছি।

—মেয়ে হয়ে ওর পক্ষে ছিঁড়ে ফেলা কঠিন।

উত্তেজিত কণ্ঠে সোমনাথ বলে,—সংস্কার—সংস্কার! তোদের মধ্যেও সংস্কার ঢুকেছে!

পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে নাগমণি, বলে,—তাইত অতিষ্ঠ হয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছি পণ্ডিত। কিন্তু, আর না, আমি ফিরব। তুমি একাই যাও এবার, কেমন?

—আচ্ছা।

—কাল এসো কিন্তু।

সোমনাথ একটু থেমে বলে,—যা' বললি এর পরে যাব কোন্ অধিকাবে?

দুষ্টুমির হাসি হেসে নাগমণি বলে,—প্রেমের অধিকারে।

পথ চলতে থাকে সোমনাথ, চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে ভারবাহী শকটের মতো। কতো-কী এলোমেলো ভাবনার ঝড়। গলির মোড়ে পা দিতে দিতে একটা কথা মনে হয় তার। রক্তমাংসের জীবন্ত চিত্রাঙ্গী তাকে বাঁচিয়েছে পার্বতী-মার গল্পেব সেই অতীত চিত্রাঙ্গীর হাত থেকে! দীর্ঘকেশী মিষ্টি মেয়েটিকে মনে-মনে প্রণাম জানাতে ইচ্ছা করে সোমনাথের।

লছমীরা কী কবছে এখন কে জানে! লছমীর সঙ্গে দেখা হলে তাকে কী সে বলবে এই জীবন্ত চিত্রাঙ্গীর কাহিনী?

বাড়ির কাছাকাছি হতে না হতেই একটা কোলাহলের শব্দ তার কানে যায়। কী হলো আবার? লছমীদের উঠোনে আলো জ্বলছে এখনো। লণ্ঠনের সেই আলো ওদের খোলা দরজা দিয়ে এসে পড়েছে গলির ওপরে। কোণ্ডার ঘরের চৌখাটে ব'সে কোণ্ডা, আর তাদের উঠোনে লছমী। কথা কাটাকাটি চলেছে ওদের উচ্চকণ্ঠে। উঠোনের একপাশে খাটিয়ায় শুয়ে নিশ্চুপে চুট্টা টেনে চলেছে নোকন্না-সর্দার। সমস্তটা মিলে হাসিরই উদ্রেক করে সোমনাথের। বলে,—কী হচ্ছে রে, তোদের!

কোণ্ডা উঠে দাঁড়ায়, দুটো হাত আন্দোলিত ক'রে বলে,—জমানা বদল গেয়া পণ্ডিত! একটা টাকা নিয়েছিলাম ওর কাছ থেকে, এখন হিসাব চাইছে! দেখ ত পণ্ডিত, আমার হাতে একটাও পয়সা আছে আর?

লছমী চেঁচিয়ে বলে,—পণ্ডিতকে এর মধ্যে টানবি না বলে দিচ্ছি। বেচারী কতদিন পরে বাড়ি আসছে। অম্‌নি ওকে নালিশ!

—তা হোক—বলতে বলতে ওদের উঠানে ঢুকে পড়ে সোমনাথ, ওকে দেখেই তাড়াতাড়ি হাতের চুট্টাটা ফেলে উঠে বসে নোকন্না-সর্দার।

—উঠলে কেন সর্দার, শোও শোও।

কিন্তু কে শোনে ওর কথা, অমনি সংবর্ধনা শুরু হয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় কুশল-প্রশ্ন। লছমী বলে,—ও বাড়ি থেকেই আসছ ত?

—নারে, অনেক ঘুরেই আসছি।

—ঘুরে? কোথায় ঘুরতে গিয়েছিলে আবার?

একটু থেমে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে,—নাগমণির সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

নাগমণির কথায় চুপি চুপি ওদের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় কোণ্ডা। কোণ্ডার অবস্থা দেখে কলহ ভুলে হেসে ওঠে লছমী। বলে,—দেখ পণ্ডিত, নাগমণির গন্ধে গন্ধে আরেকজন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখ!

কোণ্ডা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হয় না। বলে,—হ্যাঁ, বয়ে গেছে আমার নাগমণির কথায়। কোথাকার কে নাগমণি তার ঠিক নেই। আমি এসেছিলাম একটু খাবার জল চাইতে।

হুংকার দিয়ে ব'লে ওঠে লছমী,—তবে এই যে বললি, আমাদের বাড়ির চৌখাটেও পা দিবি না?

তাচ্ছিল্যের সুরে কোণ্ডা বলে,—ও রাগের মাথায় অনেকেরই মুখ দিয়ে ও রকম বেরিয়ে পড়ে। জল দে, খাই।

একঘটি জল ওর সামনে রেখে লছমী বলে,—টাকাটার সব খরচা করে এলি ত ?

—আঃ ! আবার ঐ খরচের কথা !—কোণ্ডা বলে ওঠে,—আমার পয়সা আমি খরচ করব, তা'তে তোর কী !

—ইস, তোর পয়সা !

—আমার পয়সা নয় ? খাট্‌ছি না আমি ? বলো সর্দার বলো, আমার মেহনতের পয়সা নেই ? আমি চাই না ব'লে বুঝি ?

ঝড়ের বেগে ওর বাপের কাছে এগিয়ে আসে লছমী,—না বাবা, না, তুমি কোনো কথা বোলো না !

নোকন্না বলে শান্তকণ্ঠে,—যেতে দে বেটি, যেতে দে। যা শুয়ে পড়্ গিয়ে কোণ্ডা, পয়সার হিসাব কাল হবে।

—পয়সা নিয়ে ও কী করে বলতে পারো পণ্ডিত ? কতদিন ত তাড়ি খেয়ে এসেছে।

এই খববদার !—কোণ্ডা বলে,—আজ এসেছি তাড়ি খেয়ে ?

সোমনাথ হেসে ওঠে, বলে,—না, আমি জানি, আজ এসেছে সিনেমা দেখে।

—এই সর্বনাশ—ব'লে জিভ কেটে তাড়াতাড়ি পালাবার পথ পায় না কোণ্ডা। কোমরে হাত দিয়ে ভঙ্গী ভরে দাঁড়িয়ে থাকে লছমী, বলে,—তাই বলো, সিনেমা ! কিন্তু তা-ই বা একটা টাকা খরচ হবে কেন ?

কোণ্ডা ততক্ষণে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দোর দিয়েছে। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে উচ্চকণ্ঠে কৌতুক ক'রে সোমনাথ বলে,—নাগমণিকে সঙ্গে নিয়েই সিনেমায় গিয়েছিল যে।

কথাটা পরিহাসের সুরে বললেও শুনে যেন মুহূর্তে পাথরের মতো স্তব্ধ হ'য়ে যায় লছমী, তারপরে কাছে আসে সোমনাথের, ধীরকণ্ঠে বলে,—তা এ কথা আমার কাছে ও লুকোয় কেন পণ্ডিত ?

লঘুকণ্ঠেই সোমনাথ বলে,—ছেড়ে দে ওর কথা !

—আর সে কালামুখীই বা দূরে-দূরে থাকে কেন ?—লছমী বলে,—
—এসে উঠলেই পারে ওর ঘরে।

—তোরা সানাই-টানাই বাজিয়ে জাঁকজমক ক'রে ঘরে আনবি ত ?

—ব'য়ে গেছে আনতে।

ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল লছমী,—সোমনাথ ডেকে বলে,—এক গ্লাস জল দে ত লছমী ?

—জল ?

—হ্যাঁ। শুধু জল।

লছমী ঘরের সিঁড়ি থেকে দু'এক ধাপ নেমে আসে, বলে,—আজ তোমার বাবার শেষ কাজ ক'রে এলে, আজকের দিনে খাবে ত আমাদের ছোঁয়া জল !

—নিশ্চয়ই ! —সোমনাথ বলে,—আজ তোদের হাতের ভাতও খেতে পারি। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ থেকে আমি মুক্তি পেয়ে গেছি লছমী !

জল নিয়ে আস্তে আস্তে লছমী কাছে এসে দাঁড়ায় সোমনাথেব। জলটা পান করে সোমনাথ। একটা তীব্র ঔৎসুক্য নিয়েই ওর দিকে তাকিয়ে থাকে লছমী। ক্রমশই একটা ভাবান্তর সে লক্ষ্য করছে পণ্ডিতের মধ্যে। হ'লো কী ওর ?

—কী দেখছিস্ ?

—হঠাৎ এত বেপরোয়া হ'লে কেমন ক'রে, তাই ভাবছি।

হো-হো ক'রে উচ্চ হাসির লহর তোলে সোমনাথ। লছমী আরও অবাক্ হয়। এই চুপচাপ বিমর্ষ লোকটা হঠাৎ এত খুশীতে ঝলমল ক'রে উঠল কেন ?

গম্ভীর হয়ে জলের গেলাসটা নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায় লছমী। সেই যে সেদিন ওকে ব'লেছিল পণ্ডিত—'ভিতরটা এক-এক সময় হাহাকার ক'রে ওঠে রে, বড়ো একা আমি, বড়ো একা !'·· তা' ভাবতে গেলে সত্যিই একা ! ওর বাবা চলে গেলেন, সত্যিই ত কেউ রইল

না ওর! কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে একা ত ও' বহুদিন থেকেই—হঠাৎ কী হলো, এই একা-একা-থাকা ওর অসহ্য হয়ে উঠল কেমন করে!

বিছানায় এলিয়ে প'ড়ে আকাশপাতাল ভাবতে থাকে লছমী। পণ্ডিতের একটা বিয়ে দিলে কেমন হয়? মনে হতেই কথাটা বড়ো কৌতুককর লাগল লছমীর কাছে, একটু উত্তেজনাও জাগল। উঠে বসল তাড়াতাড়ি। টুকটুকে একটি বউ নিয়ে ঘরকন্না করছে পণ্ডিত, ভাবতেও কেমন যেন অদ্ভুত-অদ্ভুত লাগে, হাসিও পায়।

'আজ তোদের হাতে ভাতও খেতে পারি'—একথা হঠাৎ বলল কেন পণ্ডিত? তবে কী তাদের জাতের কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চায় পণ্ডিত? তবে কী ঐ কালামুখী নাগমণি? না, তা-ই বা হবে কেমন করে? সে হতভাগী ত ঐ বাউণ্ডুলে কোণ্ডাটার সঙ্গে সিনেমায় যায়, পাগলটার হাত ধ'রে ঘুরে বেড়ায়!

তবে? উত্তেজনায় একেবারে উঠে দাঁড়ায় লছমী। তবে কী মাধব রাও-কণ্ট্রাক্টরের অনুমানই সত্যি? দাওয়ার দিকে এগিয়ে যায়। তার বাবার সঙ্গে কী যেন আলোচনায় মগ্ন হয়ে আছে পণ্ডিত। তার সমস্ত শরীরটা যেন কাঁপতে থাকে, মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে। ফিরে এসে উপুড় হয়ে পড়ে বিছানায়। না-না, কেমন করে তা' হবে? পরক্ষণেই মনে হয়—হবে না-ই বা কেন? ঐ বাউণ্ডুলে কোণ্ডাটাকে সে তখন একবার দেখে নেবে, ওপরে কখনো সে আসতেই দেবে না তাকে! বলরে, বামুনের চৌখাট কখ্খনো পার হবি না হতভাগা! কিন্তু—এ'যে অসম্ভব। পণ্ডিত হাজারবার পৈতে ছিঁড়ে ফেললেও বামুনের ছেলে, সাপের বাচ্চা সাপ। পণ্ডিতের এটা ক্ষণিকের দুর্বলতা, এটা সে নিজেই বা হতে দেবে কেমন ক'রে?

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, তারপর মাদুর আর বালিশটা টেনে এনে দাওয়াতে পাতে। নোকন্না তখন বেশ উত্তেজিত কণ্ঠেই পণ্ডিতকে বলছে কী-সব কথা!—প্রকাশ রাও ডাইং-ক্লিনিং খুলেছে পণ্ডিত, আমাদের সব সেই দোকানের কাপড় নিয়েই কাচতে হবে।

—কেন ?

নোকন্না বলে,—তোমাকে ত বললাম, পণ্ডিত, আমি আর রজকদের কেউ নই, সে-ই এখন ওদের নেতা ! তার কথা না শুনে উপায় নেই !

নোকন্নার কথাবার্তায় প্রকাশ রাওয়ের ব্যাপারটা এতদিনে পরিষ্কার বুঝতে পারে সোমনাথ। কোন্ একটা ভালো রাজনীতির বইতে সে পড়েছিল, 'How a leader is formed overnight ! রাতারাতি নেতা তৈরী হয় কেমন করে ? প্রকাশ রাও তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সোডার ব্যাপার নিয়ে সে দরখাস্ত দিয়ে মিনতির পথে না গিয়ে এই সোজা সরল লোকগুলিকে একতাবদ্ধ ক'রে উত্তেজিত করে। এই সম্মিলিত উত্তেজনার পুরোভাগে থেকে সে আদায় করে সরকার থেকে সমস্ত সুবিধা। এদের নেতা-রূপে নজরে পড়ে সে সরকারের, নজরে পড়ে জনসাধারণের, নজরে পড়ে দৈনিক পত্র-পত্রিকার, নজরে পড়ে শহরের 'ডাইং-ক্লিনিং-সিণ্ডিকেটের, সর্বোপবি উজ্জ্বলতম হয়ে দেখা দেয় এই রজকমণ্ডলীব কাছে। বৃদ্ধ নোকন্না-সর্দার সর্দারিই ক'রে এসেছে, বোঝেনি ও রাজনীতির লীলা ! রাতাবাতিই ঘুচে যায় তার সর্দার-পদ, প্রকৃত সর্দার হয়ে দাঁড়ায় তরুণ প্রকাশ রাও-ম্যাট্রিক।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সোমনাথ বুঝতে পারে, প্রকাশ রাও এদের বেশ ভালরকমই জড়িয়ে নিয়েছে স্বার্থেব বন্ধনে। সিণ্ডিকেটকে না চটিয়ে সিণ্ডিকেটের সদস্যরূপে সে নিজেই খুলে ব'সেছে ডাইং-ক্লিনিং ! এ অঞ্চলের ডাইং-ক্লিনিংয়েব সব থেকে বড়ো অসুবিধা রজক-সম্প্রদায়। চিরাচরিত প্রথায় তাদেব সঙ্গে গৃহস্থের একটা আত্মীয়তা-বন্ধন গ'ড়ে ওঠে,—সেই 'মা-ঠাকৃরুণ' বলে ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো, তার মাধুর্য এদের মনকে এমন আপ্লুত ক'রে রাখে যে, বেশী পয়সার লোভেও সেটা তারা ত্যাগ করতে সহসা প্রস্তুত নয়।

কিন্তু গৃহস্থদের মনোভাবেরও পরিবর্তন আছে। বিজলী আলো, নতুন কোঠাবাড়ি, নতুন রাস্তা, নতুন গাড়ি, শহরের পরিবর্তনের সঙ্গে

সঙ্গে তাদেরও মন পরিবর্তনের স্রোতে আবর্তিত হতে থাকে। সহজ সরল গরিব এই লোকগুলি অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে নতুন ধরনের মানুষগুলির দিকে, চিনেও যেন চিনতে পারে না। নিদারুণ ব্যথা আর অবহেলা বুকটাকে ভেঙে দেয়, বাধ্য হয়েই নত মুখে তারা মেনে নেয় ডাইং-ক্লিনিং-এর শাসন।

প্রকাশ রাও সুচতুর করিতকর্মা ব্যবসায়ীর মতোই এ সুযোগটা নিয়েছে ওদের থেকে। সোডা? যত চাও সোডা নাও। কিন্তু এক শর্ত। এমনিই সোডা দেয়নি সরকার। ডাইং-ক্লিনিং-এর নাম করে পাওয়া গেছে সোডা। সেইজন্যই একটা 'ডাইং-ক্লিনিং' খুলতে হয়েছে প্রকাশ রাওকে। এর সমস্ত কাজ তোমাদের করতে হবে, এই শর্ত। ভয় নেই, সে নামমাত্র কর্মকর্তা,—আসলে এ রইল তোমাদের সম্পত্তি!

সমস্তটা শুনে সব-কিছু বুঝে নিদারুণ উত্তেজনায় উঠেই দাঁড়ায় সোমনাথ, দাঁতে-দাঁত চেপে বলে,—Traitor!

নোকন্না সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে,—কী বললে পণ্ডিত?

—বিশ্বাসঘাতক!

—কে?

সোমনাথ বলে, প্রবঞ্চক! তোমাদের ঐ প্রকাশ রাও। কাল ভোরেই আমি যাব ওর কাছে!

উঠে দাঁড়ায় বৃদ্ধ নোকন্না, আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় তার, বলে; —আমি তাকে দোষ দেই না পণ্ডিত। দোষ আমাদের। আমার লোকেরাই এর জন্য দায়ী! তুমি সকালে গোদাবরী তীরে যেও, কাজের সে ধারা আর দেখতে পাবে না। সবাই ডাইং-ক্লিনিং-এর কাজ করছে! কেন, সোডার জন্য যেমন একজোট হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলি, তেমনি পারলি না এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে!

একটু থেমে পরে নিজেই বলে,—আমি কিন্তু একা এখনো ঠিক আছি বেটীকে নিয়ে। কোণ্ডা আমার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়েছে পয়সা-

পয়সা ক'রে। ও' ত বলছে চলে যাবে কাল। যাক্ সবাই, আমি একাই থাকবো।

—এই ত চাই!

—না পণ্ডিত, বিষাদগ্রস্ত বৃদ্ধ বলতে থাকে,—বুড়ো বয়স, ভেঙেও পড়েছি। বড়ো কঠিন এ বয়সে এ ভাবে রুখে দাঁড়ানো! কাজের কথা বলছ? সোডা পাব কোথায়? সোডা দেবে কে? কালো-বাজারে সোডার যা চড়া দাম, তা' দিয়ে কাজ চলে না, গৃহস্থদের ঠকাতে হয়। সে আমি পারব না!

বৃদ্ধ একটু দম নিয়ে বলতে থাকে,—বড়ো দুঃখ হয় পণ্ডিত, দলটা আমার এ ভাবে ভেঙে গেল! সব হাতে ধ'রে ধ'রে এনে কাজে লাগিয়েছি একদিন! আজ আমাকে দেখে ওরা ফিরে চেয়ে একটা কথাও বলে না!

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার কথা বলে নোকন্যা,—কিন্তু প্রকাশ রাওয়ের দোষ দিও না পণ্ডিত। যে এ কয়দিনের মধ্যে এমন কাণ্ড ক'রে তুলতে পারে, সে মোটেই সাধারণ মানুষ নয়, আমার তো চোখে ধাঁধা লেগে গেছে!···জানতাম পণ্ডিত, এ দল যে ভাঙবে, আমি জানতাম। ভালই হ'লো যে চোখে দেখে যেতে পারলাম, ঠিক লোকের হাতেই এদের সর্দারি করবার ভার এসে পড়েছে! আমার কী পণ্ডিত? আমি এবারে জিরোবো। শুধু মেয়েটার একটা সুরাহা করতে পারলেই আমি নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। মনের মতো পাত্রের হাতে ওকে তুলে দিয়ে এই বুড়ো এবার ছুটি নেবে, পণ্ডিত!

নীরব হয়ে যায় বৃদ্ধ। নীরব হয়ে যায় সমস্ত পরিবেশ। নীরবেই নিজের ঘরে ফিরে আসে সোমনাথ।

বেশী রাত ক'রে শোবার দরুন ঘুম ভাঙতে একটু দেরিই হয়ে যায় সোমনাথের। তাড়াতাড়ি উঠে গোদাবরীতে স্নান সেরে সে চলে যায় শহরের দিকে প্রকাশ রাওয়ের কাছে।

টেবিলের ওপর একরাশ কাগজপত্র ছড়িয়ে রেখে এক মনে কাজ করছিল প্রকাশ রাও-ম্যাট্রিক। ওকে দেখে একটু চমকেও উঠল প্রকাশ। কিন্তু অভ্যর্থনার ঘটায় সে চমকটুকু তেমন বুঝতে দিলো না সোমনাথকে। সোমনাথ শুরু করল তার কথা, তার অভিযোগ। প্রকাশ হেসেই উড়িয়ে দিলো তার সমস্ত উত্তেজনা। হাতেব খবরের কাগজখানা দেখিয়ে বলে উঠল,—এদিকে আকাশে বৃষ্টি নেই, চাষী মাথায় হাত দিয়ে পড়েছে। একটা হাহাকার পড়ে গেছে অন্ধ্রদেশে,—এই দেখুন না কাগজ?

—কিন্তু আমার প্রশ্ন আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন না!

প্রকাশ গম্ভীর হয়ে গেল এবার, একটুক্ষণ থেমে বলল,—দেখুন, আমিও জাতে রজক, এটা সম্পূর্ণ আমাদের ব্যাপার, এর মধ্যে আপনার থাকা কী ভালো?

—ভালো। এদের এভাবে exploit করতে পারেন না আপনি।

—Exploitation থেকে ওদের বাঁচাচ্ছি মশাই,—প্রকাশ রাও বলল,—গৃহস্থদের কাছ থেকে এরা যা পেতো, তার থেকে এখানে বেশী পাবে। সব থেকে বড়ো কথা, একটা নিয়মের মধ্যে থাকবে। ফলটা কী হবে জানেন? ওদেরই আয় হবে বেশী। অর্থনৈতিক দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে সেটা লাভ নয়?

সোমনাথকে নীরবে লক্ষ্য ক'রে তার কাছে চেয়ারটা একটু এগিয়ে আনল প্রকাশ, বলল,—আপনাকে একটা জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই খেটে-খাওয়া রজকদের নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রেছেন, এদের ছোটলোক

ব'লে ভদ্ররা অবজ্ঞা করেন, নয় কী? কেন করে জানেন? ঐ দরজায় গিয়ে ভিখারীর মতো 'মা-ঠাক্‌রুন' বলে দাঁড়ানো। গৃহস্থ বলল,—একটু বসো বাপু, হাতজোড়া। দরজার কাছে মাটিতেই বসে পড়ল তথাকথিত ছোটলোকের ছেলে।

সোমনাথ বলে,—বুঝেছি কী বলতে চান। এরা গৃহস্থ-বাড়ী না গেলেই এরা status ফিরে পাবে, এই ত?

—Exactly!—প্রকাশ রাও বলে,—আলাদা থাকুক এরা ওদের সমাজের বাইরে। দেখবেন ক্রমে ক্রমে dignity of labour ফিরে আসবে।

—এইখানেই আপনার সঙ্গে আমার মতের অমিল—সোমনাথ বলে—আপনি যে উদাহরণ দিলেন, ঐ উদাহরণের উল্লেখ করেই আমি বলব,—ওর আরও একটি দিক্ আছে, যেটা আপনাদের চোখে পড়ছে না। সেটা আত্মীয়তার দিক্। Dignity of labour অন্য ভাবে ফিরে আসত।

—কী ভাবে?

—দেখছেন না তথাকথিত বুদ্ধিজীবী-সমাজ কী ভাবে ভেঙে গিয়ে ধীরে ধীরে শ্রমকেন্দ্রিক সমাজ গড়ে উঠছে! শ্রমের মর্যাদা আপনিই ফিরে আসবে, এবং দ্রুতই ফিরে আসবে।

উঠে দাঁড়ালো প্রকাশ রাও,—যাই বলুন, আপনার মতামত আমাকে appeal করছে না।

সোমনাথও উঠে দাঁড়ায়, বলে,—সেটা স্বাভাবিক। আপনার লক্ষ্য—রাজনীতি। আমার লক্ষ্য—মানবনীতি। মানুষ মানুষের কতো কাছে আসতে পারে, কী ভাবে আসতে পারে, আমি সেটাই ভাবতে চেষ্টা করি।

একটু হেসে প্রকাশ বলে,—ভাবুন।

সোমনাথ বলে,—নোকম্মার অবস্থা দেখেই বুঝলাম, রাজনীতির ঊর্ধ্বেও মানুষ আছে।

—থাকলেও এড়াতে শেষ পর্যন্ত সে পারবে না সোমনাথবাবু। কিন্তু থাক এ সব তর্কের ব্যাপার। বুঝতেই ত পারছেন, আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না।

—হয়ত পথেরও নয়।

—স্বাভাবিক,—প্রকাশ রাও বলে,—কিন্তু বন্ধুত্বের ছেদ পড়লে ব্যথা পাবো। আপনি নোকন্নার কথা ভাবছেন? আমি ভাবছি দ্বিগুণ। আমি ভোরবেলাতেই লোক পাঠিয়েছি তার কাছে। সে এই এসে পড়ল ব'লে। In fact আমি বাড়ি ব'সে তারই জন্য অপেক্ষা করছি। নইলে অনেক আগেই আমার দোকানে বেরিয়ে যাবার কথা।

একটু হেসে প্রকাশ আবার বলে,—কিছু ভাববেন না সোমনাথ বাবু, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। নোকন্না-সর্দারের জন্য ভাল ব্যবস্থাই আমি করে রেখেছি।

—কী রকম?

—আজ বলব না, বলব পরে। শিগ্‌গিরই জানতে পারবেন।

—কৌতূহলী হ'য়ে উঠছি যে মশাই।

প্রকাশ হেসে বলে,—কৌতূহলের জয় হোক। কিন্তু বন্ধু, মাঝে মাঝে আসবেন। আপনার জীবনকাহিনী আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছে।

পথে পা দিয়ে মনে মনে ওর কথাগুলি তোলপাড় ক'রে সোমনাথ আরেকবার অনুভব করল—A leader is born. এক নেতারই জন্ম হ'য়েছে। এই নেতৃত্বের দম্ভ থেকে ওকে নামানো যাবে না, কোন যুক্তি দিয়েই না। নোকন্না-সর্দারের সহজ হৃদয় এর নেই, এর আছে বুদ্ধি। হৃদয়বত্তার আশ্রয় থেকে ঐ রজকের দলটি গিয়ে পড়বে বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয়ে। কিন্তু আসবে কী কল্যাণ এই পথে? নোকন্নার বিশ্বাস আর আশাবাদের কথা ভাবতে ভাবতে একটা কথা আলোর ঝলকের মতো এসে পড়ে তার মনে—এমনও ত হ'তে পারে, ওদের

সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে করতে প্রকাশ রাওয়ের মধ্যে আসবে সত্যিকার কল্যাণ কামনা, কে বলতে পারে? ওদের জীবনের যে সারল্যভরা প্রাণপ্রাচুর্যময় উজ্জ্বল দিক্‌টা তার চোখে পড়েছে—সেটা প্রকাশের চোখেই বা একদিন না পড়বে কেন?

চিন্তাটা মনে আসতেই যেন পাথরের ভার নেমে যায় অন্তর থেকে। এতক্ষণে যেন সহজ বোধ করে সে। নদীর তীরে এসে বড়ো ভালো লেগে যায় সকাল বেলাটা। যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ে—একটা বড়ো পাথরের ওপর গোছা-করা কাপড় আছাড় দিচ্ছে একটি তরুণ, আর একটি তরুণী। সেই রকম লছমীদের মতো শাড়িটা আঁট করে মালকোঁচার ভঙ্গীতে পরা, সেইরকম বেণীভঙ্গী। কিন্তু দল নয়, মাত্র একটি তরুণ, আর একটি তরুণী। দৃশ্যটা চমৎকার লাগল সোমনাথের।

এইবার চমক দেবার পালা চিত্রাঙ্গীকে। ঐ ত সেই ঘব। ওকে এই সময় দেখে নিশ্চয় খুব অবাক্ হবে মেয়েটা। আর, নাগমণি তাকে ঠাট্টায় ক'রে তুলবে অস্থির। বন্ধ দুয়ারে পড়ল করাঘাত।

—কে?

সাড়া না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সোমনাথ।

—জ্বালাতন করিস না চন্দ্রা,—ভিতর থেকে ভেসে এলো চিত্রাঙ্গীর উচ্চ কণ্ঠস্বর—আমি এখন স্নান করছি।

কিছুক্ষণ পরে আবার করাঘাত করে সোমনাথ।

—কী মুশকিল, আসছি রে বাপু আসছি—দাঁড়া না একটু?

নাগমণি তাহলে বাড়ি নেই বোঝা যাচ্ছে, হয়ত কাছেপিঠে গেছে কোথাও। একটু পরে আবার করাঘাত করল সোমনাথ। না ক'রে উপায় ছিল না। পাশের দু'একটি ঘর থেকে দু'একটি মেয়ে দাওয়ায় বেরিয়ে এসে সকৌতুকে লক্ষ্য করছে।...

সশব্দে খুলে গেল দরজা। এই অতর্কিত আনন্দ-রস ভাষায় বোঝান সম্ভব নয়। স্থাণুর মত দরজার দু'দিকে হাত রেখে তেমনি

একভাবেই দাঁড়িয়ে রইল চিত্রাঙ্গী। তার হাত ঠেলে সোমনাথ ভিতরে এলো, তখনো যেন সংবিৎ ফিরে আসেনি মেয়ের! সেই দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশি একটা ভিজে কাপড়ে জড়ানো। স্নান ক'রে এসেছে সবে, অপূর্ব সেই সদ্য স্নান-করে-আসা-রূপ! জামা পরেনি এখনো, শুধু শাড়ির আঁচলটাই বক্ষ-সম্পদ আবরিত ক'রে রেখেছে। মুখখানা ভরে উঠল লালিমায়, দুর্জয় লজ্জায় তৎক্ষণাৎ ছুটে পালালো ভিতরের দিকে।

ফিরে এলো বেশ খানিকক্ষণ পরে,—সোমনাথ একটু হেসে বলল, —অসময়ে এসে পড়েছি, না?

মাথা নেড়ে জানালো,—না।

মুখে বলল,—কাল ঘুমোতে পারিনি সারারাত।

—কেন?

বাইরের দরজাটা বন্ধ করতে করতে ওর কাছে স'রে আসে মেয়েটা, একটু উচ্ছল ভঙ্গীতে বলে,—আজ আর বাড়ী যেও না, এইখানে থাকো, কেমন?

সোমনাথ বলে,—দূর, তা কী হয়?

অভিমানে স্ফুরিত অধর, ছেলেমানুষের ভঙ্গীতে মেয়েটি বলে,—কেন হয় না। শোনো, আমার হাতের রান্না খাবে ত?

প্রস্তাবটা অদ্ভুত মনে হয় সোমনাথের কাছে। একটা সংস্কার এসে ধাক্কা দেয়। কিন্তু কিসের দ্বিধা আর সংশয়! হাস্যকর! সোমনাথ হেসে বলে,—হাতের রান্না খেতে ত আপত্তি নেই, কিন্তু খাব কেন?

অবাক্ হ'য়ে মেয়েটি ওর চোখের দিকে তাকায়, বলে,—এ' কথা কী বলছ!

—ওর একটা হাত ধ'রে ওকে কাছে টেনে নেয় সোমনাথ, বলে,—আমি তোমার কে?—তারপরে ওর বুকের কাছে মঙ্গলসূত্রটা স্পর্শ করে বলে,—আমি ত পরপুরুষ।

এতক্ষণে হাসি ফুটে ওঠে চিত্রাঙ্গীর মুখে, বলে,—তুমি আমার পরপুরুষ। তারপরে একটু থেমে বলে,—শুনলাম চন্দ্রার কাছে, তুমি নাকি আমাকে বিয়ে করতে চাও ?

—চাই !

ঠোঁট টিপে হেসে ওঠে চিত্রাঙ্গী,—কয়বার বিয়ে করবে আমাকে ? এ মঙ্গলসূত্র যে তোমারই দেওয়া ! জানো না ?

অবাক্ হ'য়ে মেয়েটির দিকে তাকায়, বলে,—কী বলছ তুমি !

সোমনাথের হাত দুটো বুকের কাছে ধ'রে চিত্রাঙ্গী বলে,—শোনো। পাথরের দেবতার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয়, তার অর্থ কী ছিল জানো ? আমার যে মনের মানুষ—প্রাণের মানুষ, সে কবে আসবে জানা নেই,—জীবনে কোনদিন তাকে পাবো কিনা জানা নেই,—ঐ দেবতা, যে আসবে তার হ'য়ে আমাকে নিয়েছিলেন। আজ তুমি এসেছ,—দেবতার সেই পাথরে মূর্তির মধ্যে তোমার পড়েছে ছায়া। আমি জানি—তুমিই আমার স্বামী—তুমিই আমার সর্বস্ব।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে সোমনাথ, বলে,—এসব কথা তুমি জানলে কী ক'রে ? কে তোমাকে বলেছে ?

—আমার মন,—মেয়েটি বলে,—বিশ্বাস করো, নিজে নিজেই আমি সব বুঝতে পারি। যখন ভাবি, তখনই এই কথাগুলো মনে হয়।

একটা গভীর ভাব থমথম করতে থাকে ঘরের ভিতর, সেটা কাটাবার জন্যই যেন কথা বলে সোমনাথ। বলে,—আমি যে তোমার কাছে আসি, এ নিয়ে তোমাকে কেউ কিছু বলে না ?

—কে কী বলবে ! চিত্রাঙ্গী বলে,—আমার বন্ধুরা তোমায় দেখেছে, ঠাট্টা ক'রেছে আমার সঙ্গে। কিন্তু তার বেশী কিছু না।

একটু থেমে চিত্রাঙ্গী বলে,—বসো তুমি। খাবার ক'রে আনি।

—কেন ব্যস্ত হ'চ্ছো ?

হাসি-হাসি মুখে মাথাটা একটু হেলিয়ে চিত্রাঙ্গী বলে,—এমনি। নাগমণি কোথায় ?

—কে, চন্দ্রা? দেখলে না ঘাটে?

আশ্চর্য হ'য়ে সোমনাথ বলে,—ঘাটে!

—হ্যাঁ। কোণ্ডা ব'লে ছেলেটি সেই কখন ভোরে এসেছে। নদীতে কাপড় কাচছে দু'জনে।

—তবে কোণ্ডা আর নাগমণি? দূর থেকে বোঝা যায়নি। কিন্তু এটা কী হ'লো আবার!

চিত্রাঙ্গী বলে,—মুখপুড়ী ম'রেছে, বুঝছ না?

তারপরেই একটু হেসে সোমনাথের চোখে চোখ রেখে বলে,—আমারই মতন অবস্থা হয়েছে ওর! নইলে নাচ-গান-জানা মেয়ে ওসব পথে না গিয়ে ছেলেটাব সঙ্গে কাপড় কাচতে নামল!

—ব্যাপারটা কী, বলো ত?

—ব্যাপারটা আমাব মাথা আব মুণ্ডু—চিত্রাঙ্গী কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলে,—মুখপুড়ী আমাকে আর সহ্য করতে পারছিল না!

—যাঃ! এ কথা ঠিক নয়। তোমাকে সে······

—ভালবাসে, এই ত? চিত্রাঙ্গী বলে,—কিন্তু এই কী ভালবাসার ধরন? আমার কাছে ছিল, বলে কিনা, আমার ভার হ'য়ে আর কতদিন থাকবে?

—বটে!

এইবার হেসে ফেলে চিত্রাঙ্গী, বলে,—ছুঁড়ীর কিন্তু বুকের পাটা আছে। বাড়ি বাড়ি ঘুবে কাপড় কাচবার কাজ শুরু করেছে কিছু। একেবারে একা। আর জানো? আমাকে এসে বলে,—'এই তোর কাপড় দে, কেচে দি'। আমি ওব চুলের গোছা ধবে এমনি এক টান দিয়েছি যে আব আমাব কাছে কাপড় চাইতে আসবে না!

—তাহলে রজকের জীবিকাই গ্রহণ করল ওরা?

—ওরা মানে? কোণ্ডা নয়। কোণ্ডা আজ ওকে কাপড়-কাচা শেখাতে এসেছে মাত্র।

—বটে?

—হ্যাঁ। আর শোনো। তেজ ক'রে ঐ ওধারের বস্তিতে একা ঘর ভাড়া নিয়েছে, মাসে দু'টাকা ভাড়া।

—সে কী, তোমার কাছে থাকে না!

—না গো,—আজ থেকে এই ব্যবস্থা হ'য়েছে।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সোমনাথ বলে,—এর থেকে ওর চরিত্রের একটা দিক্ তোমার চোখে পড়ছে না?

স্নেহমণ্ডিত গদগদ কণ্ঠে চিত্রাঙ্গী উত্তর দেয়,—পড়ছে গো, পড়ছে। এ সাধনার ছবি চোখে পড়বে না!

—সাধনা?

চিত্রাঙ্গী ওর একেবারে পাশে এসে দাঁড়ালো, ওর বাহুমূলে দুটি হাত রেখে বলতে লাগল,—কী মনে হচ্ছে জানো? এ জগতের সবাই যেন সাধনা করছে। ভালবাসার সাধনা। নয় কী?

অপরূপ মাধুর্যে ভ'রে ওঠে সোমনাথের মন, বলে,—তুমি এত ভাবো?

—না-না, ভাবি না,—তুমি আমাকে ভাবাও। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছি, সেইদিনই যে আমার নবজন্ম হ'য়েছে।

একটু থেমে চিত্রাঙ্গী আবার বলে,—শোনো? কী হয় জানো? যখনই ভাবনার আর কূল পাই না, তখন মনে মনে তোমাকে ভাববার চেষ্টা করি। একটুক্ষণ পরেই দেখি তুমি এমনি ক'রে কাছে এসে দাঁড়িয়েছ,—আমাকে বলে যাচ্ছ, আমি যা জানতে চাই, সব!

বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে যায় সোমনাথ, অনেক চেষ্টার পর বলে,—নবজন্মের কথা বললে, নবজন্ম হ'য়েছে আমার। সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাকে সংশয়ে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল; জীবনে আশা করা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ আমার বুক ভরে উঠেছে,—মনে হচ্ছে, অনেক কাজ আমি করতে পারব, অনেক-কিছু আমারও করবার আছে!

—আছেই ত।

কণ্ঠে একটু জোর দিয়েই ক্ষোভের সঙ্গে সোমনাথ বলে,—কিন্তু কই করলাম ! পারছি কই !

স্নিগ্ধ দুটি চোখের দৃষ্টি ওর চোখে নিবদ্ধ রেখে চিত্রাঙ্গী বলে,—কাজ না ক'রে পুরুষ বসে থাকতে পারে না ।

কিন্তু, তুমি জানো ?—সোমনাথের কণ্ঠস্বর ক্ষোভে-দুঃখে উত্তেজিতই শোনায়,—বহুদিন ধরে আমি নিষ্কর্মা হ'য়ে বসে আছি !

—না,—চিত্রাঙ্গী বলে,—আমি তোমার কথা সব শুনেছি। পার্থসারথী তোমাকে দিয়ে খুব বড়ো কোনো কাজ করাবেন বলে তোমাকে তৈরি ক'রে নিচ্ছেন !

স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে ওর দুটি হাত হাতের মধ্যে টেনে নেয় সোমনাথ। বলে,—পুরোহিত-কূলে আমি জন্মেছিলাম, ছোট থেকেই ঠাকুর-দেবতা-মন্দির নিয়ে ব্যবসার চেহারাটা এমন প্রকটরূপে দেখেছি যে সমস্ত বিশ্বাস আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। আজ তোমাকে পেয়ে সেই বিশ্বাস ফিরে আস্‌ছে চিত্রাঙ্গী !

একটু থেমে আবার বলে,—চিত্রাঙ্গী ! আজ বাবার কথা, জেঠা-কাকাদের কথা, ছোট-মার কথা,—সবার কথাই মনে পড়ছে। ওদের প্রতি আর আমার ক্ষোভ নেই,—আজ আমি ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। ওরা ঠেলে না ফেললে তোমাকে পেতাম না এইভাবে। তোমার পার্থসারথী বোধহয় এইভাবেই তার কাজ করিয়ে নেন।

হাতে-ধরা সোমনাথের হাতদুটি নিজের ঈষৎ-আরক্ত কপোল দুটির ওপর ছুঁয়ে রাখে চিত্রাঙ্গী, বলে,—বলো ; বলো তোমার কথা ?

সোমনাথ বলে,—লছমীর কথা তোমাকে বলেছি ?

—তুমি না বললেও তোমার নাগমণি বলেছে। একদিন তাকে আমায় দেখাবে ? বড়ো দেখতে ইচ্ছা ক'রে।

সোমনাথ বলে,—আমার সেই লক্ষ্মী বোনটিকে তুমি দেখবে ? নিশ্চয় দেখাব। ও-ই আমার হাত ধ'রে নিয়ে আসে ওদের শ্রমজীবী

সমাজে। ওর জন্যই আমি সব দেখতে শিখি। ও না থাকলে নাগমণিকে দেখতে পেতাম না, নাগমণিকে কাছে না পেলে তোমাকে আমার পাওয়া হ'তো না, চিত্রাঙ্গী !···হয়ত এই পরমাশ্চর্য ঘটনা ঘটবে বলেই আমার জীবনে এসেছে আগেকার ঘটনাগুলো।

মৃদু মৃদু হাসতে থাকে চিত্রাঙ্গী, বলে,—আজ যেতে দেবো না, সারাদিন থাকতে হবে এখানে।

—লক্ষ্মীটি, আজ নয়, আজ আমি যাই। আমাকে আজ ওদের বড়ো দরকার।

সমস্ত উৎসাহ যেন মুহূর্তে নিভে আসে চিত্রাঙ্গীর, বলে,—খাবারটুকুও খেয়ে যাবে না ?

হেসে বলে সোমনাথ,—দাও গো অন্নপূর্ণা, ভিখারী শিবকে যা' দেবে দাও।

চিত্রাঙ্গী চলে যায় ভিতরে, নিয়ে আসে খাবার। সোমনাথের খাওয়ার মাঝখানে একবার ব'লে ওঠে,—আজকের দিনটা তোমাকে পেলে হ'তো !

—কী করতে ?

—কী করতাম ?—একটু ভেবে চিত্রাঙ্গী বলে,—সারাদিন গান শোনাতাম তোমাকে।

—সত্যি ?

—সত্যি।

সোমনাথ বলে,—তাহলে কাজ সেরে সন্ধ্যাবেলায় নিশ্চয়ই আসছি।

—ওমা, তুমি কী সন্ধ্যাবেলা না আসবার কথা ভাবছিলে নাকি ? আচ্ছা দুষ্টু ত ?

হেসে উঠল সোমনাথ, বলল,—আচ্ছা, এবার আসি তাহলে ?

পিছন থেকে ডেকে উঠল চিত্রাঙ্গী,—এই শোনো !

—কী ?

চিত্রাঙ্গী কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে,—তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি।

—বলো।

অদ্ভুত এক উৎকণ্ঠা মেয়েটির চোখে-মুখে, বলে,—হঠাৎ কী হয়েছে, সকাল থেকে মার কথা বারবার মনে পড়ছে। বড়ো অস্থির হ'য়ে উঠেছে মনটা! ভাবছি মার কাছে চলে যাব।

—কবে?

—কালই।—মেয়েটা ওর হাত দুটো ধ'রে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলতে থাকে,—ওগো, তুমিও চলো না আমার সঙ্গে! যাবে?

—না-না, আমি কেমন ক'রে······

বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে,—চলো না গো, তোমাকে দেখিয়ে আনি মাকে! দু'দিন থেকেই চলে আসব।

—যেতে তো লোভ হয়। কিন্তু······

—না-না, কিন্তু নয়, চলো ঘুরে আসি।

সোমনাথ বলে,—আচ্ছা, ভেবে দেখি। রাত্রে বলব, কেমন? এখন যাই!

দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে চিত্রাঙ্গী বলে,—কী রোদ উঠে গেছে! কষ্ট হবে না যেতে?

—ওরা যদি এই রোদে কাপড় কাচতে পারে, তাহলে আমিও পথ হাঁটতে পারব।

—সন্ধ্যায় আসবে কিন্তু।

—আচ্ছা গো, আচ্ছা।······

লছমী বোধহয় ওর অপেক্ষায়ই দাঁড়িয়েছিল ওদের নিজেদের বাড়িব দোরগোড়ায়। ওর কাছাকাছি এসে থেমে যায় সোমনাথ, জিজ্ঞাসা করে,—কী রে, এখানে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে?

—অনেকক্ষণ থেকেই দাঁড়িয়ে আছি।

—কাপড় নিয়ে যাস্‌নি নদীতে ?

—না। আজ ভাটি দেওয়া হবে না।

সোমনাথ তার বাড়ির সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় দেখে লছমী পিছন থেকে বলে,—আমি আসব পণ্ডিত ?

একটু আশ্চর্য হ'য়েই সোমনাথ বলে,—হঠাৎ এ সংকোচ কেন রে ? আয়।

নিজেদের বাড়ির দরজায় শিকল তুলে দিয়ে একটু পরেই ওর ঘরে আসে লছমী। কবাটে হেলান দিয়ে আগের মতই দাঁড়িয়ে থাকে, বলে,—তুমি রান্না চাপাও, আমি দেখি।

পরিহাস-তরল কণ্ঠে সোমনাথ বলে,—নাই বা চাপালাম, তুই ত রান্না চড়াস্‌ নি এখনো, না হয় আমার জন্য তুটো বেশী চাল নিস্‌। কী রে ?

গম্ভীর হ'য়ে ওর চোখের দিকে তাকায় লছমী, বলে,—পণ্ডিত ?

অভাবিত ওর এই গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে অবাক্‌ হয় সোমনাথ, বলে,—কী ?

—কী হ'য়েছে তোমার বলো ত ?

—কী হ'য়েছে !

—আমি ক'দিন থেকেই দেখছি।—লছমী বলে,—তুমি যেন অন্যরকম হ'য়ে গেছ !

—কী রকম ?

তেমনি গম্ভীরভাবেই লছমী বলে,—একটা কথা বলব ?

—বল্‌ না।

—রাগ করবে না ?

—কী আশ্চর্য, রাগ করব কেন।

লছমী মৃতুকণ্ঠে বলে,—তুমি এবার একটা বিয়ে করো পণ্ডিত।

হো-হো ক'রে হেসে ওঠে সোমনাথ, বলে,—বিয়ে? তা বেশ, কিন্তু কনে কই?

হাসির এ উচ্ছ্বাস কমে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে লছমী, স্থির-দৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে থাকে—তারপরে বলে, কনের অভাব কী? তোমাদের নিজের জাতের মধ্যে কতো সুন্দরী মেয়ে আছে।

সোমনাথ বলে,—আমি যে পতিত, তা' জানিস্?

—তার মানে!

—মানে অনেক। সে তুই বুঝবি না। আসল কথা, আমাদের জাতের কোন মেয়ে আমার গলায় মালা দেবে না।

বলেই আবার হেসে উঠল সোমনাথ। লছমী বলে একটু যেন তিরস্কারের ভঙ্গীতে,—কোন্ জাতের মেয়ে তা' হলে তোমার গলায় মালা দেবে শুনি?

—কে জানে!

কথাবার্তা এভাবে যতই এগোতে থাকে, ততই কেমন একটা যেন অজ্ঞাত শঙ্কায় ছরুছরু করে লছমীর বুকের ভেতরটা। কোনক্রমে বলে,—আমাদের জাতের মেয়ে বিয়ে করবে?

হো-হো করে হেসে উঠে তেমনি, পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলে সোমনাথ,—পাচ্ছি কই?

—তবে কী নাগমণিকে তুমি······

বাধা দিয়ে ত্রস্তকণ্ঠে বলে ওঠে সোমনাথ,—ছি-ছি, এসব কী বল্‌ছিস্ তুই!

চোখ বুজে মাথাটা কবাটে হেলিয়ে রেখে যেন পতন থেকে নিজেকে রক্ষা করে লছমী,—সবার সন্দেহই বুঝি সত্যি হয়! এর থেকে নাগমণিকে যদি ভালবেসে ফেলত পণ্ডিত, বোধহয় ভালো হ'তো।

এ কী নিদারুণ জ্বালা তার মনে! একটা অতর্কিত আনন্দও বটে, সঙ্গে সঙ্গে একটা অতর্কিত হাহাকারও। এক একবার মনে

হচ্ছে,—উপযুক্ত চাবুক হবে এটা ঐ বাউণ্ডুলে হতচ্ছাড়া কোণ্ডার পক্ষে! পরক্ষণেই আতঙ্কে শিউরে ওঠে মন, না-না, এ কী!

পণ্ডিত কি বুঝতে পারে তার মনের কথা? হাসির ঢেউ থেমে গিয়ে শান্ত হ'য়ে গেছে সমস্ত পরিবেশ, ধীরে ধীরে তার কাছে দাঁড়ায় পণ্ডিত, খুব কাছে। সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি দুটি চোখের। বেশীক্ষণ একভাবে চেয়ে থাকলে মনে হয়, অন্ধকারে দুটি প্রদীপ জ্বলছে যেন!

—লছমী?

অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দেয়,—কী?

—আমার জীবনে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটেছে রে! তোর হাত ধ'রে আমি এসেছিলাম আমাদের গণ্ডির বাইরে—যেন বনের মধ্যে পথ-হারানো এক পথিককে হাত ধ'রে তুই নিয়ে এলি এক রহস্যময় রাজপুরীর সামনে। রাজপুরীই ত, একদিন দেখা পেলাম সত্যিই ঘুমন্ত রাজকন্যার!

অবাক্ হয়ে শুনতে থাকে লছমী, সোমনাথ অনর্গল বলে যেতে থাকে চিত্রাঙ্গীর কথা। চিত্রাঙ্গীর নিবিড় ভালবাসার কথা!

শুনতে শুনতে একটা পাষাণের ভার যেমন একদিকে নেমে গেল লছমীর বুক থেকে, অন্যদিকে সোমনাথের উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য তার মনে একটা তীব্র ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলল,—কে এই নাগমণির বন্ধু নাগাস্থদের মেয়েটা, পণ্ডিতের মতো লোকের মনে ও তুলেছে এই অভূতপূর্ব আলোড়ন? দেখতেই হবে তাকে। সোমনাথের বাক্যস্রোতের মধ্যে একটা কথা কানে যেতেই একটু চম্‌কে উঠল লছমী, বাধা দিয়ে বলল,—কী বললে? কী বললে পণ্ডিত? মেয়েটি নাচিয়ে মেয়ে?

—হ্যাঁরে, নাচ-গানে তার অদ্ভুত দখল! ওটাই যে তার পেশা!

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে একটু হেসেই ওঠে লছমী, বলে,—আচ্ছা পণ্ডিত, মেয়েদের ব্যাপারে তোমরা পুরুষরা কি সবাই ছেলেমানুষ?

—এ কথা কেন?

—কেন নয়? নাগমণির ছলাকলায় কোণ্ডার মতো বাউণ্ডুলেটা ভুলতে পারে, তোমার মতো লেখাপড়া-জানা ধীর-বুদ্ধির পুরুষ এতে ভুলবে কেন?

—কী বল্‌ছিস্‌।

লছমী বলে,—ঠিকই বলছি। নাচিয়ে-মেয়েদের ছলাকলার কথা সারা অন্ধ্রদেশের সবাই জানে, শুধু জানো না তুমি? তুমি যে ছলনার জালে ধরা পড়েছ, এ আমার কয়েকদিন ধরেই সন্দেহ হচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে গম্ভীর মুখে সোমনাথ বলে,—ছলনা নয় বে, লছমী, ছলনা নয়। আমি জানি···

বাধা দিয়ে লছমী বলে ওঠে,—কিছু জানো না। মেয়েদের ব্যাপার তুমি কিছু বোঝো না। আজকেই আমাকে নিয়ে চলো সেখানে, আমি তাকে দেখব। না দেখে কিছুতেই স্বস্তি পাবো না।

—বেশ ত, চল্, সে-ও তোকে দেখতে চেয়েছে।

অবাক্ হ'য়ে লছমী বলে,—আমাকে! আমাব কথা জানল কী ক'রে? কী বলেছ?

—বলেছি, আমার শান্তশিষ্ট লছমী বোনটিকে তোমায় দেখাব।

নির্মল হাসির আভায় ভ'রে যায় লছমীর মুখ, বলে,—এই কথাটা কিন্তু বেশ বলেছ। আমার ভাই তুমি। আমার বামুন-ভাই।

বলেই হেসে উঠল লছমী, বলল,—বেশ শোনাচ্ছে কিন্তু। তোমাকে এবার থেকে এই নামেই ডাকব,—বামুন-ভাই—কেমন?

হেসে ফেলল সোমনাথও, বলল,—যা খুশি!

—বামুন-ভাইয়ের 'চাকলে' বোন, ভালই হ'লো! কিন্তু আমাদের কথা বাইরের লোক বুঝবে না। ওরা সব যা-তা বলবে।

—বলুক।

কৌতুক ঝিলিমিলিয়ে ওঠে লছমীর আয়তচোখের কোণে, বলে,—চিত্রাঙ্গী মেয়েটা আর যা-ই করুক, তোমার মধ্যে সাহস এনে দিয়েছে দেখছি। দেখ, নিয়ে যাবে ত আমাকে ওর কাছে আজ?

—যাব। নোকন্না কিছু বলবে না ত?

—না গো না, বাবা মানুষ চেনে। তোমার সঙ্গে কোথাও গেলে কিচ্ছু বলবে না।

—ভালই হবে! দেখা হবে নাগমণির সঙ্গে, কোণ্ডার সঙ্গে।

লছমী চট্ ক'রে ওর কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো, বলল,—ওদের কথা আর আমার কাছে বোলো না। আমি যাব চিত্রাঙ্গীকে দেখতে, ওদের নয়।

অভিমানী মেয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চ'লে যায়, তরতর করে নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো, তবুও নোকন্নার দেখা নেই। রীতিমত অস্থির হয়ে উঠল লছমী, একবার দরজায় এসে দাঁড়ায়, আবার ভিতরে চ'লে যায়। আজ এত দেরি করছে কেন ফিরতে তার বাপ? বাবা না ফিরলে সে কেমন ক'রে বেরিয়ে পড়বে সোমনাথের সঙ্গে? কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে আসবে বৃদ্ধ, সে না থাকলে খাবারটাই বা কে এগিয়ে দেবে সামনে, জলের ঘটিটাই বা কে হাতে তুলে দেবে?

নোকন্নার কথা ভেবে-ভেবে এক-একসময় বুকের ভিতরটা যেন বেদনায় টনটন করে ওঠে। এই লোকটা সবার কথা ভেবে-ভেবে মরে, এর কথা কেউ ভাবে না। এখানকার সমস্ত রজক-দলটি হাতে গড়া ওর, অথচ ওকে আজ আর কেউ চায় না। বৃদ্ধের করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে এই বেদনার গভীরতাকে সে নিবিড় ভাবেই অনুভব করে। তার জীবন দিয়েও যদি এর প্রতিকার করা যায়, ত, লছমী তাতে কখনো পিছিয়ে পড়বে না।

পণ্ডিতের জানালার কাছ থেকে রৌদ্র সরে গিয়ে ছায়া পড়েছে। এখনো-কী ঘুমিয়ে আছে পণ্ডিত? তার জাতের ছেলেদের মতো খাটিয়ে নয় সোমনাথ, বলিষ্ঠও নয়। ক্ষীণ দুর্বল ওর চেহারাটা, কিন্তু

মুখখানায় ভারি স্নিগ্ধ শান্ত একটা ভাব। তাদের ছেলেদের সঙ্গে ওর তফাতটা এইখানে। কথাও বলে কেমন ধীরে ধীরে, থেমে-থেমে। তাদের ছেলেদের মতো নয়। এইজন্যই ত ভালো লাগে তার বামুন-ভাইকে।

ভাই? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কেমন একটা কৌতুক জেগে ওঠে তার মনে। পণ্ডিতকে ভাই হিসাবে ভাবতেও ভালো লাগে, আবার সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস্য মনে হয় কথাটা। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই নিস্পৃহ সংযমী ছেলেটির মনেও দোলা দিতে পেরেছে একটি মেয়ে। এবং সেই মেয়েটি বামুন নয়, নাগাসুদের একটি সাধারণ নাচিয়ে মেয়ে। মনে মনে সূক্ষ্ম একটা যেন পরাজয়ের লজ্জা অনুভব করে লছমী। আর সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়ে সেই বাউণ্ডুলে আর পাগল বলিষ্ঠ-দেহ কোণ্ডাটাকে। ঐ লোকটাই যেন সব দিক্ দিয়ে সর্বনাশ করছে তার! রাগে এক-এক সময় মাথা ঠিক রাখা হয় মুশকিল। অথচ, যখন অনুনয়বিনয় ক'রে তার সামনে এসে দাঁড়ায় এটা-ওটা চেয়ে, তখন মুহূর্তে সমস্ত ক্রোধ কোথায় মিলিয়ে যায়! একটা অদ্ভুত স্নেহে আর মমতায় দ্রবীভূত হয়ে যায় মন!

সোমনাথের ঘরের কাছ থেকে রৌদ্র একেবারে সরে গেছে—কোথায় কোন বৃক্ষচূড়ে পাখিদল ফিরে এসে জটলা করছে,—পশ্চিম আকাশে জেগেছে রক্তিম আভা। এক আনার চাঁপাফুল কিনে খোঁপায় জড়িয়ে নেয় লছমী, লাল-লাল-ফুল তোলা ছাপা শাড়িটা ভালো করে গুছিয়ে পরে নেয়। প্রত্যেক দিন বিকেলে যখন পশ্চিম আকাশে অস্তরবির রশ্মিচ্ছটা জাগে, পাখিরা যখন কুলায় ফিরে শুরু করে সান্ধ্য কূজন—তখন নিজের দিকে স্বভাবতঃই মন পড়ে লছমীর। খোঁপার জন্য ফুলের দিকে চোখ যায়, তনুদেহের জন্য মনোমত শাড়ির, সুগঠিত দুটি ভ্রূর মাঝখানে গোল ক'রে টিপ পরবার জন্য কুঙ্কুমের।

পণ্ডিত কী এখনো ওঠেনি? চিত্রাঙ্গীর কাছে যাবার কথাটা ভুলে গেল নাকি ও? বাবা না এলে যাওয়া যাবে না কিন্তু। না হয় একটু দেরিই করল সোমনাথ—না হয় ওর যেতে দেরি দেখে একটু ছটফট করলইবা চিত্রাঙ্গী। মেয়েদের মাঝে মাঝে এরকম একটু দুঃখ দেওয়া ভালো। চিত্রাঙ্গীর ঘর-বার করবার ছবিটা কল্পনা ক'রে কৌতুকে হেসেই ওঠে লছমী, তারপরে এগিয়ে যায় সোমনাথের বাসার দিকে। সিঁড়ি দিয়ে লঘু পায়ে উঠে যায়। নিচের দরজার কাছে সেই মাধব রাও কন্ট্রাক্টরটা কেমন বিশ্রীভাবে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

ছাদে উঠে দরজার দিকটা লক্ষ্য করেই চম্‌কে ওঠে লছমী। সেদিনকার সেই প্রৌঢ়া মহিলা বসে আছে দরজার কাছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সোমনাথ, বলে,—এই যে লছমী! নোকন্না ফিরেছে?

—না।

—আমি পার্বতী-মার সঙ্গে ও বাড়ি যাচ্ছি, একটুক্ষণ পরেই ফিরে আসব।

প্রৌঢ়াকে দেখেই একটা আশঙ্কা ধক ক'রে জেগে ওঠে লছমীর মনে, আবার কিছু হয়নি ত? ব'লে ওঠে,—কী হয়েছে পণ্ডিত?

সোমনাথ একটু হেসে বলে,—কিছু হয়নি। এমনিই যাচ্ছি। আমার এক ছোট-মা আছে জানিস্? সে ডেকে পাঠিয়েছে। তাই যাচ্ছি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পার্বতী-মা লছমীর হাত ধ'রে একটু চাপ দেয়, ফিসফিসিয়ে বলে,—আমি কি কেবল খারাপ খবর আনি রে। ভালো খবরও নিয়ে আসি। কৃষ্ণবেণীকে দেখেছিস্? দেখিস্ নি। অল্প বয়স, কিন্তু খু-ব শক্ত মেয়ে।

বিড়বিড় করতে করতে সোমনাথের পাশাপাশি নদী-তীরের পথটির দিকে এগিয়ে যায় পার্বতী-মা। কিন্তু যাই ওরা বলুক লছমীর

মন কিন্তু 'কু' গাইছে। কেবলি ওর মনে হচ্ছে, কী যেন একটা ঘটবে শিগ্‌গিরই!·· একটা অব্যক্ত কান্না যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে ওর বুকের ভিতর থেকে। ওর বাপই বা আসছে না কেন এখনো?

গোদাবরীর জলে তখনো ঝিকমিক করছে দিনান্তের শেষ আভা, তখনো বৃক্ষচূড়াকে কেন্দ্র ক'রে চক্রাকারে উড়ছে নীড় সন্ধানী কয়েকটি পাখি, কোটিলিঙ্গম্ শিবের মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং!

নদীর তীর ধ'রে যেতে যেতে হঠাৎ অদ্ভুত এক চিন্তার উদয় হলো সোমনাথের মনে। আজকের চর-ওঠা ক্ষীণ নদীটি যদি কোথাও কিছু নেই অকস্মাৎ জলে ভরে উঠে যদি হঠাৎ-ই ডুবিয়ে দিয়ে যায় এই জনপদ, ভাসিয়ে নিয়ে যায় সমস্ত গ্লানি আর পাপের চিহ্নগুলি, ভেঙে দিয়ে যায় ঐ দীর্ঘ সেতুর লৌহ-বন্ধন! কেমন হয় তবে?

চেট্টির দল হাহাকার করবে মাটির নিচের গোপন ঘরে রাখা রাশিরাশি চালের জন্য, আর সঞ্চয়ী কাষ্ঠ ব্যবসায়ীরা কপালে করাঘাত করবে করাত দিয়ে কেটে রাখা ঐ কাঠের স্তূপের শোকে।

পার্বতী-মা কোটিলিঙ্গম্ শিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে একসময় ওকে জিজ্ঞাসা করে—ভাবছিস্ কী সোমনাথ?

—কী আবার! কিছুই না।

—কী হলো জানিস্?—পার্বতী-মা ব'লতে থাকে,—যে কোনদিন ঘর ছেড়ে বেরোয় না, সেই কৃষ্ণবেণী একেবারে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার বাড়ি গিয়ে হাজির। বলল,—পার্বতী-মা, একবার সোমনাথকে তুমি ডেকে আনতে পারো?—ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, —কী হয়েছে, কৃষ্ণবেণী? ছুটতে ছুটতে এলে কেন?—বললে, না-ই বা শুনলে? ওকে এখ্‌খুনি ডেকে আনো আমার বাসায়। আর না যদি আনতে পারো আমি নিজেই যাবো! আমি বললাম, না, না; তা

কী হয়! আমিই যাচ্ছি! ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওর বাড়িতে বসিয়ে রেখে আমি ছুটে এলাম তোকে ডাকতে!

সোমনাথ ব'লে,—আমাকে কেন ডাকাডাকি, পার্বতী-মা? আমি ওদের কে? আমি ত ওদের থেকে অনেক দূরেই আছি!

একটু হাসে পার্বতী-মা। বলে,—দূরে থেকেও অনেক সময় কাছাকাছি থাকা হয় রে, আমি নিজেই জানি। শোন্ তোকে সেই গল্পটা বলি। সেই যে, চিত্রাঙ্গীর গল্প। 'চিত্রাঙ্গী' নামটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর বুকটা হঠাৎ কেমন ঢিপঢিপ ক'রে ওঠে, সোমনাথ বলে,—ও পুরানো গল্প আর শুনে কী হবে?

—তবু শোন্। প্রৌঢ়া বলতে থাকে,—কুমার শারঙ্গধরকে বাগান থেকে নিজের মহলায় নিয়ে এলো চিত্রাঙ্গী। ফিসফিসিয়ে কী বলল, জানিস্? বলল,—তোমার সঙ্গেই বিয়ে হবার কথা ছিল আমার। বুড়ো রাজা তোমার জন্যে আমাকে পছন্দ করতে গিয়ে নিজেই আত্মহারা হয়ে গেলেন!···চিত্রাঙ্গী কুমারের হাত দুটি ধরে বললে,—সে কী আমার দোষ! ভাট নিয়ে এসেছিল তোমার ছবি। তোমার ছবিই দেখতুম বার বার, দেখে দেখে আশ মিটত না, জানতুম, তুমিই আমার স্বামী, আমার সর্বস্ব!···ও কী সোমনাথ, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?

সোমনাথ সত্যিই দাঁড়িয়ে পড়েছে শানবাঁধানো বুড়ো অশ্বত্থ গাছটার সামনে। বললে,—আমাকে কেন ডেকেছে জানো, পার্বতী-মা?

পার্বতী-মা একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারপরে বলে,—সে তার কাছ থেকেই শুন্‌বি। আমি কী ক'রে জানবো বল্?

আবার চলতে থাকে ওরা। পার্বতী-মা বলে,—কিন্তু চিত্রাঙ্গী টলাতে পারল না রাজকুমার শারঙ্গধরকে। যাকে বলে প্রত্যাখ্যান, তা-ই ঘটল।

'সোমনাথ বলে,—রাজকুমার কী বলেছিল, জানো পার্বতী-মা?

—হ্যাঁ, জানি। বলেছিল,—তুমি আমার মা!

—তারপর?

একটু যেন উত্তেজিত শোনায় পার্বতী-মার কণ্ঠস্বর। বলে,—কিন্তু যে মেয়ে তখনো 'মা' হয়নি, সে ওর মুখের ঐ মা ডাকা, তাতে সে ভুলবে কেন? যাকে সে মনে মনে চেয়ে এসেছে, ঐ ত সেই শারঙ্গধর,—তার সামনে দাঁড়িয়ে! বুড়ো রাজায় কেন মন উঠবে তরুণী চিত্রাঙ্গীর? তার তরুণ বয়সের সাধ আহ্লাদ কেন পূরণ হবে ঐ বুড়ো রাজাকে দিয়ে? শারঙ্গধরের প্রত্যাখ্যানে যেন ক্ষেপে গেল ঐ মেয়ে!

—আচ্ছা, পার্বতী-মা?

—কী?

সোমনাথ বলে,—ও অবস্থায় পড়লে সব মেয়েই কি ক্ষেপে যায় ঐ রকম?

—কী জানি বাবা! পার্বতী-মা একটু থেমে তারপরে বলতে থাকে,—মেয়েদের অন্তরেব কথাটা যদি ভালোরকম বুঝতে পারতিস্ তোরা! কত ঢেউ উঠে আবার মিলিয়ে যায়,—বাইরের কেউ তা' জানতেও পারে না! বুক ফেটে যায়, তবু মেয়েবা কথা বলে না! জানিস্ সোমনাথ,—এক একটা মেয়ে আছে যাদের দেখে বাইরে থেকে কখনই বুঝতে পারবি না যে তার ভেতবে কী প্রচণ্ড ঝড় চলেছে!

এতক্ষণে ঘাটের পথ ছেড়ে তাদের বাড়ির দিকের সেই গলিপথে পা দিয়েছে ওরা দু'জনে। পার্বতী-মা বলতে থাকে,—কিন্তু চিত্রাঙ্গী সহ্য করতে পারল না শারঙ্গধরের এ কঠিন ব্যবহার। কাঁদতে কাঁদতে বুড়ো রাজার পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল। রাজা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কী হ'য়েছে রাণী? রাণীর কী মাথার তখন ঠিক ছিল? তার সারা শরীরে আর মনে যেন দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে! সে রাজাকে কী বলল জানিস্? বলল,—কুমার তাকে অপমান ক'রেছে! তাকে একা পেয়ে···জোর করে···

হঠাৎ-ই থেমে যায় পার্বতী-মা। সোমনাথ বলে,—এর পরের টুকু তোমার না বললেও চলবে। রাজমহেন্দ্রীর প্রতিটি লোক এর পরের ঘটনাটুকু জানে।

পার্বতী-মা বলে,—তবু শোন্। আর ত এসে পড়েছি; আমি সংক্ষেপেই বলব।

বলতে গিয়েও থেমে যায় পার্বতী-মা। সামনের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ্য করে, তারপরে বলে,—হ্যাঁ রে, সোমনাথ, ভালো ক'রে দেখ্ ত, তোদের বাড়ির দাওয়ায় ও' কোন্ লোকটা উবু হয়ে ব'সে আছে?

আমাদের বাড়ি! আমাদের বাড়ির দরজা ত বন্ধ!

—না-না, তোদের নিজেদের বাড়ি নয়। তোদের বাড়ির পাশে ঐ যে তোদের জ্ঞাতিদের বাড়ির দাওয়ায়—

সোমনাথ সেইদিকে তাকিয়ে বলে,—ও-তো আমাদের সেই জেঠার ছেলে—রামেশ্বর! ঘাটে যাত্রী ধরে বেড়ায়!

—রামেশ্বর বুঝি! পার্বতী-মা বলে,—চোখ খারাপ, দূর থেকে লোক চিনতে পারি না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। মহারাজ ত সব শুনে একেবারে ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে কুমারের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করতে গেলেন। রানী কেঁদে বলে,—না মহারাজ মেরে ফেলবেন না, শত হলেও আপনার ছেলে, ওকে বন্দী করে রাখুন। তা অনেক বছর ধ'রেই ওকে বন্দী করে রেখেছিলেন মহারাজ। কুমার শেষে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার আগে রাজাকে একদিন বলে যায় সব ঘটনা। রাজা শেষে সব বুঝতে পেরে পাপিষ্ঠাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে মেরে ফেলেন।

ততক্ষণে ওদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছে ওরা।

সোমনাথ দাঁড়িয়ে পড়ে, বলে,—শেষটুকু আমার সঙ্গে মিলল না পার্বতী-মা। আমি শুনেছিলাম অন্য রকম। শারঙ্গধারা বলে যে জায়গাটাকে লোকে এখন দেখায়, সেখানে অন্ধকার একটা ঘরে

কুমারের দুটি হাত কেটে তাকে ফেলে রাখা হয়েছিল। বন্ধু নেই—বান্ধব নেই—নির্জন সেই ঘর! নির্জীবের মতো পড়ে থাকে কুমার। হাতের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আর্তনাদ করে,—কিন্তু কেউ আসে না, কেউ এসে দেয় না তার মুখে এক ফোঁটা জলও। ধীরে ধীরে নীরব হয়ে আসে কুমার, মনে আসে বিরাট পরিবর্তন, মানুষের ওপরে বিশ্বাস তার একেবারেই শিথিল হয়ে যায়। এমন দিনে যখন তার সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে প্রাণটা কণ্ঠের কাছে এসে ধুকধুক করছে, হঠাৎ স্বপ্নের মতো এসে আবির্ভূতা হন স্বর্গের এক করুণাময়ী দেবী! পার্বতী-মা, সে জ্যোতির্ময়ী দেবীর করুণার কী তুলনা আছে! মৃতদেহে ফিরে আসে প্রাণ, দৃষ্টিহীন চোখে ফিরে আসে দৃষ্টি, নির্জীব কণ্ঠে ফিরে আসে ভাষা। অবাক্ কাণ্ড, কাটা হাত আবার জোড়া লাগে, দেবী তাকে নিয়ে আসেন বন্ধ ঘরের বাইরে! না, ঘর থেকে ঘরে অবশ্য সে ফিরে যায় না, চলে যায় অরণ্যে—সন্ন্যাসী হয়ে।

ঠিক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গল্পটা বলছিল সোমনাথ,—হঠাৎ বন্ধ দরজায় বেজে ওঠে খিল খোলার শব্দ। কৃষ্ণবেণী দু'হাতে দুটো খোলা কবাট ধবে দাঁড়িয়ে যেন শুনতে চেষ্টা করে ওদের গল্প, কিন্তু সোমনাথের কথা ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। সে কৃষ্ণবেণীর দিকে মুখ তুলে একবার তাকিয়েই পরক্ষণে চোখ নামায়। জ্ঞাতিদের দাওয়া থেকে সেই ওর জেঠার ছেলে ওরই বয়সী রামেশ্বর মুখ বাড়িয়ে ওদের সব-কিছু লক্ষ্য করতে থাকে।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যায় একটা অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে। কৃষ্ণবেণী, সোমনাথ, পার্বতী-মা আর অদূরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে-থাকা রামেশ্বর—সব মিলিয়ে মনে হয়, নিস্পন্দ-প্রাণ কয়েকটি পুত্তলিকা যেন দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে!

কিন্তু কিছুক্ষণ মাত্র। নীরবতা ভঙ্গ করে কৃষ্ণবেণীই প্রথম।

চোখ দুটি তার অস্বাভাবিক দীপ্ত, কণ্ঠে কেমন-যেন উত্তেজনা, বলে,—ভিতরে এসো।

কে আগে ভিতরের দিকে যাবে, সোমনাথ, না পার্বতী-মা, এটা ভাবতে গিয়ে পা বাড়িয়েও আবার থেমে যায় সোমনাথ। কৃষ্ণবেণীর চোখে সেই দৃষ্টি, সোমনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে,—আমি তোমাকেই বলছি। ভিতরে এসো।

যন্ত্র-চালিতের মতো ভিতরে চ'লে আসে সোমনাথ দরজা পার হ'য়ে। কবাট দুটো দু'হাতে ধ'রে ভেজিয়ে দিতে দিতে পার্বতী-মার দিকে তাকায় কৃষ্ণবেণী, বলে,—তুমি বাড়ি যাও পার্বতী-মা, দরকার পড়লে তোমাকে ডাকব।

বলতে-বলতেই দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয় কৃষ্ণবেণী, খিলটা ভালো ক'রে এঁটে উঠোন পার হ'য়ে চ'লে আসে ঘরের মধ্যে, একটা জলচৌকি এগিয়ে দিয়ে বলে,—ব'সো।

কিন্তু কোথায় সোমনাথ? সে সেই বন্ধ দরজাব কাছে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে তখনো। ত্বরিত পায়ে আবার তার দিকে এগিয়ে যায় কৃষ্ণবেণী, বলে,—ঘরের ভিতরে আসতে তুমি যে সংকোচ করবে, এ' আমি জানি। কিন্তু তবু তোমাকে আসতে হবে। এসো।

মুখ নিচু ক'রে পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে ঘরে এসে ঢোকে সোমনাথ। বাবার সেই ঘরখানা। ভালো ক'রে মুখ তুলে তাকায় না, তবু ওরই মধ্যে চোখে পড়ে বাবার সেই কাঠের হাত বাক্সটা,—যাতে বাবা রাখত তার টাকা-পয়সা সব। বারবার মিলিয়ে দেখত, আর সঙ্গে সঙ্গে চাবি দিয়ে দিতো, সোমনাথের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকতো সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে।

—বোসো ঐ জলচৌকিটার ওপরে।

বসে সোমনাথ, আর কৃষ্ণবেণী হাঁটুমুড়ে বসে মেঝের ওপরে,—ওর কাছ থেকে সামান্য একটু দূরে। পরনে সাদা একটা শাড়ি,

গায়ে কোনো অলংকার নেই, হাত দুটো খালি, কানে দুল নেই, নাসিকায় নেই পাথরের ফুল, গলাতে নেই হার। তবু বেমানান লাগে না কৃষ্ণবেণীকে একটুও। তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য-সৌষ্ঠব আর কমনীয়তাই তার অঙ্গে অপরূপ অলংকার হয়ে বিরাজ করছে মনে হ'লো যেন!

একটা হাতের ওপর ভর রেখে, দেহটা একটু হেলিয়ে বসেছে কৃষ্ণবেণী, অপর হাতটা কোলের ওপরে,—আর পিঠ ভরে নেমেছে খোলা চুলের রাশি, বলল,—আমার কথা একটুও কী ভাবো?

সোমনাথ একবার মুখ তুলে তাকিয়ে পরক্ষণেই নিচু করল মুখ, কোনো উত্তর দিলো না। কৃষ্ণবেণীর চোখে তখনো সেই জ্বালাময়ী দৃষ্টি, বলল,—ভাবো না তা-ও আমি জানি। কিন্তু এবার ভাবতে হবে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার শুরু করে কৃষ্ণবেণী,—আমার মেয়েটা চ'লে গেল, তোমার বাবাও চ'লে গেলেন, এবার আমাকে দেখবে কে?

সোমনাথ তখনো কোনো কথা বলে না। কৃষ্ণবেণী উত্তেজিত কণ্ঠেই বলে ওঠে,—উত্তর দাও? তুমি চুপ ক'রে থাকবে, আর আমি একের পর এক প্রশ্ন ক'রে যাব, এই জন্যই কি তোমাকে ডেকে আনলাম?—

—কী বলবো?

কৃষ্ণবেণী বলে ওঠে,—বলার অনেক আছে। বলতে পারো, বাপের বাড়ি চলে যাও। আমি বলব, সে উপায় থাকলে এ' পাপপুরীতে একমুহূর্তও ব'সে থাকতাম না।

—পাপপুরী!

—তা' ছাড়া কী!—কৃষ্ণবেণী বলতে থাকে,—সদ্য বিধবা আমি, আমার কাছে কুপ্রস্তাব নিয়ে আসে তোমাদেরই জ্ঞাতি!

উঠে দাঁড়ায় সোমনাথ, বলে,—বলছ কী তুমি!

কৃষ্ণবেণী ব'লে,—উঠো না, বোসো। অনেক কথাই তোমাকে শুনতে হবে।

বসে পড়ে সোমনাথ, বলে,—তুমি তার নাম বলো। আমি দেখছি কতো বড়ো সে শয়তান, যে তোমাকে অপমান করতে সাহস করে!

অদ্ভুতভাবে মুখ টিপে এবার হাসে কৃষ্ণবেণী, বলে,—যাক্, তবু তোমার কথায় একটু ভরসা পাওয়া গেল। শয়তানকে যে তুমি দেখতে চেয়েছ, এতেই আমি বুঝলুম, বিপদে পড়লে দেখবার লোক অন্ততঃ একজন আমার রইল।

সোমনাথ বলে,—আমি আজ অবশ্য তোমাদের কেউ নই, কিন্তু তবু অন্যায়ের প্রতিকার করতে পিছিয়ে যাব না, এটা তুমি জানবে।

—অন্যায়!—কৃষ্ণবেণী আবার তেমনি বাঁকা হাসে,—ক'টা অন্যায়ের প্রতিকার তুমি করবে? বিধবার কাছে কুপ্রস্তাব,—এটা শুনে তুমিই চটে উঠলে, নইলে এ' নিয়ে এখানে কারুরই মাথাব্যথা নেই!

—সে কী!

ওর চোখের দিকে তাকায় কৃষ্ণবেণী, বলে,—কিছুই জানো না তুমি। আমার বাপের বাড়ির দিকেও দেখেছি, এখানেও দেখলাম,—সব জায়গাতেই সমান অবস্থা! কথাটা কেউ বলে না, বললে খারাপ শোনায়, অল্পবয়সী বিধবাদের পক্ষে সত্যিই মাথা ঠিক রাখা শক্ত।

সোমনাথ বলে,—কে তোমাকে অপমান করেছে, তার নামটা বলো।

—নাইবা শুনলে নাম। এখানে ঠগ্ বাছতে গাঁ উজার হ'য়ে যাবে। তুমি কি নিজে জানো না তোমার জ্ঞাতিদের কথা? তুমি একা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না।

—তবে?

কৃষ্ণবেণী বলে,—যেতে পারি আমি বাপের বাড়ি, কিন্তু বাপ নেই, ভাইয়ের সংসারে দাসীবৃত্তি ক'রে দিন কাটাতে হবে। শুধু কি তাই?

সেখানেও শয়তান লোকের অভাব নেই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, আমার বাড়ি ছেড়ে আমি কেন যাবো ?

—কে তোমাকে যেতে বলে ! থাকো তুমি তোমার বাড়িতে।

—একা ?

কৃষ্ণবেণীর মুখের দিকে তাকায় সোমনাথ, বলে,—এর উত্তর আমি কী ক'রে দেবো ?

—কেন নয় !—কৃষ্ণবেণী সোজা হয়ে বসে, বলে,—তুমি এসে থাকতে পারো না এখানে ?

কথাটা শুনে রীতিমত চম্‌কে ওঠে সোমনাথ, বলে,—বলছ কী তুমি ! নিন্দায় লোকে পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠবে না !

—না !—কৃষ্ণবেণী বলে,—সবাই এখানে সব করছে লুকিয়ে-লুকিয়ে—কে কাকে এখানে বলবে ! আর তাছাড়া, নিন্দার এতে আছে কী ?

সোমনাথ একটু থেমে তারপরে বলে,—বাবার সেই সন্দেহের ব্যাপারটা মনে পড়ে ?

—পড়ে।

বলেই উঠে দাঁড়ায় কৃষ্ণবেণী, ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় সোমনাথের কাছে, বলে,—ওসব তুমি যা বললে কোনটাই কাজের কথা নয়। তুমি যদি আমার কাছে থাকো, কেউ কিছু বলবে না, বললেও কোনদিন মারাত্মক হ'য়ে উঠবে না। দু'দিন তোমাদের ঐ রামেশ্বরের হয়ত চোখ টাটাবে, পরে তা-ও ঠিক হ'য়ে যাবে।

—রামেশ্বর ! রামেশ্বরের চোখ টাটাবে কেন ?

তেমনি বাঁকা হাসে কৃষ্ণবেণী, বলে,—ওর চোখ আছে বলেই টাটাবে।

—চোখ ত সবারই আছে।

—না। সবার চোখ আমার ওপরে নেই, এক ঐ চোখ ছাড়া। ক'দিনে ঐ শয়তানটার জ্বালায় আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে গেছি। ওর জন্যই

তোমাকে ডেকে পাঠাতে হলো, নইলে, আমি ডেকে পাঠালুম, তবে তুমি এলে! কেন তোমার কি কর্তব্য নয় আমার খোঁজ নিতে আসা ?

সোমনাথের কানে কিন্তু সব কথা যায় না, রামেশ্বরের কথাটাই কানে বারবার গুনগুন ক'রে ফেরে। বলে,—বুঝেছি। ঐ রামেশ্বরই বুঝি তোমার কাছে……

বাধা দিয়ে কৃষ্ণবেণী বলে,—থাক্, ও নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, বা রেগে গিয়ে ওর সঙ্গে লাঠালাঠি করতে হবে না। যা বলি, তাই শোনো। আমার কাছে চলে এসো।

সোমনাথ চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ, তারপরে বলে,—তা হয় না।

—কেন!

—কেন, তা কি তুমি নিজেই বুঝতে পারো না!

একেবারে ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় কৃষ্ণবেণী, বলে,—বুঝি। তুমি ভাবছ, এক বাড়িতে থাকলে বুঝি তোমার-আমার সঙ্গে দূষণীয় কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠবে! ভয়ানক ভুল করছ। তা' হতে পারত অবশ্য একদিন, কিন্তু আর হবে না।

—হ'তে পারত! এ' কথা বললে কী করে?

কৃষ্ণবেণী এবারেও তেমনি হাসে, বলে,—ঠিকই বলেছি। কার সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল আমার? কার সঙ্গে বিয়ের কথা উঠেছিল? তোমার সঙ্গে। তোমার বাবা তোমার জন্য আমাকে দেখতে গিয়ে শেষে নিজেই বিয়ে ক'রে বসলেন আমাকে। তোমাকে দিলেন তাড়িয়ে। বলো, এসব কি আমার দোষ?

—না, তা' আমি কোনদিনই বলি না।

—তবে?

—তবে আবার কী? আমি আসতে পারব না এ বাড়িতে।

—পারবে না?

—না।

আবার কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকে কৃষ্ণবেণী। ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে নেমে এসেছে ঘরের মধ্যে। ওদের তুজনকে তুটি আবছা ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছে। ঘরের কোণে পিতলের যে ঝকঝকে বড়ো পিলসুজটা রয়েছে, তার কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে প্রদীপটা জ্বেলে দেয় কৃষ্ণবেণী। শিখাটি জ্বলে উঠে ঘরখানা আলোকিত করতেই মুখ ফিরিয়ে সোমনাথের দিকে তাকায় সে, সোমনাথ একদৃষ্টে প্রদীপশিখার দিকে চেয়ে আছে লক্ষ্য ক'রে বলে ওঠে,—কী দেখছ ?

—দেখছি পিলসুজটা। ওটি আমার মায়ের। প্রত্যেক সন্ধ্যায় মা ঐ প্রদীপটা জ্বালতো, ঠিক যেমন করে তুমি এখন জ্বাললে!

হঠাৎ কেমন-যেন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল কৃষ্ণবেণী।

—হাসলে যে!

কৃষ্ণবেণী তেমনি হাসতে হাসতেই বলে,—কার পিদীম কে জ্বালছে দেখ!

—তোমারই ত জ্বালবার কথা।

মুহূর্তে সমস্ত উচ্ছলতা থেমে যায় কৃষ্ণবেণীর, ধীর পায়ে আবার ওর কাছে সরে এসে দাঁড়ায়, গাঢ় কণ্ঠে বলে,—নিশ্চয়ই আমার জ্বালবার কথা। তোমার মা যখন সন্ধ্যাবেলা পিদীমটা জ্বালতেন, হয়ত তোমার দিকে তাকিয়ে মনে-মনে এক-একবার ভাবতেন, তোমার বউ আসবে, সে এসে একদিন ঠিক অম্‌নি করেই সন্ধ্যাবেলা পিদীমটা জ্বালবে। তিনি আজ নেই, আমি এসেছি, পিদীমও জ্বালছি, কিন্তু কার বউ আমি ?

—ছি! এ সব এলোমেলো কথা ভেবো না।

—কী!—নিদারুণ উত্তেজনায় যেন কাঁপতে থাকে কৃষ্ণবেণী, বলে,—এসব এলোমেলো কথা! যদি তা-ই হয়, এ' সব চিন্তা আমার মধ্যে আসে কেন! দেখ, আমি স-ব মানিয়ে নিয়েছিলাম, মেয়েরা না পারে কী ? আমিও পেরেছিলাম। কিন্তু কেন চলে গেলেন তোমার বাবা ?

কেন চলে গেল আমার মেয়ে ? আমি ঘরের অন্ধকারে একা বসে কাকে নিয়ে থাকব !

পরক্ষণেই হু-হু করা কান্নায় ভেঙে পড়ে কৃষ্ণবেণী, দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে মেঝের ওপরে। প্রথমটা কী যে করবে ভেবে পায় না সোমনাথ, তারপরে জলচৌকি ছেড়ে ওর কাছে গিয়ে বসে। বসে ওর দুটি হাত মুখের কাছ থেকে সরাতে চেষ্টা করে, বলে,—কাঁদছ কেন ? শোনো-শোনো আমার কথা।

হাত সরিয়ে নিয়ে সেই জলভরা চোখেই ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় কৃষ্ণবেণী, বলে,—কী ! কী তুমি বলবে ?

সোমনাথ একটু থেমে তারপরে বলে,—তুমি পার্বতী-মার কাছে গিয়ে থাকবে ?

—কেন !

—কিংবা, পার্বতী-মাই যদি তোমার কাছে এসে থাকে ?

—তাতে লাভ কী হবে ! তুমি ভাবছ, এ' সব ব্যবস্থা ক'রে রামেশ্বরের মতো লোকদের তুমি ঠেকিয়ে রাখবে ? পারবে না। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। তা' হয় না। আমাকে চরম অপমানের হাত থেকে যদি বাঁচাতে চাও ত, তুমি এখানে চলে এসো, আমাকে নিয়ে থাকো। আর তা ছাড়া, সংসারই বা চলবে কী ক'রে ? তোমার বাবা টাকা বলতে বিশেষ কিছুই রেখে যান নি, যা রেখে গিয়েছিলেন, শ্রাদ্ধেই তা খরচ হ'য়ে গেছে। এখন তুমি যে বাড়িতে আছো, সেই বাড়ির ভাড়া থেকে চল্লিশ টাকা আয় হয়, সেই চল্লিশ টাকাই আমাদের সম্বল।

সোমনাথ চুপ ক'রে থাকে কিছুক্ষণ। না, এদিক্‌টা সে ভাবেনি। মাসে চল্লিশ টাকা কৃষ্ণবেণীরই ত দরকার। ভাড়ার টাকাটা অসহায় বিধবার হাতেই তুলে দেওয়া উচিত। এমন কি, ও' বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তার ঘরটা ভাড়া দিলে আরও কিছু টাকা আসতে পারে। কিন্তু ঘর ছেড়ে কোথাই বা যাবে সোমনাথ ? চল্লিশ টাকা কৃষ্ণবেণীর

হাতে দিলে সেই-ই বা খাবে কী? সে-সব ভাবনা অবশ্য পরে হবে। সে পুরুষমানুষ, তার একভাবে-না-একভাবে দিন কেটে যাবেই। না হয় কাজ খুঁজতে সে দূরদেশেই চ'লে যাবে।

কৃষ্ণবেণীর কণ্ঠস্বর তখনো কান্নায় ভারী, বলে,—কী ভাবছ তুমি?

—ভাবছি?—সোমনাথ বলে,—আমি ও বাড়ির ঘরটাও ছেড়ে দেবো। কাউকে ভাড়া দিলে চল্লিশ টাকারও বেশী আসবে। আমি নোকন্না সর্দারকে ব'লে দেবো, সে ভাড়া আদায় ক'রে মাসে-মাসে তোমাকে ঠিক টাকা দিয়ে যাবে। ওরা বিশ্বাসী, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

—নোকন্না ভাড়া আদায় করবে কেন, তুমি থাকতে!

—আমি? আমি কোথাও চলে যাবো। দূর কোনো দেশে।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত নিজের হাতে টেনে নেয় কৃষ্ণবেণী, বলে,—তবু তুমি আসবে না এখানে?

ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নেয় সোমনাথ, বলে,—না।

আবার অস্বাভাবিক দীপ্ত হয়ে ওঠে কৃষ্ণবেণীর দুটি চোখ, আবার উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে তার কণ্ঠস্বর, বলে,—কিসের ভয় তুমি করছ? আমি মেয়ে হয়ে যদি কারুর ভয় না করি, তুমি পুরুষ হ'য়ে ভয় করছ কার! দেখ, আমি অতি শান্ত, চিরকাল মুখটি বুজে থেকেছি, একটি কথাও কোনোদিন কইনি। কিন্তু তোমার বাবা চলে যাবার পর থেকে যা সব ঘটনা ঘটতে লাগল, যা সব চোখে দেখতে লাগলুম, কানে শুনতে লাগলুম, আমি যেন ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলাম, ভাবলাম,—আর ত চুপ করে থাকা চলে না! তুমি আজই চলে এসো, ওরা কুৎসা রটায় যদি ত রটাক। কিন্তু তা' বলে তোমাদের ঐ রামেশ্বরের রক্ষিতা হ'য়ে থাকতে আমি পারব না!

—রক্ষিতা!

যেন ধক করে জ্বলে ওঠে কৃষ্ণবেণীর দুটি চোখ, বলে,—তা ছাড়া আর কী! রোজ দুটি বেলা ফুলনৈবেদ্য সাজিয়ে কোটিলিঙ্গমের পূজা

দিতে যাব, দুটিবেলা স্নান করব গোদাবরীর জলে, অশ্বত্থবৃক্ষের পায়ে জল ঢেলে দু'বেলা মন্তর পড়ব, লোকে বলবে, কী নিষ্ঠাবতী ধার্মিক বিধবা ঐ কৃষ্ণবেণী! আর রাত হলে ঘরে আসবে ঐ রামেশ্বর গুটিকয়েক টাকা নিয়ে,—সবাই একদিন জেনেও যাবে, কিন্তু কিছুই বলবে না! অথচ, আমি ত জানব, আমি কী হয়ে গেলুম! রামেশ্বর তোমারই জ্ঞাতিভাই, যদি সম্পর্কই ধরতে হয়, ত, সম্পর্কে সে আমার কী হ'লো? কিন্তু এমনি আজ অবস্থা, ও' সব সম্পর্কের কথা তুলে লালসাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আর যেখানে লালসাটাই সত্য, সেখানে ধর্মের ভান বা নিষ্ঠার ভান, ও' আমি পারব না! বেশ্যাই যদি হ'তে হয় ত, লোকজানাজানি ক'রেই বেশ্যা হবো!

যেন হঠাৎ একটা চাবুক এসে পড়ে সোমনাথের শরীরে, চট্‌ ক'রে উঠে দাঁড়ায় সে, বলে,—কী বললে তুমি! এ' তোমার স্বামীর ঘর, এ' ঘরে দাঁড়িয়ে ও' কথা বলতে নেই!

—স্বামী!—কথাটা যেন অতি বিদ্রূপের সঙ্গেই উচ্চারণ করে কৃষ্ণবেণী, বলে,—বাপের বয়সী একটি লোক, তাকে পেলুম স্বামীর রূপে। না, কোনদিনই তাকে ভাবতে পারিনি স্বামী হিসাবে! আমি গরিবের মেয়ে, আমাকে উনি উদ্ধার ক'রে এনেছেন! ত্রাণকর্তার ওপরে মানুষ কৃতজ্ঞ থাকে, আমি ওঁর কাছে ছিলুম কৃতজ্ঞতায় ভরা এক কেনা সেবাদাসী!

এ' সব কথায় ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করে সোমনাথ, একটা ভীতির শিহরণও জেগে ওঠে তার মনে। কী যেন ভেবে ঘরের দরজার কাছে একবার চ'লে যায়। তারপরে আবার ফিরে এসে দাঁড়ায় কৃষ্ণবেণীর কাছে। শোকে-দুঃখে-অপমানে মাথাটা কী ওর খারাপ হ'য়ে গেল? আলুলায়িত চুল সারা পিঠের ওপর লুটিয়ে দিয়ে মেঝের ওপর উপুড় হ'য়ে ফুলে ফুলে ততক্ষণে কাঁদছে কৃষ্ণবেণী। দেখে-দেখে বড্ড মায়া হয়। লোকলজ্জার ভয় সোমনাথেরও নেই, এমন কি সম্পর্কের কথাটাও বড়ো ক'রে না ধরবার মতো মনের জোরও আছে তার, কিন্তু

নরনারীর সম্বন্ধ কী মাত্র দেহের? অসাধারণ রূপলাবণ্য রয়েছে কৃষ্ণবেণীর, কিন্তু সেটাই কি সব? ওর মন? ওর মনও কী চায় সোমনাথকে? কিন্তু কী ক'রে তা' সম্ভব?

তবু ওকে অমনভাবে কাঁদতে দেখে মমতায় ভরে যায় সোমনাথের মন। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ব'সে পড়ে, দু'হাতে ধ'রে ওকে উঠিয়ে বসায়, বলে,—কাঁদছ কেন? কিন্তু তখনো কান্নার বিরাম নেই কৃষ্ণবেণীর, ক্রন্দনবিকৃত স্বরে সে বলতে থাকে,—আমি কী করব! আমাকে ব'লে দাও—ব'লে দাও!

কয়েকমুহূর্ত এ' ভাবে কেটে যাবার পর আপনিই কান্নার বেগ শান্ত হ'য়ে আসে কৃষ্ণবেণীর। তারপরে হঠাৎ সোমনাথের বাহুমূলে মাথাটা এলিয়ে দেয়, নিজের ক্লান্ত, অবসন্ন দেহটার ভর রেখে চুপচাপ প'ড়ে থাকে কিছুক্ষণ। সোমনাথ একসময় বলে ওঠে,—আমাকে কাছে রাখতে কী মন চায়!

—হ্যাঁ।

—কেন?

তেমনিভাবেই ওর কাঁধেব ওপর মাথাটা রেখে প'ড়ে আছে কৃষ্ণবেণী, বলে,—শুনতে চাও?

—চাই।

—শুনতে পারবে?

মুহূর্তে জেগে ওঠে মনে পার্বতী-মার বলা সেই চিত্রাঙ্গীর গল্পটা, তবু, নিজেকে স্থির রেখে অকম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে,—পারব।

—আমি ভালবাসতে চাই।

—বাসো নি?

—কই বাসলুম? এলুম ষাটবছরের বরের ঘর করতে ষোলো বছরের মেয়ে। সব দেখে শুনে মনটা যেন পাথর হ'য়ে গেল! সব কাজ ক'রে যাই, সব কথা শুনে যাই, কিন্তু কোনো যেন অনুভূতি নেই! আমি যেন রক্তেমাংসে গড়া মানুষ নই, একটা পাথরের স্তূপ।

মন কেন, আমার দেহটাও পাথর হ'য়ে গেল। মেয়েটা কোলে এলো, তখন যেন জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পেলুম। বুঝলুম, মেয়েদের জীবনে মা-হওয়ার মতো বড়ো আর কিছু নেই। ভাবলুম, মেয়েকে ভালবেসেই সার্থক করব নিজেকে। কিন্তু, সে মেয়েও আমার চলে গেল। আমার মধ্যে ভালবাসার যে কুঁড়িটি সবে ফুটেছিল, অকালে সে মরে গেল। আমি ভালবাসতে চাই, আবার কাউকে ভালবাসতে চাই।

এর কী উত্তর দেবে সোমনাথ?

চুপচাপ কী যেন একমনে ভাবতে থাকে সে। কৃষ্ণবেণী তেমনি খাটের পায়ায় মাথা রেখে একভাবে পড়ে আছে! ক্লান্ত, অবসন্ন ওর দেহ, মনটাও নানান্ ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত। একটা পথ-হারা পাখি আকাশে উড়তে উড়তে হঠাৎ যেন পেয়েছে কোনো বৃক্ষশাখার স্নিগ্ধ আশ্রয়,—এমনি নিশ্চিন্ত ওর ভঙ্গিমা, এমনি নির্ভরশীল। ধীরে ধীরে চোখ দুটি ওর বুজে আসে। একসময় তার কাঁধের-ওপর-ভর-দেওয়া ওর দেহটা ভারী মনে হ'তে থাকে। এ' ভাবে কতো সময় কেটে যায় কে জানে, ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় সোমনাথ। মনে-মনে যেন বলতে চায়,—কাকে ভালবাসতে চাও তুমি, আমাকে? আমি রুগ্ন, আমি নিঃস্ব, আমাকে ভালবেসে কী সার্থকতা লাভ করবে তুমি জীবনে!

সত্যি, বড়ো মায়া হয়। বিগত দিনগুলির কথা ছবির মতো চোখের সামনে ভাসতে থাকে। নিজের দুঃখ আর লাঞ্ছনার কথাই এতকাল ভেবে এসেছে সোমনাথ, কিন্তু ওর কথা ত ভাবেনি? ষোলো বছরের এক মেয়ে তাদের সংসারে এসে কী পেলো আর না পেলো, এর হিসাব ত কখনো করেনি সে। আজ ওর সব চলে গেছে, ও-ই বা কাকে অবলম্বন করে এই সংসার রঙ্গভূমিতে আবার উঠে দাঁড়াবে?

অথচ, সোমনাথই বা কী করবে? দিনকয়েক আগে এ' ঘটনা ঘটলে কী হ'তো বলা যায় না, কিন্তু আজ সে কী করতে পারে?

কেটে যায় আরো কিছু মুহূর্ত। অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ হ'য়ে গেছে চারদিক, শুধু দূর থেকে কোটিলিঙ্গম্-মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কিন্তু এ কী, ওর বাহুমূলে মাথা রেখে কৃষ্ণবেণী কি ঘুমিয়ে পড়ল অবশেষে!

ধীরে মৃদু কণ্ঠে সোমনাথ ডাকে,—ঘুমোচ্ছ নাকি? ওঠো।

আশ্চর্য, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে কৃষ্ণবেণী। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হয়, হয়ত কয়েক রাত্রি ও' ঘুমোয় নি, দুশ্চিন্তায় আর মনোযন্ত্রণায় বিছানায় ছটফট ক'রে কাটিয়েছে! কিন্তু, সোমনাথই বা কতক্ষণ বসে থাকবে এ' ভাবে? ওর বাহুতে আস্তে আস্তে নাড়া দিয়ে ডাকে সোমনাথ,—ঘুমোয় না। উঠে ব'সো।

কিছুক্ষণ ডাকবার পর অবশেষে চোখ খোলে কৃষ্ণবেণী, তারপর মাথাটা উঠিয়ে সোজা হ'য়ে বসে, বলে,—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝি? ঘুমের আর দোষ কী? কয়েক রাত্তির চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

সোমনাথ সস্নেহে বলে,—বিছানা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ো। বরং তার আগে খাওয়া-দাওয়াটা সেরে নাও।

কৃষ্ণবেণী ম্লান একটু হাসে, বলে,—বিধবার রাত্রে আবার খাওয়া-দাওয়া কী? না, কিছু খেতে ইচ্ছাও করছে না, শুয়েই পড়ব। তুমি থাকো, কেমন? তুমি থাকলে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব।

উঠে দাঁড়ায় সোমনাথ, বলে,—বেশ, আমি ঘুরে আসি, এসে আজ এখানে না হয় থাকব। লোকলজ্জার ভয় আমি একেবারেই করি না। কিন্তু, কথা হচ্ছে, তুমি আমাকে ভালবাসলে কেমন ক'রে?

দুটি ঘুম-ঘুম ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি ওর ওপর স্থাপিত ক'রে ম্লান একটু হাসে কৃষ্ণবেণী, বলে,—ভালবাসাটা তুমি দেখলে কোথায়?

—দেখেছি।

—কী রকম?

সোমনাথের মুখখানা বড়ো ব্যথিতের মতো দেখায়, বলে,—

তুমি যেভাবে আমার কাঁধে ভর দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তাতে ও' কথা বুঝতে কি বাকি থাকে ?

খাটের বাজুর ওপর ভর দিয়ে ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে কৃষ্ণবেণী, সোমনাথের কথা শুনে একটু হাসে, বলে,—যদি এতটাই বুঝতে পেরে থাকো, তাহ'লে এখানে থাকতে চাইছ না কেন ?

সোমনাথ কোনো উত্তর দেয় না, চুপ ক'রে থাকে।

আপন আবেগে আপন মনেই বলতে থাকে কৃষ্ণবেণী,—থাকো এখানে। তোমাকে আমি খুব যত্ন করব, তোমার সেবা করব, তোমার শরীর দেখো ভালো হ'য়ে উঠবে।

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল সে, সোমনাথ বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে,—জানি। জীবনে ভালোবাসার প্রয়োজন কোন্ মানুষের না আছে ? কিন্তু, আজ এখন তোমাকে না ব'লেও থাকতে পারছি না,—আমি জীবনভোর অবহেলা আর নির্যাতন পেয়েছি সত্য, কিন্তু নারীর ভালোবাসাও না পেয়েছি, এমন নয় !

—কী ! কী বললে ?

—বলছি, একটি মেয়ের ভালবাসা আমিও পেয়েছি !

ধপ্ ক'রে খাটের ওপর বসে পড়ে কৃষ্ণবেণী, কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারে না। মুখখানা যেন মুহূর্তে পাণ্ডুর হ'য়ে যায়, বিহ্বল হ'য়ে যায় চোখের দৃষ্টি, ঠোঁট দুটিও যেন থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে !

কিছুক্ষণ নিঝুম হ'য়ে বসে থাকবার পর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে ওঠে কৃষ্ণবেণী,—তুমি সত্যি বলছ !

—হ্যাঁ। তোমাকে বলতে আর বাধা কী, যা আমি পেয়েছি, তার তুলনা নেই ! মরেই গিয়েছিলাম, যেন বেঁচে উঠেছি !

ধীরে ধীরে মুখখানা উঠিয়ে ওর চোখের দিকে তাকায় কৃষ্ণবেণী, এ' এক অদ্ভুত স্নিগ্ধ দৃষ্টি ওর চোখে, বলে,—মেয়েটি কে ?

—তার নাম আমি বলতে পারব না।

উঠে দাঁড়ায় কৃষ্ণবেণী, আস্তে আস্তে পা ফেলে ওর কাছে আসে, বলে,—আমাকেও বলবে না ?

—না।

একমুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে কৃষ্ণবেণী বলে,—একটা কথা রাখবে ?

—কী ?

—তাকে নিয়ে এসে এ' বাড়িতে থাকো। তোমাদের হুটিকে নিয়ে থাকতে পারলে আমি বোধ হয় বেঁচে যাবো।

—তা' হয় না।

—কেন ?

সোমনাথ বলে,—ভিন্‌জাতের মেয়ে সে। শুধু ভিন্‌জাতের নয়, তোমাদের সমাজে সে পতিতা !

—পতিতা !

—হ্যাঁ।

হাত ছেড়ে খাটের কাছে আবার স'রে যায় কৃষ্ণবেণী, বাজুর ওপর মুখ রেখে কী যেন ভাবে কিছুক্ষণ, তারপরে আবার ফিরে আসে সোমনাথের কাছে, বলে,—তা হোক্। তাকে নিয়ে এসো। আমি খুব সুখী হবো।

—সর্বনাশ ! বামুনের পাড়ায় নিয়ে আসব তাকে ? এদের তুমি চেনো না। নিজেদের জাতের মধ্যে যা-ই হোক্ না কেন, পরের জাত নিজেদের মধ্যে এলেই এরা ক্ষেপে উঠবে। হয়ত ওকে ওরা ঢিল ছুঁড়েই মেরে ফেলবে !

—ইস !—কৃষ্ণবেণী বলে,—অতো সোজা ভেবো না আমাকে ! ঢিল ছুঁড়বে ! আমি বেঁচে থাকতে তা' হবে না !

সোমনাথ একটু হাসে, বলে,—আর এ' ছাড়া, সেও আসবে না।

—কেন ?

একটু ইতস্ততঃ ক'রে সোমনাথ বলে,—আসল কথা কী জানো ? ও' একটু অন্য ধরনের মেয়ে।

কৃষ্ণবেণী বলে,—বুঝেছি। তুমি কোনক্রমেই আমার কাছে থাকবে না। বেশ। তাই হবে।

তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে সোমনাথ,—না-না, ভুল বুঝছ!

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে তেমনি হাসে কৃষ্ণবেণী, বলে,—থাক্ এসব ভুল বোঝাবুঝির পালা।

সোমনাথ বলে,—আচ্ছা, তুমিই বা তাকে এত দেখতে চাইছ কেন? তাকে দেখে তোমার কী লাভ?

—লাভ!—ম্লান হাসে কৃষ্ণবেণী, বলে,—লাভ অনেক। তুমি বুঝলে না, সে হয়ত আমাকে বুঝবে।

একটু বিস্মিত দৃষ্টিতেই সে তাকায় কৃষ্ণবেণীর দিকে। ওকে ঠিক সে বুঝে উঠতে পারে না। গল্পের চিত্রাঙ্গী কুমারের কাছে ভালবাসা প্রার্থনা ক'রে নিরাশ হয়েছিল, হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল সে, প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠে ছারখার ক'রে দিয়েছিল কুমারের জীবন। কিন্তু, এর মধ্যে প্রতিহিংসা কোথায়? কোথায় ঈর্ষা!

সোমনাথ বলে,—কথা দিলাম। তোমার কাছে তাকে নিশ্চয়ই নিয়ে আসব একদিন।

উজ্জ্বল হাসিতে ভরে যায় ওর মুখ, বলে,—আসবে ত? তাকে দেখলেই আমি বুঝতে পারব সে তোমার সেবা করতে পারবে কিনা, যত্ন করতে পারবে কিনা!

—কিন্তু, আমার সেবা আর যত্নের কথা অত ভাবছ কেন?

এ' কথায় হঠাৎ-ই চোখে জল এসে পড়ে কৃষ্ণবেণীর, মুখ ফিরিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কোনক্রমে নিজেকে সামলে নেয় সে, তারপরে জোর ক'রে হাসি টেনে আনে ঠোঁটের কোণে,—বলে,—একজনের সেবাযত্নের কথা না ভেবে আমরা মেয়েরা পারি না। না হয় তোমার সেবাযত্নের কথাই ভাবলাম। যাদের কথা ভাবতাম, তারা ত চলে গেল। আপন বলতে আমার আর কে আছে, বলো?

মনে-মনে অবাক্ হ'য়ে ভাবতে থাকে সোমনাথ,—এ' এক অদ্ভুত

মেয়ে! অদ্ভুত এর ভালবাসার প্রকাশ! বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর সোমনাথ বলে ওঠে,—এবার আসি ?

—এসো।

ঘরের চৌখাট পেরিয়ে অন্ধকারে গিয়ে পড়ে সোমনাথ, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ায়, দুটি হাত দুটি কবাটের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণবেণী। সোমনাথ সরে আসে ওর কাছে, বলে,—যাবার সময়ে রামেশ্বরকে ডেকে ধমকে যাবো নাকি ?

—না!

—না কেন!

—তাতে কেলেঙ্কারি বাড়বে বই কমবে না!—কৃষ্ণবেণী আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠেই ব'লে ওঠে,—ভেবো না তুমি। আমার ব্যবস্থা আমিই ঠিক ক'রে নেবো।

সোমনাথ একটু থেমে তারপরে বলে,—ও বাড়ি আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ভাড়ার টাকা যাতে নিয়মিত পাও, সে ব্যবস্থা ক'রে যাব।

বিচিত্র হাসি দেখা দেয় কৃষ্ণবেণীর ঠোঁটের কোণে, বলে,—যেও। টাকার আমার দরকার। কিন্তু তুমি কোথায় যাবে? সেই মেয়েটির কাছে ?

—ভাবছি, তাই যাব!

বলেই আর দাঁড়ায় না, দ্রুতপায়ে উঠোনটা পার হ'য়ে এসে খুলে ফেলে দরজায় খিল, তারপরে হনহন ক'রে এগিয়ে যায় গলির পথ ধরে। আসতে আসতে অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না পাশের বাড়ির রোয়াকে তাদের জ্ঞাতিভাই সেই রামেশ্বরটা দাঁড়িয়ে আছে কিনা।

গলি পার হ'য়ে গোদাবরীর তীরে এসে পড়ে সোমনাথ। আকাশটা কেমন যেন থমথমে হ'য়ে আছে, একটা কোণে বুঝি মেঘও জমেছে। হাওয়া নেই একেবারে, একটা গাছের পাতাও বুঝি নড়ছে না! গোদাবরীর জল ছবির মতো স্থির আর নিশ্চল দেখাচ্ছে,—

হঠাৎ যেন থমকে থেমে গেছে জলস্রোত, যেতে-যেতে হঠাৎ যেন ফিরে তার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টিতে তাকে তিরস্কার করছে। কী একটা অপরাধে রাগ করেছে যেন তার মা, একটি কথাও বলছে না!

রাত কম হয়নি, নির্জন হয়ে গেছে পথ। আরতি শেষ করে কোটিলিঙ্গম্-মন্দিরের পূজারীরা একে একে সবাই চলে গেছে। ঘাটও নির্জন। শুধু দূরের ঐ বাঁধাঘাটটায় আগাগোড়া কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে অনেকে। আর, সেই বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছের বাঁধানো বেদীমূলে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে আছে চুপচাপ কে একটি লোক। এতরাত্রে কে ওখানে ও' ভাবে ব'সে?

কাছে আসতেই বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গেল সোমনাথ, তারপরে ব'লে উঠল—তুমি!

লণ্ঠনটা হাতে তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো পার্বতী-মা, বলল,—হ্যাঁরে আমি, সেই থেকে তোর জন্য ঠায় বসে আছি। চল্ বাবা রাত হ'য়ে গেছে, তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না-না, তোমাকে যেতে হবে না!

করুণ চোখে তার দিকে তাকায় পার্বতী-মা, বলে,—ও'কথা বলিস্ না সোমনাথ। চল্, কথা বলতে বলতে তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি। ভাবছিস্, আমার খুব কষ্ট হয় এতে? মোটেই না। চল্ বাবা এগিয়ে।

পথ চলতে চলতে অনেক কথাই বলতে থাকে পার্বতী-মা, কিন্তু আশ্চর্য, একটিবারও তোলে না কৃষ্ণবেণীর কথা। বলে,—নাসিক যাব ভাবছি। আমার সঙ্গে যাবি সোমনাথ?

সোমনাথ অবাক্ হ'য়ে বলে,—চিরকালই ত একা-একা ঘুরে বেড়াও, এবার আমাকে সঙ্গে নিতে চাইছ কেন?

একটু হাসে পার্বতী-মা, বলে,—একা-একা থাকিস্, একটু বাইরে ঘুরে এলে মন ভালো থাকবে।

—মন আমার ভালই আছে।

আবার হাসে পার্বতী-মা, লণ্ঠনটা উঁচু ক'রে পথের বাঁকটা একবার দেখে নেয়, তারপর বলে,—কয়দিন ? ভালো থাকবে না।

—কেন!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পার্বতী-মা, তারপরে ফিরে ওর মুখের দিকে উঁচু ক'রে ধরে লণ্ঠনটা, বলে,—দিনকয়েক যাবে। আবার তোকে ডাকবে কৃষ্ণবেণী। আজকে যেমন চলে এলি, এম্‌নি সেবারও চলে আসবি। কিন্তু আবার ডাকবে। ওর ডাক তুই এড়াতে পারবি না। সোমনাথ নিরুত্তরে চলা শুরু করে, কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকবার পর বলে,—তুমি ভুল করছ পার্বতী-মা। ওর সঙ্গে সে সম্পর্ক আমার কোনদিনই গ'ড়ে উঠবে না।

কেমন যেন উত্তেজিত আর তীব্র শোনায় এবার পার্বতী-মার কণ্ঠস্বর, বলে,—গ'ড়ে উঠবে-কী-উঠবে না, তুই এখন থেকেই জোর গলায় কেমন করে বললি !

—কী বলছ তুমি !

—হ্যাঁ সোমনাথ। পার্বতী-মা বলতে থাকে,—আমি জানি, কী হবে। ও তোকে ডাকবে, তুই যাবি। চ'লেও আসবি। আর ও ভুলের পর ভুল করতে থাকবে। একটা ক'রে ভুল করবে, মনে-মনে ছটফট করবে যন্ত্রণায়, আর তোকে ডেকে পাঠাবে, বলবে,—বাঁচাও সোমনাথ। তোমার সাধ্য কী তুমি এভাবে ওকে···

—বুঝলাম। কিন্তু, ওর ভুলের কথা তুমি কী বললে ?

—হ্যাঁ, মারাত্মক ভুল। না ক'রেও উপায় নেই। নিঃসহায় অল্প-বয়সী বিধবা আর কুমারীদের কথা আমার থেকে কে বেশী জানে বল্। উৎপাতের পর উৎপাত ! যে শয়তানরা আসবে, তারা কি হৃদয় নিয়ে আসবে ? মোটেই না।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যায় সোমনাথের দুটি চোখ, বলে,—তুমি তাহলে সব কথা জানো, পার্বতী-মা !

—জানি না! পার্বতী-মা ব'লে,—নিজের জীবন দিয়ে জানি। যা হয়, যা হবে,—আমি তা' এখনই বলতে পারি।

একটুক্ষণ থেমে থেকে সোমনাথ বলে,—একটু বোধহয় ভুল করছ। ওকে ভালো বুঝতে পারো নি। সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে ও' দেখবে ঠিক রুখে দাঁড়াবে!

—রুখে দাঁড়াবে! পার্বতী-মা ব'লে ওঠে,—অত সহজ নয়। দিনের পর দিন যুদ্ধ করতে হবে, একে অসহায় বিধবা—তায় অল্পবয়সী, —কতদিন পারবে বলতো ?

সোমনাথ বলে,—তুমি ওকে একটু দেখো পার্বতী-মা। আমি আজই ও বাড়িটা ছেড়ে দেবো, সমস্ত ভাড়া মাসে-মাসে ও' যাতে পায়, আমি ব্যবস্থা ক'রে দেবো। পার্বতী-মা আবার লণ্ঠনটা উঁচু ক'রে ওর মুখের দিকে তাকায়, বলে,—হুঁ। ভালই ব্যবস্থা করেছিস্। টাকার ওর দরকার। কিন্তু তুই নিজে আর ওর কাছে কখনো যাস্ না। রাজরাণী চিত্রাঙ্গী আর কুমার শারঙ্গধরের গল্পটা ভুলে যাস্ না কখনো !

'চিত্রাঙ্গী' নামটা শোনামাত্রই চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সোমনাথ। তার চিত্রাঙ্গী এতক্ষণে কী করছে কে জানে! ততক্ষণে ওরা এসে পড়েছে সোমনাথের বাড়ির কাছাকাছি। ওর বাড়িটা অন্ধকারে নিঝুম হ'য়ে আছে, কিন্তু তার পিছনে নোকন্নার বাড়িতে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে মনে হচ্ছে। অনেক লোক যেন জড়ো হ'য়েছে ওর বাড়িতে। সেই হ্যাজাক্ না কী যেন বলে আলোগুলোকে, সেই জোরালো আলোর বিচ্ছুরিত আভা যেন এসে প'ড়েছে ওদের আঙিনা ছাড়িয়ে রাস্তার ওপরে। পার্বতী-মা বলে,—এত আলো কেন রে ওখানে ?

—নোকন্না-সর্দারের বাড়ি। কিছু একটা উৎসব-টুৎসব হচ্ছে আর কি। গানবাজনার আসর বসছে হয়ত। ওদের ত এসব লেগেই আছে।

দাঁড়িয়ে পড়ে পার্বতী-মা, বলে,—আর যাব না। তুই ঐ আলোয়-আলোয় চলে যা, আমি ফিরে যাই।

—পার্বতী-মা?

—কী?

—ওর কাছে তুমি এবার একবার যাও।

—কার কাছে! কৃষ্ণবেণীর কাছে? কেন বলত, তোর অতো মাথাব্যথা কেন? তুই না বললেও হয়ত আমি যেতাম, কিন্তু খবরদার, তুই ওর ছায়ায় কখ্‌খনো যাবি না, এই ব'লে দিলাম।

এ' কথায় নীরবে একটু হাসে সোমনাথ, কিছু বলে না। পার্বতী-মা লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে আবার ফিরে যায় গোদাবরীর দিকে। নদী-তীরে গিয়ে পথের বাঁক ঘুরবে। হয়ত সত্যিই যাবে কৃষ্ণবেণীর কাছে। ওর প্রতি যতই উষ্মা প্রকাশ করুক না কেন, ওর কাছে পার্বতী-মার না গিয়েও উপায় নেই। যতই বারণ করুক সোমনাথকে, কৃষ্ণবেণী ওঁকে দিয়ে ডেকে পাঠালে, পার্বতী-মা হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে আবার আসবে তার কাছে, বলবে,—চল্ সোমনাথ, কৃষ্ণবেণী ডাকছে তোকে।

না, সোমনাথের এ' পরিবেশ থেকে সরে যাওয়াই ভালো।

বাড়ির সামনাসামনি ততক্ষণে এসে পড়েছে সোমনাথ। সোজা নিজের ঘরে উঠে যাবে সোমনাথ, না, ওদের উঠোনে গিয়ে ওদের খোঁজ নিয়ে তারপরে ঘরে যাবে? ভাবতে-ভাবতে পথের ওপরে দাঁড়িয়েই পড়েছিল, হঠাৎ কানে এলো কার মৃদু কণ্ঠস্বর,—পণ্ডিত?

ভয়ানক চম্‌কে উঠল সোমনাথ—কে? কে তাকে ডাকল?

তার বাড়ির ওপরে-ওঠবার সিঁড়ির ওপর অন্ধকারে মিশে বসে ছিল সে, তাকে দেখতে পেয়ে অন্ধকার থেকে উঠে এসে দাঁড়ালো পাশে। সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সোমনাথ বলে উঠল,—কোণ্ডা! তুই?

—হ্যাঁ।

—এ' ভাবে, অন্ধকারে, সিঁড়িতে ব'সে ?

তোমার জন্য বসে আছি পণ্ডিত।

—কেন ?

—তোমাকে খুঁজতেই এসেছিলাম।

—কেন রে ?

—বসে আছি। নাগমণি ওর বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল, ফিরে এসে বললে, শীগ্‌গির যা, পণ্ডিতকে সঙ্গে করে নিয়ে আয় !

কী এক অজানা আশঙ্কায় বুকটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে সোমনাথের, বলে,—খবর সব ভালো ত ?

কেমন যেন উদাস, অন্যমনস্ক আর ব্যথাতুর মনে হয় চির-প্রফুল্ল কোণ্ডাকে, বলে,—কার খবর ?

—নাগমণির ?

—ভালো।

সোমনাথ বলে ওঠে,—ওর বন্ধুর খবর ভালো ত ? হঠাৎ তোকে দিয়ে ডেকে পাঠাল কেন ?

—কে জানে পণ্ডিত !

সোমনাথ সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠে, বলে,—আয় আমার সঙ্গে। আমি চট্ করে কয়েকটা কাজ সেরে তোর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।

নিরুত্তরে ওর পায়ে-পায়ে উপরে উঠে আসে কোণ্ডা। দরজা খুলে ঘরের আলোটা জ্বালায় সোমনাথ, জানালাটা খুলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ওদের উঠোনের সেই হ্যাজাক্-বাতিটার উজ্জ্বল আলোর একটা বিভা এসে ওর ঘর আবছা আলোয় ভরিয়ে দেয়। জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকায় সোমনাথ, নোকন্না পাগড়ি মাথায় সিঁড়ির ওপর ব'সে আছে, উঠোনে মাদুর পেতে ব'সে জনকয়েক লোক, তাদেরও মাথায় পাগড়ি। কিসের যেন গভীর আলোচনা চলছে ওদের মধ্যে। কিন্তু লছমী কোথায় ?

মুখ ফিরিয়ে কবাটের কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা কোণ্ডার দিকে তাকায়

সোমনাথ, বলে,—কী ব্যাপার রে কো[illegible]? ওদের বাড়িতে আজ আবার কী?

কিন্তু আশ্চর্য, কোনো উত্তর আসে না কোণ্ডার দিক্ থেকে। সোমনাথ ওর বাড়তি জামা আর ধুতিটা পাট ক'রে হা[illegible] ওপর নেয়, ছোট্ট টিনের বাক্সটা খুলে তার মধ্যে রাখতে-রাখতে ব'লে ওঠে,—কী রে, চুপ ক'রে রইলি কেন?

তখনো উত্তর নেই। টিনের বাক্সটা বন্ধ ক'রে ওটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সোমনাথ, বলে,—চল্ এবার। ঘরটা বন্ধ ক'রে চাবিটা লছমীর হাতে দিয়ে যাব। কী রে, চুপ ক'রে আছিস্ কেন?

—পণ্ডিত?

—কী!

কোণ্ডার গলার স্বর যেন বড্ড গম্ভীর মনে হয়, বলে,—সর্দার আমাকে আজ ঘাড় ধরে বাড়ির বার করে দিয়েছে।

আশ্চর্য হ'য়ে সোমনাথ বলে,—সে কী রে!

—হ্যাঁ! ঐ' লছমী নালিশ ক'রেছে আমার নামে।

—কিসের নালিশ?

—কোণ্ডা বলতে থাকে,—আমি তোমার খোঁজে এলুম ত? এসে দেখি, তুমি নেই। ওদের বাড়িতে আলো এসেছে, আরও সব লোকজন এসেছে। আমি ওদের পাশ কাটিয়ে ঘরে গেছি, দেখি, লছমী এককোণে বসে আছে। ও' যে কাঁদছিল আমি তা' কী ক'রে জানব বলো? আমি ওদের উঠোনেই খবরটা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ওর কাছে গিয়ে আনন্দ করে কথাটা বলতে গেলাম।

—কী কথাটা?

—ওর বিয়ের কথা। বললাম, তোমার নাকি বিয়ে? তুমি বললে বিশ্বাস করবে না পণ্ডিত, লছমী কী করল জানো? ঠাস্ ক'রে আমার গালে এক চড় বসিয়ে দিলো! আমি ত প্রথমটায় অবাক্। তারপরে আমারও মাথায় রাগ চ'ড়ে গেল। বললুম,—তুই মারলি!

ঠিক আজকের দিনেই তুই মারলি ! বেশ, তোর মুখ পর্যন্ত আমি দেখব না কোনদিন ! বললাম,—আমার পয়সা দিয়ে দে। এ' যাবৎ যা' আমার পাওনা হয়েছে কাপড় কেচে, সব দিয়ে দে। তুই বিয়ে করছিস্, আমি করতে পারি না ! আমি বিয়ে করব, ঘর করব, আমার পয়সা লাগবে, দে শিগ্‌গির ! ব্যস্, আর যাবে কোথায় ? নিজের চুল নিজে ছিঁড়ে রেগে-টেগে অস্থির। শেষে বাপের কাছে নালিশ ! সর্দার আমাকে ঘর থেকে বার করে দিলে, বললে, একটা পয়সাও পাবি না তুই, যা ভাগ্। চলেই যেতাম পণ্ডিত, তোমার জন্য বসে আছি। চলো তুমি।

সোমনাথ বলে,—লছমীর বিয়ে হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল বুঝি ?

—হ্যাঁ। ওরা কাল সকালেই চলে যাচ্ছে।

—কাল সকালেই ! সে কী রে ?

—হ্যাঁ, শহরে যাবে। বরের বাড়িতে গিয়ে বিয়ে হবে। কালই নাকি দিন ঠিক হয়ে গেছে।

সোমনাথ বলে,—তুই একটু দাঁড়া। আমি ওদের সঙ্গে দেখাটা ক'রে আসি।

কোণ্ডা বলে,—বেশ যাও। আমি থাকব না, আমি চলে যাই। তুমি যতো তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো। নইলে নাগমণি আমাকে বকবে বলে রাখছি।

—ঠিক আছে। তাই কর্। তুই চ'লেই যা। কিন্তু শোন্ ?

দু'পা এগিয়েও ফিরে দাঁড়ায় কোণ্ডা, বলে,—কী ?

—একটা কাজ করবি ?

—বলো।

সোমনাথ টিনের বাক্সটা ওর হাতে দেয়, বলে,—এটা নিয়ে যাবি ? নাগমণির কাছেই দিবি, আমি গিয়ে নেবো এখন। কী রে, পারবি ত নিতে ?

—খুব একটা কাজ বললে ! দাও।

ব'লে টিনের বাক্সটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় কোণ্ডা। সোমনাথ ঘর বন্ধ করে নিচে নেমে এসে ওকে আর দেখতে পায় না, ধীর পায়ে নোকন্নাদের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে নোকন্না, বলে,—এসো পণ্ডিত, আমার লছমীর বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল। কালই বিয়ে।

—হঠাৎ ?

—হয়ে গেল ঠিক। আমিও নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। আমাকেও আর বেশী খাটতে হবে না। জলে গিয়ে কাপড় কাচতে হবে না। দোকানে ব'সে কাজকর্ম দেখব। জামাই সব শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবে ব'লেছে'।

সোমনাথ এগিয়ে আসে নোকন্নার কাছে, বলে,—ব্যাপার কী বলো ত নোকন্না ?

—ব্যাপার ?—নোকন্না বলে,—এরা সবাই এবার থেকে ডাইং-ক্লিনিংয়ের কাপড় কাচবে ঠিক হ'য়ে গেছে।

—সে কী! এতে না তোমার আপত্তি ছিল ?

—ছিল। কিন্তু উপায় কী ? জামাই যে নইলে রাগ করবে আমার ওপর।

—কী করে তোমার জামাই ?

—ডাইং-ক্লিনিংয়ের ব্যবসা। জামাই আমার যা'তা লোক নয়। তুমি তাকে চেনো পণ্ডিত। প্রকাশ রাও।

—প্রকাশ রাও !—অবাক্ হয়ে ভাবতে থাকে সোমনাথ,—সেই প্রকাশ রাও, ম্যাট্রিক! সেই রাতারাতি 'নেতা' হ'য়ে-ওঠা প্রকাশ রাও! সে করতে চায় লছমীকে বিয়ে! ওরা একজাত হ'লেও প্রকাশ রাও মধ্যবিত্ত আর এরা সাধারণ শ্রমজীবী, মিশ খাবে কি সহজে ওদের মধ্যে ? হবে না-ই বা কেন ? শ্রমজীবী কায়িক শ্রম ত্যাগ করে মধ্যস্বত্বভোগী হ'লেই ক্রমে ক্রমে মিল হয়ে যাবে পরস্পরের সঙ্গে।

নোকন্না 'লছমী-মা' 'লছমী-মা' ব'লে ডাকতে ডাকতে ঘরের মধ্যে

যায় একবার, তারপরে নিয়ে আসে থালাভর্তি একরাশ 'লাড্ডু'—প্রত্যেকের হাতে মেঠাই তুলে দিতে থাকে একে একে। মেঠাই হাতে নিয়ে যে-যার বাড়ি চ'লে যায়। দেখতে দেখতে উঠোনটা হ'য়ে যায় খালি। খাটিয়ার ওপর ওকে বসিয়ে ওর পাশে বসে নোকন্না, বলে,—এই সব লোকগুলোকে আমি হাতে ক'রে গ'ড়ে তুলেছিলাম পণ্ডিত, আর এরাই আমাকে সর্দার বলে মানতে চাইল না। আর এখন? না মেনে এদের উপায় নেই পণ্ডিত!

ব'লে হা-হা ক'রে হেসে ওঠে নোকন্না, বলে,—ওদের যে এখনকার সর্দার, যার কথা ওরা বেদবাক্য ব'লে মনে করে, সেই প্রকাশ রাও হলো গিয়ে আমার জামাই। তাহলে আমি ওদের হ'লাম কী? সর্দারের সর্দার!

সোমনাথ বলে,—কী ক'রে ব্যাপারটা হ'লো, বলো ত নোকন্না? সবটা মিলিয়ে কেমন যেন হেঁয়ালীর মতো মনে হ'চ্ছে।

নোকন্না বলে,—প্রকাশ আমাকে ডেকে পাঠালো। বলল,—ডাইং-ক্লিনিংকে তোমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তার চেয়ে এসো, হাতে হাত মিলাও। তোমরা ডাইং-ক্লিনিংয়ের দোকান থেকে কাপড় নিয়ে যাবে, কেচে ফেরত দেবে ডাইং-ক্লিনিংকে। গৃহস্থদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

—তুমি মেনে নিলে নোকন্না?

—না, মানতে আমি চাই নি। কিন্তু প্রকাশ যখন বললে,—তোমার অবস্থা কী হবে, ভেবে দেখেছ সর্দার? তোমার দলের সবাই এসে আমার সঙ্গে চুপি চুপি দেখা ক'রে গেছে, ব'লে গেছে, তারা সবাই আমার প্রস্তাবে রাজী। আমাকে শুধু 'সোডা' যোগাড় করে দিতে হবে। তা' সর্দার, সোডার ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি, সে ত তুমি জানোই।…এ'সব কথা শুনে মনে হলো,—ওরা যদি আমাকে ছাড়তে পারে এককথায়, আমিই বা পারব না কেন?

—নোকন্না, একটা কথা বলি।

—বলো পণ্ডিত।

—ভুল করছ না ত ?

—পণ্ডিত ! যেন আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে নোকম্মা,—ভুল আমি করলাম না, ভুল করল ওরা ! মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের সম্পর্কটাই আসল, কী বলো পণ্ডিত ? গৃহস্থদের বাড়ির কাপড় নিতে-দিতে গিয়ে এই সম্পর্কটা আপনিই গড়ে উঠত। এরপর থেকে আমাদের সমাজটা একেবারে আলাদা হয়ে যাবে সবার থেকে। ওদের সঙ্গে আমাদের আর যোগ থাকবে না। এইটাই আমার বুড়ো বয়সের সব থেকে বড়ো ব্যথা হ'য়ে দেখা দিল পণ্ডিত, নইলে, প্রকাশ রাওয়ের মতো ভদ্রলোক জামাই পাবো, এ আমার ভাগ্যের কথা !

—বিয়ে দিচ্ছ দাও, কিন্তু যে ব্যবস্থাটাকে ভুল বলে জানো, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারো না ?

—না পণ্ডিত,—নোকম্মা বলে,—একার কাজ নয়। ওরা আমার পাশে আগের মতো যদি থাকতো, আমি সব করতে পারতাম। কিন্তু পণ্ডিত, করব কাদের জন্য ?

—তা-ও বটে। দেখ, হয়ত এ ব্যবস্থাটা শেষ পর্যন্ত ভালো হয়েই দাঁড়াবে।

—না পণ্ডিত, এ' ভাবে ভালো হয় না। ফল খারাপই হবে। কিন্তু এখন ভাবছি, খারাপই হোক্। নিজেরা যখন ঘা খাবে, তখন বুঝতে পারবে। আমি বুড়ো হ'য়েছি, আমার আর ক'টা দিন ! কিন্তু ওরা একদিন ঠেকবে, সেদিন বুঝবে, ওরা কী ভুল করেছিল ! সেদিন হয়ত ওরা নিজেরাই আবার নতুন ক'রে গড়ে তুলবে নিজেদের। তাই বলি, পণ্ডিত, যা' হবার তা' হ'তে দেই। আমাদের ঘা খাওয়া দরকার, ঘা না খেলে জাগব না !

সোমনাথ বলে,—তুমি জীবনে বহু পোড় খেয়েছ, বহু দেখেছও তুমি, হয়ত তোমার কথাই সত্য। কিন্তু যা-ই হোক, লছমীর বিয়ের

কথা শুনে খুব খুশী হলাম। তবে, বড্ড হঠাৎ সব ঠিক হয়ে গেল না? তাড়াহুড়ো না করে দু'দিন দেরি করলে পারতে।

—প্রকাশ রাও যে একেবারে রাজী হলো না!—নোকন্না বলে,—সে বিয়ে করতে চায় কালই। তার বাসাতেই বিয়ে হবে। তোমাকে কিন্তু আসতে হবে পণ্ডিত।

—যাবো। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলবো নোকন্না।

—বলো পণ্ডিত।

—আমি এ বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি আজ রাত্রেই।

—সে কী!

—হ্যাঁ। এই চাবিটা নাও। কাল সকালে কাউকে দিয়ে আমার ছোট-মার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমার ছোট-মাকে চেনো ত?

নোকন্না বলে,—হ্যাঁ, তা চিনি। কিন্তু তুমি গিয়ে থাকবে কোথায়?

সোমনাথ একটু হেসে বলে,—যদি বলি নাগমণি আর কোণ্ডার কাছে?

কোণ্ডার কথা আর বোলো না!—নোকন্না বলে,—বদ্ধ পাগল! বিয়ের কথা হচ্ছে, পাঁচজন লোক এসেছে বাড়িতে, অমনি কোথাও কিছু নেই, পয়সা-পয়সা ক'রে একেবারে অস্থির হয়ে উঠল! আমি খুব বকেছি। গেল কোথায় সে, ও' মা, লছমী?

লছমী ঘরের মধ্য থেকে সাড়া দেয়,—জানি না বাবা।

সোমনাথ বলে,—চলে গেছে।

নোকন্না বলে ওঠে,—সে কী! না বলে ক'য়ে সত্যিই চলে গেল!

—তুমি নাকি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছ?

—তাড়িয়ে দিয়েছি!—নোকন্না অবাক্ হ'য়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সোমনাথের মুখের দিকে, বলে,—তাই বুঝি তোমাকে ও বলেছে? পণ্ডিত, ওকে তাড়িয়ে দেওয়া ত নতুন নয়, কিন্তু কখনো কী গেছে?

আজও যায় নি, অভিমান করে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে হয়ত, ঠিক আসবে সময়মত।

উঠে দাঁড়ায় নোকন্না, বলে—আমি যাই, গরুর গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে রাখি গিয়ে। জিনিসপত্তর ত আর কম নয়!

তুমি কি এখানকার বাস তুলে দিচ্ছ সর্দার?

—হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে। এখানে আর থাকবো কী করতে পণ্ডিত? হয়ত দিনকয়েক আসব ভিটের মায়ায়,—তারপরে আর আসার দরকার হবে না। চলি পণ্ডিত, ওরে লছমী বাইরে আয়, পণ্ডিতের সঙ্গে কথাটথা বল এসে।

মাথার পাগড়িটা ঠিক ক'রে হাতে লাঠিটা তুলে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে পথের দিকে পা বাড়ায় নোকন্না, সোমনাথ মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকায়, ডেকে ওঠে,—লছমী?

লছমী বোধহয় ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল! আলোটা ছিল দাওয়ার নিচে, তাই দাওয়ার আড়াল পড়ায় ঘরের দিক্‌টা অন্ধকার, তাই ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না ওর উপস্থিতি। পিছন থেকে ওর মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—বাবা কোথা থেকে ঐ জোরালো বাতিটা এনেছে, আমার চোখে তা' সইছে না পণ্ডিত, তাই বাইরে যাচ্ছি না, তুমি ভিতরে এসো পণ্ডিত।

সোমনাথ উঠে ওর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরটা অন্ধকার বললেই চলে। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে অতি ছোট্ট একটা প্রদীপ জ্বলছে ক্ষীণ শিখায়, তার আলোয় সব কিছু দেখাও যায় না। কবাটের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা লছমীকে শুধু চেনা যায়, কিন্তু কাছে থেকেও ভালো ক'রে বোঝা যায় না ওর মুখের ভাব।

সোমনাথ বলে,—তুই বিকেলে বাপের জন্য ছটফট করছিলি, এইজন্যই তোর বাপের আসতে হচ্ছিল দেরি। যাক্ প্রকাশের সঙ্গে তোর যে বিয়ে হ'চ্ছে, এটা খুব আনন্দের। তুই সুখী হয়েছিস্ ত?

লছমী তেমনি মৃদুকণ্ঠে বলে,—হ্যাঁ।

সোমনাথ একটু হেসে বলে,—ঘাটে গিয়ে আর কাপড়-কাচা চলবে না। বিয়ের পর ঘরে ব'সে একটু লেখাপড়া শিখে নিবি, কেমন ?

কোনো উত্তর দেয় না লছমী, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কেমন যেন থমথমে হ'য়ে আছে সমস্ত আবহাওয়া। সোমনাথ বলে,—আমি এবার চলি। কাল যাব তোর বিয়েতে।

—তুমি এখনই চ'লে যাচ্ছ পণ্ডিত ?

—হ্যাঁ।

লছমী বলে,—সেই মেয়েটিকে আমার দেখা হলো না। বিয়ের পর আমাদের বাড়িতে একবার নিয়ে এসো না তাকে ?

—কেন ?

লছমী বলে ওঠে,—বারে, দেখতে ইচ্ছা করে না !

—করে বুঝি ?

সোমনাথের কথার ধরনে বোধহয় অতর্কিতে একটা আঘাতই পায় লছমী, কেমন কান্নাভরা শোনায় ওর কণ্ঠস্বর, বলে,—পণ্ডিত ! তোমাকে যে ভালোবেসেছে, তাকে দেখতে আমার ইচ্ছা করবে না !

মুহূর্তে কোমল হ'য়ে যায় সোমনাথের মন, সস্নেহে বলে,—বেশ বোন, তোকেও কথা দিলাম, তাকে দেখাবো।

নিচু হ'য়ে হঠাৎ তাকে প্রণাম করে লছমী, তার পায়ের ওপর কয়েক মুহূর্ত রাখে ওর হাত, আর সোমনাথের মনে হয়, দু'ফোঁটা চোখের জলও বুঝি পড়ে তার পায়ে। ওকে তাড়াতাড়ি দু'হাতে উঠিয়ে দিয়ে ব'লে ওঠে সোমনাথ,—তুই কাঁদছিস্ লছমী !

তাড়াতাড়ি মুখে আঁচল দিয়ে উদ্গত অশ্রুকে রোধ করবার চেষ্টা করে লছমী, কিন্তু বৃথা চেষ্টা, কান্নার আবেগে ফুলে-ফুলে উঠতে থাকে সমস্ত শরীর, সেই অবস্থাতেই কোনক্রমে ব'লে ওঠে সে,—তোমরা আমাকে সবাই পর ক'রে দিলে পণ্ডিত !

—পর! বলছিস্ কী তুই?

—কিন্তু আমি কী করব! বাবার ইচ্ছার বাইরে আমি কেমন ক'রে যাব!

—যাবিই বা কেন! এ' বিয়েতে কি তোর মত নেই লছমী?

আঁচলটা ছেড়ে দিয়ে অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা তার দিকে ফিরিয়ে ব'লে ওঠে লছমী,—মত আছে পণ্ডিত, মত না থাকলে বাবা জোর ক'রে আমার বিয়ে দিতে পারত না।

—তবে?

লছমী মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলে,—বাবা এসে সব কথা আমাকে খুলে বলল। ব'লে জিজ্ঞাসা করল,—হ্যাঁরে, তোর মত আছে ত? বললাম,—হ্যাঁ বাবা! কেন মত থাকবে না পণ্ডিত? যাকে বিয়ে করছি, সে ত তোমারই মতো ভদ্রলোক, তোমারই মতো লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান লোক!

—সে ত বটেই!

—সে ত তাড়ি খায় না, সে ত অন্য মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় না, সে ত বাউণ্ডুলে নয়, ক্ষ্যাপা নয়।

প্রথমটায় উত্তেজিত শোনায় লছমীর কণ্ঠস্বর, কিন্তু পরমুহূর্তে সেই উত্তেজনা ভেঙে পড়ে উচ্ছ্বসিত কান্নায়। চট্ ক'রে সরে যায় ঘরের প্রদীপ-জ্বলা কুলুঙ্গিটার কাছে, কী একটা যেন নিয়ে আসে হাতে ক'রে, বলে,—এই থলিটা তুমি ধরো ত পণ্ডিত।

এ' অঞ্চলের গ্রাম্য লোকেরা যে-রকম কাপড়ের থলিতে টাকা-পয়সা রাখে, সেইরকম বড়ো একটা থলি, মুখটা দড়ি দিয়ে বাঁধা,—হাতে নিয়ে বোঝা গেল, খুব ভারী।

ওর একেবারে কাছে স'রে এলো লছমী, চোখ দুটি তখনো জলে ভরা, কণ্ঠস্বর তখনো ভারী, কোনক্রমে যেন নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করছে সে, বলল,—একটা কাজ করবে বামুন-ভাই?

—কী?

কবাটের ওপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে যেন পতন থেকে নিজেকে রক্ষা করল লছমী, বলল,—এই থলিটা তুমি কোণ্ডাকে দিয়ে দিও। একটা পয়সাও ওকে আমরা ফাঁকি দেই নি। ওর যা' যখন পাওনা হ'য়েছে, ওর নাম ক'রে আমি তখনই তা রাখতুম এই থলিটাতে! ও' কিন্তু আমাকে কোনদিন বিশ্বাস করে নি। এই থলিটা দিয়ে ওকে ব'লো, এই কথাটা যেন ও বিশ্বাস করে। ওকে ফাঁকি দেবো, এমন মেয়ে আমি নই।

হতবাক্ হ'য়ে ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সোমনাথ। ধীরে ধীরে সব যেন স্বচ্ছ হ'য়ে আসে। ওর জীবনের, ওর মনের একটা দিক্ যেন মুহূর্তে উদ্ঘাটিত হ'য়ে যায় চোখের সামনে। ধীরে ধীরে সোমনাথ বলে,—ফাঁকি দেবার মেয়ে যে তুই নোস্ বোন, তা' আমি জানি। কিন্তু ভাবছি, তোকে না কেউ ফাঁকি দেয়! হ্যাঁ রে, এই বিয়েতে তুই সুখী হবি?

—হবো।

—ঠিক বলছিস্?

—হ্যাঁ।

সোমনাথ বলে,—ভেবে দেখ, এখনো সময় আছে।

—না, সময় নেই। যা' হবার সব হ'য়ে গেছে। —লছমী বলে, —বামুন-ভাই? আর একটা কথা কোণ্ডাকে বোলো। পয়সাগুলো যেন অযথা নষ্ট না করে। নাগমণির হাতে যেন সব তুলে দেয়, ও' শক্ত মেয়ে, ঠিক ওকে সামলাতে পারবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সোমনাথ বলে,—তাই হবে লছমী, আমি ওকে তাই বলব। আচ্ছা, এবার আসি।

ব'লে আর ওর মুখের দিকে তাকায় না, চট্ ক'রে সরে আসে ওর কাছ থেকে। থলিটা পকেটে ফেলে দ্রুতপায়ে চলতে থাকে পথ পার হ'য়ে। কম হয়নি রাত,—ওরা ওর জন্য এখনো বসে আছে কিনা কে জানে!

সবাই ওকে দেখতে চায়। কৃষ্ণবেণীও চায় ওকে দেখতে, লছমীও চায় ওকে দেখতে। চিত্রাঙ্গীকে ও' গিয়ে বলবে,—একটা ভালো শাড়ি পরো ত তুমি। আমার কাছে কিছু জমানো টাকা আছে, তা' আমি সঙ্গেই এনেছি, আমি কিনে আনি অজস্র ফুল,—তোমার বেণীতে, তোমার গলায়, তোমার হাতে পরাবো আমি ফুলের গয়না। সাদা সিল্কের শাড়ি তুমি পড়্‌বে, আমি সাজাবো তোমাকে সাদা ফুলে,—সাদা রজনীগন্ধার স্তবকে। ওরা তোমাকে দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে যাবে। ভাববে, এত সুন্দর! এত সুন্দর হয় মানুষে!

চিত্রাঙ্গীদের 'ব্যারাক্' পার হ'য়েই কোণ্ডা-নাগমণির ঝুপড়ী, এটা ওর জানা ছিল,—এবং আগে ওর যাওয়া দরকার ওদের ঝুপড়ীতে, কিন্তু চিত্রাঙ্গীর ঘরটা পার হ'তে না হ'তেই পিছন থেকে ছুটে এলো কোণ্ডা নিজে, বলল,—পণ্ডিত! কোথায় যাচ্ছ তুমি?

—তোদেরই কাছে, তোদেরই ঝুপড়ীতে।

—কেন! নাগমণি ত এখানে, ঐ ওর বন্ধুর ঘরে। সেই থেকে তোমার জন্য ঠায় ব'সে আছি দাওয়ার ওপরে। এসো।

চিত্রাঙ্গীর ঘরটা খোলা, দরজা দিয়ে আলোর আভাস পাওয়া যায়। কোণ্ডার পিছনে-পিছনে ঘরে ঢুকে প্রথমেই চোখ পড়ে নাগমণির ওপর। সামনে আসন, গেলাসে জল, আর পেতলের বড়ো একটা ঢাকা উপুড় করা রয়েছে,—তার পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ব'সে র'য়েছে নাগমণি। তাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো সে। ব'লে উঠল,—সেই কখন কোণ্ডাকে পাঠিয়েছি। এত দেরি ক'রে এলে পণ্ডিত?

কিন্তু ঘরে ঢুকেই যাকে সে দেখতে পাবে মনে ক'রেছিল, তাকে দেখতে না পেয়ে হঠাৎ একটা আশঙ্কা মনে জেগে ওঠে সোমনাথের, বলে,—ও' কোথায়?

নাগমণি বলে,—ও-ই ত আমার কাছে গিয়ে বলল তাড়াতাড়ি তোমাকে ডেকে আনতে। নইলে তুমি ত আর শীগ্‌গির-শীগ্‌গির আসবে না।

—কী হয়েছে বল ত!

নাগমণি ওর ব্যাকুলতা লক্ষ্য ক'রে ঠোঁট টিপে একটু হাসে, বলে,—কিছুই হয় নি। সারাদিন ব'সে ব'সে তোমার জন্য নানারকম রান্না করেছে। ইচ্ছা ছিল, নিজে বসিয়ে তোমাকে খাওয়াবে। তা' আর হলো না। ওর হ'য়ে আমিই ব'সে আছি। এসো, খেয়ে নাও।

তখনো দুষ্টুমি যায় না নাগমণির, হেসে বলে,—বামুনের ছেলে ওর হাতের রান্না খাবে ত?

—কিন্তু ও' কোথায়, বল্ না?

নাগমণি বলে,—আগে ব'সো এসে আসনে, তবে বলব।

—না, আগে বল্।

—বাব্বাঃ! সব শেয়ালের এক রা। একটুও যদি তর সয় পুরুষ মানুষের। পণ্ডিত, ও' এক জায়গায় গেছে, অনেকক্ষণ গেছে, এখুনি ফিরবে। তুমি ব'সো দেখি, খেয়ে নাও। ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে বোধহয় খাবারগুলো। ও' এসে যদি দেখে তুমি খাওনি, ভয়ানক রাগ করবে।

এই সময় দরজার কাছ থেকে কোণ্ডা হেঁকে বলে,—আমি যাই নাগমণি, ঝুপড়ীতে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

সোমনাথ বাধা দিয়ে ব'লে ওঠে,—দাঁড়া কোণ্ডা।

—কী?

ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সোমনাথ, ওর হাতে দেয় লছমীর দেওয়া সেই থলিটা, বলে,—আসবার সময় লছমী এটা দিয়েছে। ব'লেছে তোকে দিতে। তোর সমস্ত পাওনা পয়সা আছে এতে।

মুহূর্তে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে কোণ্ডার মুখ, থলিটা চোখের সামনে উঁচু ক'রে ধ'রে সে ব'লে ওঠে,—দেখলি নাগমণি, কতো পয়সা! আমি জানি, ও যতই রাগ করুক, ফাঁকি দিতে আমাকে পারবে না।

—সেটা বুঝেছিস্ ত ?—নাগমণি বলে,—এবার যা। ওর কাছে গিয়ে ব'লে আয়।

—ব'য়ে গেছে আমার বলতে। আমি গিয়ে ঝুপড়ীতে শুয়ে পড়লুম। পণ্ডিত, জমানা বদল গিয়া। নইলে, যখন চাইলুম, তখনই আমার হাতে থলিটা দিয়ে দিলে হ'তো। তা' না, মিথ্যে রাগারাগি।

বলতে বলতে ঘর থেকে দাওয়ায় চলে যায় কোণ্ডা, তারপরে দাওয়া থেকে রাস্তায়। সিনেমায় শোনা কী একটা হিন্দী গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ঝুপড়ীর দিকে চ'লে যায় কোণ্ডা।

স্তব্ধ হ'য়ে ওর চলার পথের দিকে সোমনাথ চেয়ে আছে লক্ষ্য ক'রে নাগমণি পিছন থেকে ব'লে ওঠে,—তুমি অবাক্ হচ্ছো, না পণ্ডিত ?

একটু অপ্রতিভ হ'য়ে সোমনাথ ব'লে ওঠে,—অবাক্ মানে···হ্যাঁ, তা' একটু···

—অবাক্ হবারই কথা !—নাগমণি ব'লে,—কিন্তু ও-যে পাগল। ওর নিজের মন ও' নিজেই কী জানে। আসলে ও' কী জাতের পুরুষ জানো ? ভয়ানক খেয়ালী। নিজের খেয়াল নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আমরা যে যখন কাছে থাকবো, তাকে নিয়েই মেতে উঠবে। নিজে থেকে ভালবাসতে ওরা পারে না, ভালবাসা ওদের কাছ থেকে আমরা আদায় ক'রে নেই। এদিক্ দিয়ে ওরা শিশুর মতো, মেয়েরা ইচ্ছা মতো ওদের গ'ড়ে নিতে পারে। আমি ওকে গ'ড়ে তুলব পণ্ডিত,—এ' গড়ায় মজা আছে।

নাগমণির চোখের দিকে তাকায় সোমনাথ,—এ' মেয়েও ত ছিল চঞ্চল, অস্থির। আজ এত ধীরতা, স্থিরতা ওর মধ্যে এলো কেমন ক'রে ? এ-ও ভালবাসার প্রকাশ, ভিন্নতর রূপে ? হয়ত তাই। 'হয়ত' কেন, নিশ্চয়ই। নইলে নাগাস্বুদের নাচিয়ে-মেয়ে রজকের সঙ্গে মিশে কাপড় কাচার কাজ নিলো কী ভাবে, হাসিমুখে ?

—ভাবছ কী পণ্ডিত ? এসো, ব'সো।

—বসছি।

আসন গ্রহণ ক'রে খাওয়া শুরু করে সোমনাথ, বলে,—তোরা খেয়েছিস্ ?

হেসে ওঠে নাগমণি,—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমাদেরও এখানে নেমন্তন্ন ছিল। তবে এত রাত্তির অবধি না খেয়ে ব'সে থাকব নাকি ? আমি চিত্রাঙ্গীকেও জোর ক'রে খাইয়ে দিয়েছি। নইলে ও-ও গোঁ ধ'রেছিল।

—বেশ ক'রেছিস্।

অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধতায় ভরে যায় সোমনাথের মন। এই যে খাবার, এই যে খাবারের প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন, এ' তৈরি ক'রেছে ও' নিজের হাতে। ওর কথা মনে ক'রেছে, আর রান্নার কাজ ক'রে গেছে একমনে। পরিপাটি ক'রে সাজানো থালার দিকে তাকিয়ে ওর মনে হচ্ছে,—এ' ত মাত্র খাবার নয়, এ' শিল্প। একজনের ভালো-লাগা, একজনের ঐকান্তিক যত্ন আর নিষ্ঠায় এর সৃষ্টি !

—কী ভাবছ পণ্ডিত ?

—ভাবছি, খাওয়া ত হ'য়ে এলো, কিন্তু ও-ত এলো না এখনো।

মুখ টিপে টিপে হাসে নাগমণি, বলে,—ভালো লাগছে না, না ? ও' থাকলে খুব ভালো হ'তো। ওর ত সেই ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু থাকতে ও' পারল না কিছুতেই।

—কোথায় গেছে রে নাগমণি ?

নাগমণি বলে,—সে পরে শুনো'খন। আগে খেয়ে নাও দেখি।

খাওয়া শেষ ক'রে একসময় উঠে দাঁড়ায় সোমনাথ, বলে,—কোণ্ডা একটা বাক্স এনে তোর কাছে দিয়েছে ?

—হ্যাঁ। তোমার বাক্স বুঝি ?

—হ্যাঁ।

নাগমণি আবার হাসে, বলে,—ঐ দেখ তোমার বাক্স, আমার বন্ধুর বাক্সর ওপরে রেখে দিয়েছি। যাও, ভিতরে যাও। আলো আছে, হাতমুখ ধুয়ে এসো।

ভিতরেও একটা বারান্দা। বারান্দার নিচে ছোট্ট উঠোন। বারান্দার একপাশে নর্দমার ধারে এক বালতি জল আর একটা পরিস্কার তোয়ালে রাখা আছে, আছে সাবানটি পর্যন্ত।

নাগমণি ওর উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি নিয়ে উঠানে নামিয়ে রেখেছে ততক্ষণে, বলে,—সব ও' নিজের হাতে ক'রে গেছে। বাক্স থেকে বার করে রেখে গেছে ঐ তোয়ালে, ঐ সাবান। বালতির জলটি পর্যন্ত নিজের হাতে তুলে রেখে গেছে। তুমি ঘরে গিয়ে ব'সো, আমি যাচ্ছি।

বিছানার প্রান্তে এসে বসে সোমনাথ। ঠিক তেমনি আজও ধূপ পুড়ে পুড়ে উর্ধ্বমুখী হ'য়ে দেবতার পায়ে গিয়ে প্রণাম জানাচ্ছে। নাগমণি ঘরে এসে ওর হাতে দেয় পান, বলে,—এ-ও সেজে রেখে গেছে ও' নিজে।

—কোথায় গেছে বলবি না ?

মুহূর্তে একটা কালো ছায়া যেন খেলে যায় ওর উজ্জ্বল মুখখানার ওপর দিয়ে, নাগমণি বলে,—গেছে কাঁচঘরে।

—কাঁচঘর !

—হ্যাঁ।

বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন মোচড় দিয়ে-দিয়ে উঠতে থাকে। অস্বাভাবিক কিছুই নয়, ও তা' জানেও, শুনেছেও কতবার, কিন্তু আজ ও যেন এটা ঠিক মেনে নিতে পারছে না ! সেই মুখ, সেই ঠোঁট, সেই কেশবন্যা, সেই দুটি হাত, সেই দুটি গভীর চোখের দৃষ্টি ! কাঁচঘরে গিয়ে মাত্র কিছু টাকার জন্য অন্য কোনো পুরুষের বাহুলগ্না হয়েছে, এ' যেন কল্পনাতেও সহ্য করতে পারে না সোমনাথ !

নাগমণি ধীরে ধীরে ওর কাছে আসে, বলে,—ভেবো না, এখুনি আসবে। তুমি বসে থাকো, আমি যাচ্ছি, কেমন ?

যেন অবসন্নতা থেকে অকস্মাৎ জেগে ওঠে সোমনাথ, বলে,—অ্যাঁ ! তুই যাবি ?

—হ্যাঁ—নাগমণি বলে,—ওর সঙ্গে দেখা না ক'রে পালিয়ে যেও না। কাল ও মাণ্ডুলায় যাবে মায়ের কাছে। যাবার আগে ও যদি অন্ততঃ চোখের দেখাটিও তোমার না পায়, ত, ঠিক ম'রে যাবে!

—নাগমণি?

—কী?

—কাঁচঘরে গেল কেন?

—কেন আবার! টাকা। কাল মার কাছে যাবে, হাতে টাকা চাই না?

ঈষৎ উত্তেজিত হ'য়েই ব'লে ওঠে সোমনাথ,—টাকার জন্য···

বাধা দিয়ে ব'লে ওঠে নাগমণি,—আমাদের ত চেনো তুমি, আমরা নাচিয়ে-মেয়ে।

আবার শান্ত হ'য়ে যায় সোমনাথের কণ্ঠস্বর, বলে,—হ্যাঁ রে, এটা হ'তে পারে? একজনকে ভালবাসবার পরেও···

তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে নাগমণি,—কখনো হয় তা! যখন হয়, তখন যে সেটা কী যন্ত্রণার বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়, তা' তোমরা বুঝবে না পণ্ডিত!

—কিন্তু ইচ্ছা ক'রে কেন এ' যন্ত্রণার ফাঁস তোরা গলায় পরিস্ বল্ ত?

—ইচ্ছা ক'রে!—বাঁকা হাসে নাগমণি—ইচ্ছা ক'রে বিষ কী কেউ খায়, পণ্ডিত! কিন্তু থাক্ এ' সব কথা। ঐ যে ঘরের মালিক এসে প'ড়েছে, আমি যাই।

ধীরে ধীরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় চিত্রাঙ্গী, পরনে নীল একটা শাড়ি, কেমন যেন অবসন্ন ওর দাঁড়াবার ভঙ্গী। কিছুক্ষণ সব ভুলে নিষ্পলক চেয়ে থাকে সোমনাথের দিকে, কোনো কথা বলতে পারে না।

খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে নাগমণি, বলে,—নে, কাছে যা। অনেকক্ষণ তোর জিনিস আগলে বসেছিলাম, এবার চললাম, নিজেরটা নিজে বুঝে নে শীগ্‌গির।

বলেই ওকে একটু ঠেলে ঘরের মধ্যে এগিয়ে দেয় নাগমণি, তারপরে নিজে বাইরে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়, ব'লে ওঠে,—একেবারে খিল দিয়ে দে। দরজা খোলা পেয়ে কুঞ্জ ছেড়ে কেষ্টঠাকুর আবার হঠাৎ পালায় না যেন! আমি চললুম।

দরজায় খিলটা এঁটে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘুরে দাঁড়ালো চিত্রাঙ্গী, হাত দুটি পিছনে রাখা খিলটার ওপরে, কবাটে মাথাটা ছুঁইয়ে একটু হেসে দাঁড়িয়ে সে, স্নেহঝরা স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার দুটি চোখে, সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, খেয়েছ?

—হ্যাঁ।

কী অপরূপ তৃপ্তিই না ফুটে উঠ্‌ল চিত্রাঙ্গীর মুখে! আর কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ ঐ একইভাবে চেয়ে রইল সোমনাথের দিকে,—তারপরে একসময় যেন চমক ভেঙেই সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো সে, ত্বরিৎ পায়ে চলে গেল ভিতরে।

আর, স্থানুর মতো ব'সে রইল সোমনাথ খাটের ওপর। কী-এক অতর্কিত ব্যথার আঘাতে বুকের ভিতরটা টনটন ক'রে উঠ্‌ল হঠাৎ। ঐ ত ও' দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। ঐ ত সে দেখল ওর মুখ, ওর চোখ, ওর লীলায়িত দুটি হাত, ওর ছন্দোময় দেহভঙ্গিমা। যেখান থেকে এখন ও' ফিরে এলো, সেই কাঁচঘরে ওর ঐ হাত ত ধ'রেছে অন্য এক লোক, ওর দেহকে ত নিষ্পেষিত করেছে অন্য এক পুরুষ!

চিন্তা করতে গিয়ে মুহূর্তে ঘৃণায় শিউরে উঠল সমস্ত শরীব-মন। ইচ্ছা হলো, দরজার খিলটা খুলে এখ্‌খুনি সে ছুটে পালাবে: তার স্যুট্‌কেশটা হাতে নিয়ে একেবারে ষ্টেশনে, তারপরে গভীর রাতে যে ট্রেনটা আসে, সেটায় চ'ড়ে একেবারে পূর্বদেশে পাড়ি দেবে সে, বাংলাদেশে—কলকাতায়। বিরাট সহর নাকি সেটা, চেষ্টাচরিত্র ক'রে কোনো কাজ কী জুটিয়ে নেওয়া যাবে না সেখানে? কিম্বা, কোথাও না গিয়ে সে যদি ফিরে যায় তার ঘরে? এখানেই কোনক্রমে এর-ওর হাতে-পায়ে ধরে কোন চাকরী নিয়ে ঘরের ভাড়া

আর-সব ভাড়াটেদের ভাড়ার সঙ্গে মিলিয়ে তুলে দেয় কৃষ্ণবেণীর হাতে? না, তাতেই সমাধান হবে না সমস্যার। সে কাছে থাকলে আবার হয়ত তাকে ডেকে পাঠাবে কৃষ্ণবেণী। সে ফিরে যাবে, কিন্তু আবার ডাকবে। আবার লণ্ঠন-হাতে পার্বতী-মা এসে দাঁড়াবে তার দরজার গোড়ায়, বলবে,—ডাকছে তোকে!

আবার যেতে হবে তাকে। কুৎসার কথা ছেড়েই দেওয়া গেল, এম্‌নি ক'রে ক'রে একদিন যদি সত্যিই কোনো ঘটনা ঘটে যায়! সর্বনাশ? তার থেকে এখনই পালিয়ে যাওয়া ভালো।

উঠে দাঁড়িয়ে তার বাক্সটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সোমনাথ। কিন্তু বাক্স নয়, চোখ পড়ল দেওয়ালে টাঙানো গলায় মালা সেই শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিটির দিকে। নীচের জলচৌকিতে-রাখা ধূপদানটিতে। ধূপগুলি ততক্ষণে পুড়ে পুড়ে সব নিঃশেষ হয়ে গেছে, সমস্ত গন্ধ বিকীরণ ক'রে অবশেষে ভস্ম হ'য়ে প'ড়ে আছে ধূপ, ধোঁয়ার একটি ক্ষীণ শিখাও ওপরে উঠে আজ কৃষ্ণের পায়ে গিয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে না।

নতুন কয়েকটি ধূপ এখন জ্বালালে কেমন হয়? আবার সমস্ত ঘর ভ'রে উঠুক ধূপের সৌগন্ধে, ধোঁয়ার রেখা উঠে নৃত্যরতা দেবদাসীর প্রণামের মুদ্রার ভঙ্গীতে বিলীন হয়ে যাক দেবতার পায়ে।

কথাটা মনে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বেদনা আর উত্তেজনার অগ্নিশিখা নিভে আসে। ধীরে ধীরে শান্ত হ'য়ে আসে মন।

কী করছে ও' ভিতরে গিয়ে? দিয়ে যাক না কয়েকটা ধূপকাঠি, সে নিজের হাতে জ্বালিয়ে রাখবে ঐ ধূপদানীতে। কিছুক্ষণ থেকে ভিতরে জল-ঢালার ছল-ছলাৎ শব্দ শুনতে পাচ্ছিল, কলতলায় বোধহয় স্নান করছিল ও'? এখন আর শব্দ নেই, হয়ত স্নান ওর শেষ হয়েছে। কিন্তু রাত্তির বেলা এভাবে স্নান-করা কেন? বিশেষ ক'রে পথহাঁটার পরেই এসে স্নানের উদ্যোগ? যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়? ডেকে কিছু সে বলবে নাকি ওকে?

ভাবতে ভাবতে শ্রীকৃষ্ণের ছবি থেকে মুখ ফিরিয়ে ভিতরের দরজার দিকে তাকায় সোমনাথ, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কবাটের কাছে এসে দাঁড়ায় চিত্রাঙ্গী, সবে স্নান ক'রে এসেছে, গায়ে জামা নেই, কালো-রঙের একটা শাড়ী বেশ ক'রে জড়ানো। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে সে, বলে,—যাক্, চলে যাওনি তাহলে!

বলতে বলতে ভিতরে এসে ওর কাছে ঘেঁষে দাঁড়ায়, বলে,—চন্দ্রা কী বলে গেল শুনলে না?

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আবার হেসে ওঠে চিত্রাঙ্গী, বলে,—খিল দেওয়া আমার সার্থক হ'য়েছে, আমার কেষ্টঠাকুর চ'লে যায় নি।

সোমনাথকে তখনো নিরুত্তর, তখনো গাম্ভীর্যে অটল লক্ষ্য ক'রে হাসি থামিয়ে ওর মুখের দিকে একটু বিস্মিত হ'য়েই তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, বলে,—কী হয়েছে? কথা বলছ না যে?

নিজের টিনের সুটকেশটার দিকে আঙুল দেখিয়ে সোমনাথ বলে,—এটা কী বলো ত?

—বাক্স। ওমা, কার এটা? কে রাখল এখানে?

—আমার।

বলার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্গী একটু এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে বাক্সটা একেবারে বুকের কাছে চেপে ধরে অতি আদরের সামগ্রীর মতো, তারপরে উজ্জ্বল মুখখানা ওর দিকে ফিরিয়ে ব'লে ওঠে,—এবার থেকে এটা আমার কাছেই থাকবে ত!

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে এনে সোমনাথ বলে—সে ওর ভাগ্য। কিন্তু আমাকে যে বিদায় দিতে হবে।

মুহূর্তে মুখের ভাব পরিবর্তিত হ'য়ে যায় চিত্রাঙ্গীর, কিছু একটা আশঙ্কা ক'রে ভীত ত্রস্ত কণ্ঠে ব'লে ওঠে,—বলছ কী তুমি!

—হ্যাঁ। ঘর ছেড়ে দিতে হয়েছে, এবার দেশও ছাড়তে হবে।

—কেন!

সোমনাথ একটু হেসে সরে যায় খাটটার কাছে, বলে,—তুমি ক্লান্ত, তুমি বোসো, আমি তোমাকে সব বল্‌ছি।

ওর কাছ ঘেঁষে এসে বসে চিত্রাঙ্গী, সোমনাথ ব'লে যায় কৃষ্ণবেণীর কথা, প্রসঙ্গ শেষ ক'রে ব'লে ওঠে—বুঝলে ত? দূরে আমাকে যেতেই হবে। নিজের কথা আর কৃষ্ণবেণীর কথা থাক্, কাল লছমীর বিয়ে প্রকাশ রাওয়ের সঙ্গে। বিয়ে ত নয়, আত্মহত্যা। আমি চোখ চেয়ে দেখতে পারব না। তাই ভোরের ট্রেনেই আমি চ'লে যাব।

বিষণ্ণ, করুণ দুটি চোখ তুলে তাকায় চিত্রাঙ্গী, বলে,—কোথায়?

—আপাততঃ বিশাখপত্‌নম্। সেখানে কাজ না জুটলে একেবারে কলকাতা। তুমি আমাকে বিদায় দাও, এখন ষ্টেশনে গিয়ে বসে না থাকলে ভোরের ট্রেন ধরতে পারব না।

মুখখানা চকিতে অন্যদিকে ফেরায় চিত্রাঙ্গী, বোধহয় অতর্কিতে এসে-পড়া চোখের জল গোপন করার জন্যই। কয়েক মুহূর্ত পরে ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠেই সে ব'লে ওঠে, এমন ঘটা করে বিদায় চাইছ কেন, আমাকে কি তোমার বাঁধন ব'লে মনে হয়?

একটু থেমে সোমনাথ ব'লে ওঠে,—হ্যাঁ। নিবিড় বাঁধন। এমন ক'রে কোনদিন কেউ বাঁধেনি আমাকে! কী এক অদ্ভুত মায়ায় বাঁধা প'ড়ে গেছি,—কিন্তু এ'ত ভালো নয়। কোথায় এর শেষ? তার থেকে দূরে যাওয়াই ভালো।

ওর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে চিত্রাঙ্গী, বলে,—আমার কাছ থেকে মুক্তি চাও, তাই না? মুক্তি দেবো, মুক্তি নেবোও। কিন্তু, আজ তুমি কোথাও যেও না, আমি বড়ো ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, মনটাও বড়ো ব্যাকুল হ'য়ে প'ড়েছে মার জন্য। আমিও কাল সকালে যাব মায়ের কাছে। তারপর যা ইচ্ছা তোমার, তাই কোরো।

ওর কণ্ঠস্বরে অতি করুণ এক ভাব ফুটে উঠল, অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা

ভেসে উঠল চোখে-মুখে,—সোমনাথের মনটা মুহূর্তে ভরে গেল নিবিড় মমতায়,—সে ওর পাশেই ব'সে পড়ল খাটের ওপর, ওর কম্পিত, করুণ দেহমঞ্জরীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল উদ্বেলিত স্নেহে, বলল,—কী হয়েছে ?

দুটি আয়ত চক্ষু ভরে উঠল জলে, সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,—তুমি যেও না। ক্ষেত্রায়ার আরও গান আছে, সব তোমাকে শোনানো হয় নি।

—যাব না।

—থাকো। অনেক কথা আছে তোমাকে বলার, অনেক গান আছে তোমাকে শোনাবার।

ধীরে ধীরে নিজেকে সোমনাথের কোলের ওপর এলিয়ে দিলো চিত্রাঙ্গী, পরম তৃপ্তিতে দুটি চোখের পাতা বুজে বলে উঠ্ল,—আঃ!

ওর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কোমলকণ্ঠে সোমনাথ বলে,—আজ তোমার কী হয়েছে গো ?

একথায় আবার চোখের পাতা দুটি ভিজে ওঠে ওর, কান্নাভরা কণ্ঠে ব'লে ওঠে,—বড়ো কষ্ট হচ্ছে।

—কিসের কষ্ট ?

ম্লান একটু হাসি ফুটে ওঠে দুটি পাণ্ডুর ঠোঁটে, চিত্রাঙ্গী বলে,—সে তুমি বুঝবে না।

ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে সোমনাথ বলে,—তুমি বলো। আমি নিশ্চয়ই বুঝব।

উত্তরে তেমনি ম্লান হাসে সে, কিছু বলে না, শুধু সোমনাথের হাতখানা নিয়ে নিজের নিটোল বাহুর ওপর বুলাতে থাকে।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দ্বিগুণ মায়ায় ভরে যায় মন। মুহূর্তের জন্য হলেও, কার সম্বন্ধে তার ঘৃণা এসেছিল মনে ? কতো অসহায় ও। বন্ধু নেই, বান্ধব নেই,—তরুলতিকার মতো বনস্পতিকে আশ্রয় ক'রে যে উঠে দাঁড়াবে,—ঝড়-জলের

বিরুদ্ধে তাকে দাঁড়াতে হচ্ছে একা,—ওর নারীত্ব-সম্পদকে পর্যন্ত বেসাতি ক'রে আসতে হয় মাত্র কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে। ওর বাহুতে হাত বুলাতে বুলাতে হঠাৎ কী যেন লক্ষ্য ক'রে বাহুটি উঠিয়ে ধরে আলোর সামনে। একী! সারা গায়ে কালশিরার মতো দাগ! চমকে উঠে সোমনাথ বলে,—সারা গায়ে কালশিরা পড়ল কেমন ক'রে? কী হয়েছে আমায় সব খুলে বলো ত!

ধীরে ধীরে আবার চোখ মেলে তাকায় চিত্রাঙ্গী, ককিয়ে ওঠার মতো স্বরে বলে,—বড়ো ব্যথা হয়েছে। অন্য-অন্যদিন চন্দন মেখে শুয়ে থাকতুম। ক্ষেত্রায়ার পদে আছে,—আজ চন্দন নয় সখি, আজ এসেছে তোর প্রিয়তম তোর কাছে, তার সোহাগই হবে আজ তোর চন্দন। তুমি একটু হাত বুলিয়ে দাও সারা গায়ে, আমার সব ব্যথা দূর হয়ে যাবে।

ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠেই সোমনাথ বলে ওঠে,—কে করেছে তোমার এ অবস্থা?

ম্লান হেসে চিত্রাঙ্গী বলে,—যে আজ এসেছিল, সে একেবারে দৈত্যের মতন। দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করেছি। আর তুমি কিছু শুনতে চেওনা গো, একটু হাত বুলিয়ে দাও।

পার হয়ে যায় নীরবে কয়েক মুহূর্ত। তার কোলে মাথা রেখে অতি আরামে তন্দ্রাভিভূতের মতো বিছানার ওপর পড়ে আছে চিত্রাঙ্গী। বড়ো মায়া হ'তে লাগল, বুকের ভিতরটা সমবেদনায় টনটন করে উঠল সোমনাথের,—একী অদ্ভুত জীবন ওর?

কিছুক্ষণ পরে আবার চোখ মেলে চিত্রাঙ্গী, ওর কোল থেকে মাথাটা নামিয়ে নিয়ে ওর হাতখানা ধরে কোমলকণ্ঠে ব'লে ওঠে,—অনেক রাত হয়ে গেছে। তুমি শোও। আমার পাশটিতে শুয়ে থাকো।

—না। যেমন শুয়েছিলে, তেমনি ক'রে শোও আমার কোলে, আমি জেগে থাকব সারারাত।

—কেন !

—তোমাকে দেখব।

—কী দেখবে গো ?

—দেখব ? ঘুমিয়ে পড়বে তুমি। তোমার নিমীলিত চোখের পাতা ঢেকে দেবে তোমার চোখ, চোখের ঘনপল্লব স্থির হ'য়ে থাকবে ফুলের-ওপরে-বসা প্রজাপতির পাখার মতো। স্বপ্নের ঘোরে হয়ত বা কাঁপবে সেই চোখের পাতা, কাঁপবে তোমার ঐ ঠোঁট দুটি। চেয়ে চেয়ে দেখব তোমার নিঃশ্বাসের ছন্দে ছন্দে বুকের ওঠা-নামা, আর ভাবব,—একবার ক'রে নিঃশ্বাস পড়ছে, আর মহাকালের জপমালায় একটি একটি ক'রে জপ সারা হচ্ছে !

অবাক্ হ'য়ে চিত্রাঙ্গী শুনছিল ওর এই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর, দুটি উজ্জ্বল চোখ মেলে ব'লে উঠল,—এতো ভালবাসো তুমি আমাকে, অথচ আমারই কাছ থেকে চাইছ মুক্তি,—চ'লে যেতে চাইছ আমাকে ছেড়ে !

—ভালবাসি ব'লেই মুক্তি চাইছি। এই যে একজনের চোখের দিকে আরেক জনের পিপাসিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, এই যে একের জন্য অপরের হৃদয়ের স্পন্দন,—এ'যদি একদিন হারিয়ে যায়,—সেদিন এই দিনগুলিকে ফিরে চাইলেও পাব না, সে মর্মান্তিক যাতনার চাইতে সরে যাওয়াই ভালো নয় কী ?

ওর হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে চিত্রাঙ্গী বলে,— হারিয়ে যাবে, এ'কথা ভাবলে কী ক'রে ?

—আমার তা-ই অনুক্ষণ মনে হয় গো। আমার ভাগ্যে কিছু পাওয়া সয় না, সব আমার হারিয়েই যায়।

—নাও যেতে পারে। পার্থসারথীর কী যে ইচ্ছা, কেউ কি তা' জানে ? অতো ভেবো না, শুয়ে পড়ো। কতো রাত আমার না-ঘুমিয়ে ছট্‌ফট্ ক'রে কাটে, কতো রাত কেঁদে কাটাই, তুমি পাশে থাকো,—আমি আজ একটু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে বাঁচি।

সস্নেহে সোমনাথ বলে,—ঘুমোও। আমি আছি।

হাতখানা বাড়িয়ে সোমনাথের মুখের ওপর বুলাতে বুলাতে চিত্রাঙ্গী বলে,—দেবতা আমার, আমার ঘরে আজ তোমার প্রথম রাত্রি, তোমার ত অর্চনা করতে পারলাম না, এযে বাসি ফুল, কেমন ক'রে তোমার পায়ে দেবো আজ?

—ছিঃ! আমি কি পাষণ্ড? ঘুমোও তুমি।

—কাল সকালে যাবে ত আমার সঙ্গে মায়ের কাছে? মার জন্য মনটা বড়ো কেমন করছে গো! কিছু হয়নি ত মায়ের?

—অতো ভেবো না। আচ্ছা, কথা দিলাম। তোমার সঙ্গে যাবো। এবার ঘুমোও দেখি?

ওর পাশে ব'সে ব'সে সারারাত সত্যিই প্রায় জেগে কাটিয়ে দিলো সোমনাথ। অদ্ভুত ভালো লাগছিল ওর ঘুমন্ত মুখখানা। পরম নির্ভরতায় ওর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে, দুটি হাত কোলের কাছে জড়ো করা। ভালবাসার মূর্তিমতী বাণীরূপ যেন এক ছন্দ-চরণের মতো পড়ে আছে তার সামনে। একে দেখতে দেখতে আরও একজনের কথা মনে হয়। এ'যদি এমন অতর্কিতে তার জীবনে না এসে পড়ত, তাহ'লে কৃষ্ণবেণীর আহ্বান উপেক্ষা করা হ'তো কী সম্ভব? হয়ত অবাঞ্ছিত কোনো সংসর্গ গড়ে উঠতো উভয়ের মধ্যে। একে পাওয়ার মূলে আছে নাগমণি, নাগমণির পরিচয়েরও মূলে আছে লছ্‌মী। তার ত কালই বিয়ে, আজ রাতটা তার কেমন ক'রে কাট্‌ছে কে জানে! নতুন এক জীবন—নতুন এক পরিবেশ—ও' কী মানিয়ে নিতে পারবে?

ভোরের দিকে কখন যে বালিসে মাথা দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সোমনাথ কে জানে, হঠাৎ দরজায় কার ঘন ঘন করাঘাতের শব্দে ঘুমটা তার ভেঙে গেল। চিত্রাঙ্গী তার বুকের ওপর হাতখানি রেখে তখনো ঘুমুচ্ছে অঘোরে,—সন্তর্পণে তার হাতখানি সরিয়ে রেখে

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো সোমনাথ, এগিয়ে গিয়ে খুলে দিলো দরজা। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকলো নাগমণি, ত্বজনের দিকে চকিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তরলকণ্ঠে বলে উঠল,—খুব ঘুম হচ্ছিল ত্বটিতে মিলে, এদিকে আমি যে চেঁচিয়ে মরছি, সেদিকে কান নেই!

—কী ব্যাপার? কোণ্ডার খবর কী? লছমীর?

—লছমীর বিয়ে দশটার সময়। কী যে বিয়ে বাপু। কোথায় কার বাড়িতে যেন গাড়িতে ক'রে যাবে, তার সামনে নাকি ত্বজনে একটা কাগজে সই করবে, আর হয়ে যাবে বিয়ে! একথা শুনেই ক্ষেপে গেছে কোণ্ডা,—ওদের দলের লোকগুলো নোকন্নাসর্দারের চার পাশে মুখ চুন ক'রে বসে ছিল, তাদের একে-তাকে ধ'রে মারে আর কী! আমি তো সামলাতেই পারি না, শেষে লছ্‌মী নিজে ওর হাত ধরে টান দিয়ে সরিয়ে নিয়ে আসে, বলে,—'এখনি চলে যা। যদি কোন দিন এ বাড়িতে আসিস্ ত অতি বড় দিব্যি রইল!'—বলব কী পণ্ডিত, অতো রাগ মুহূর্তে জল হ'য়ে গেল, মাথা নীচু করে চলে এলো ঝুপড়ীতে আমার সঙ্গে। বলে,—ওদের দলে যাবে না। এখানেই কাপড় কাচবে—একা। শুধু আমি থাকব ওর সঙ্গে। ওদের ডাইক্লিনিং-এর বিপক্ষে ও—একাই রুখে দাঁড়াতে চাইছে। তা' মন্দ হবে না পণ্ডিত! আমিই ওকে গ'ড়ে তুলব। দেখা যাক্ না, এ জীবন আমার কেমন হয়!

বাইরের আবছা আলোয় কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, সে সাড়া দিয়ে উঠল এক সময়। একটু চমকে উঠল নাগমণি, তারপরে লোকটিকে উদ্দেশ ক'রে বলে উঠল,—এগিয়ে এসো। এ-ই বাড়ি।

—কী ব্যাপার!

—পোষ্টাপিসের লোক। চিত্রাঙ্গীর চিঠি নিয়ে ঘুরছে। খুব জরুরী বোধ হয়। একেবারে সাইকেলে ক'রে এসেছে। দেখ ত পণ্ডিত?

চিঠি নয়, টেলিগ্রাম। সই ক'রে টেলিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি

খামটা খুলে ফেলল সোমনাথ। 'Mother seriously ill, come immediately.'—Ratnam.

কে এই রত্নম্ কে জানে, চিত্রাঙ্গীর মার খুব অসুখ বলে টেলিগ্রাম ক'রেছে।

—কী ব্যাপার পণ্ডিত ?

—ওর মায়ের খুব অসুখ। এখ্খুনি যেতে হবে।

ততক্ষণে বিছানার ওপর উঠে বসেছে চিত্রাঙ্গী। ওদের শেষ কথাগুলি কানে গেছে তার। কেমন বিহ্বল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে ওদের দিকে। টেলিগ্রামের খবর আরেকবার শুনেও তার বিহ্বলভাব গেল না, ব'লে উঠল,—আমি জানি মা আর বাঁচবে না!

—কী বলছো তুমি। অসুখ হয়েছে। চলো, তাঁর কাছে চ'লে যাই।

—চলো। চন্দ্রা, ঘর-দোর দেখিস। পারিস ত এখানে এসে থাকিস। আমরা যাই।

সোমনাথ ওর হাত দুটো ধ'রে বলে,—অমন করছ কেন! কিছু ভাববার নেই।

ডুকরে কেঁদে উঠল এবার চিত্রাঙ্গী, বলল,—ভোরবেলা স্বপ্ন দেখলাম,—গোদাবরীতে বন্যা হ'য়েছে, ঘরদোর সব ভেসে গেছে,—আমার মা-ও গেছে সেই জলে ভেসে। মা আর নেই!

চিত্রাঙ্গীর স্বপ্ন যে এভাবে সত্যি হবে, সোমনাথ তা কখনো ভাবতে পারে নি। নরশাপুরমে নেমে যেতে হ'লো,—বাস্-এ ক'রে। আবার বাস্ থেকে নেমেও কিছুটা হেঁটে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে প্রাচীন এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সমস্ত পরিবেশের মধ্যেই একটা প্রাচীনত্ব রয়েছে! কোন এক প্রাচীন রাজবংশের প্রাচীন পরিত্যক্ত গড়, পার্থসারথীর মন্দির, লোকজনেরও অভাব নেই, যাত্রীসমাগম আর মেলার সমারোহ নাকি লেগেই আছে। পাহাড়ে নাকি কী এক মূল্যবান ওষধির চাষ

হয়, সেই ওষধির রপ্তানী-ব্যবসায় উপলক্ষ্যে এখানে কিছু বিদেশীরও বাসস্থান হয়েছে। মারোয়াড়ীই বেশী, কিছু ভাটিয়া, এমন কি সিন্ধীও আছে। মন্দিরের নীচে কিছুটা পথ পার হ'য়ে এসে একটা গলির মধ্যে একটা ব্যারাকের মতো বাড়ি। ভিতরের চৌকো উঠোনের চারপাশে খুপরী খুপরী ঘর,—তারই একটা ঘরে শেষশয্যায় নিশ্চল শুয়ে আছেন বসন্ত্কোকিলম্। ওরা এসে পড়বার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁকে ঘিরে কয়েকটি মেয়ে কাঁদছে। ঘরের বাইরের দাওয়ায় উবু হ'য়ে বসেছিলেন গ্রামের প্রাচীন কবিরাজ, আর যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল, সেই 'রত্নম্' বলে লোকটি।

বসন্ত্দেবী চিত্রাঙ্গীরই মা বটেন। রূপ যেন ফেটে পড়ছে,—মৃত্যু এসেও যেন হরণ করতে পারে নি সেই রূপ। দু'চোখ বেয়ে শেষ সময় শুধু জল ঝরেছিল অবিরল, কোনো কথা বলতে পারেন নি। বোধহয় মেয়েকেই খুঁজছিলেন তিনি। দু'দিন ধ'রে সম্পূর্ণ বাক্রোধ হ'য়ে গিয়েছিল। প্রথম-প্রথম জ্বর আর সর্দি, বুকে ব্যথা। তবু তানপুরায় হাত দিতে ভোলেন নি। কিন্তু শেষ দু'দিন তা' পারেন নি, শুধু নীরবেই কেঁদেছেন, সুর ছিল যাঁর চিরজীবনের সাধনা, সেই সুর তাঁকে ছেড়ে গেল শেষ সময়,—এ মর্মান্তিক যাতনাই হয়ত তাঁকে দ্রুত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

সমস্ত দিন কেটে গেল তাঁর শেষ কাজটা করার মধ্য দিয়ে,—রাত্রের বিষণ্ন অন্ধকারে ঘরে প্রদীপ জ্বেলে যখন ওরা দুজনে পাশাপাশি বসতে পারল,—তখন সমস্ত ভিড় কেটে গেছে। মার বাক্স খুলে মার একটা ফটো নিয়ে এলো চিত্রাঙ্গী। তানপুরা নিয়ে গান গাইছেন, সেই অবস্থার ছবি, যুবতী বয়সের তোলা। একেবারে মেয়ের মতো। হঠাৎ দেখলে চিত্রাঙ্গীর ছবি ব'লে ভ্রম হয়।

চিত্রাঙ্গী বলে,—মার নাম দিয়েছিল ওরা বসন্ত্কোকিলম্। এত সুন্দর ছিল তাঁর গলা। আমাদের জীবন ত বুঝতেই পারো, মার গান শুনে এক রাজবংশের ছেলে মাকে নিয়ে চ'লে যায়। আমি

তখন আট-ন' বছরের মেয়ে, এখানেই থাকি, নাচ-গান শিখি। মাঝে মাঝে মা আসতো আমাকে দেখতে মোটরে চড়ে সেই ভদ্রলোককে নিয়ে। তারপরে সব ছেড়েছুঁড়ে একদিন মা চলে এলো এইখানে। মার তখন গানে কতো খ্যাতি। ইচ্ছা করলে অনেক রোজগার করতে পারত। কিন্তু পার্থসারথী যে ওকে ডেকেছিল, তাই শেষ সময় পর্যন্ত কেবল পার্থসারথীকেই গান শুনিয়ে গেল।

—তুমি শেষ সময়টা দেখতে পেলে না, এইটেই দুঃখ।

কেঁদে উঠল চিত্রাঙ্গী, বলল,—বড়ো ইচ্ছা ছিল তোমাকে দেখাবার, তা' আর হ'লো না। চিঠিতে তোমার কথা শুনে কতো আশীর্বাদ ক'রেই না পাঠিয়েছে। এ দুঃখের দিনে তুমি যেন আমাকে ছেড়ে যেও না।

—না গো।

—মা খুব ব্রত-ট্রত করত। আমাকে সে-সব করতে হবে। আমি এখানেই থাকব, বুঝলে? আর কী, মা রইল না, কোনো বন্ধনই রইল না। যাব না ফিরে, আমার কাজ আমি এখানেই করব।

—বেশ ত।

—তুমিও থাকবে, কেমন? এ বাড়ীতে এক রত্নম্-দাদা ছাড়া কোনো পুরুষ থাকে না, তবে ওকে আমি ব'লে দেবো, তোমার থাকার কোনো অসুবিধা হবে না। রত্নম্-দাদা আমাকে খুব ভালোবাসে, ছোট থেকে দেখেছে কিনা!

—তুমি এবার শুয়ে পড়ো ত? আমি বাইরে একটা মাদুর পেতে শুচ্ছি।

—না। এখানে বাইরের বারান্দায় শুতে নেই। ভিতরেই এসে শোও।

—বাইরে শুতে নেই! কেন?

—বোঝো না কেন? বাইরে মেয়েদের ভিড়। ওরা লজ্জা পেতে পারে।

—ও।

দুঃসহ দুঃখের রাতও কেটে যায়। আসে সকাল, আবার আসে রাত। এমনি করে দিন কেটে যায়—আস্তে আস্তে সবকিছু সয়েও আসে। প্রথম-প্রথম কোণ্ডা-নাগমণি-লছ্‌মী-কৃষ্ণবেণী-পার্বতী-মা, ওদের কথা খুব মনে পড়ত আর কষ্টও হতো। ক্রমে মন ব'সে যায় জায়গাটায়, বাইরের জগতের সব-কিছু ভুলে নেশাচ্ছন্নের মতো আবিষ্ট হ'য়ে থাকে সোমনাথ চিত্রাঙ্গীর জীবনটাকে নিয়ে। ওর বিচিত্র জীবন আর মনটাকে বুঝতে বুঝতেই যেন দিনের পর দিন যাচ্ছে কেটে,—মাধুর্যও আছে, জ্বালাও আছে, আনন্দও আছে, বিষাদও আছে।

মায়ের শ্রাদ্ধাদি চুকে গেছে বহুদিন। শোকের ধাক্কাটাকে কাটিয়ে অনেকটা সহজ হয়ে আসছে চিত্রাঙ্গী। বলে,—মা বলত, ভালো-বাসাটা হচ্ছে জীবনের সব কিছু সাধনার মূলে। সাধনার শুরুই হয় না ভালবাসা না হলে। এই সব মেয়েদের দেখছ ত? সবাই দেবদাসী। সকালে উঠে স্নান ক'রে পূজা-আর্চার যোগাড় করা, নিজের-নিজের পূজো শেষ ক'রে মন্দির ঘুরে এসে নাচ-গানের অভ্যাস করা, তারপরে রান্নাবান্না আছে যার যার। দুপুরে বিশ্রাম। বিকেল হ'লেই সাজের শুরু, তারপরে মন্দির। তিথি-বিশেষে মন্দিরে নাচ-গান, তারপরে রাত্রে অতিথি-সম্ভাষণ। লক্ষ্য করো নি এ'সব?

—তা' করেছি। ঘুমই ত ভাঙে গান শুনে। এ'ঘরে গান—ও'ঘরে গান। মাঝে মাঝে দু' একটা ভারি মিষ্টি গলা কানে আসে। একদিন সুর শুনে একটি ঘরের দিকে অন্যমনে এগিয়ে গেছি, মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখে হেসে উঠল, বল্‌লে,—ভুল করেছেন, আমি চিত্রাঙ্গী নই, আমি কমলা।

হেসে উঠল চিত্রাঙ্গী, বলল,—মার হাতে-গড়া শিষ্য। আলাপ করবে?

—না।

দুষ্টুমি ক'রে চিত্রাঙ্গী বলে ওঠে,—কেন, এই একটিকে ছাড়া আর কাউকে চিনতে চাও না বুঝি?

—না।

হেসে ওঠে চিত্রাঙ্গী, বলে,—কেন গো! সবাইকে জানো, চেনো, দেখো, এ জায়গাটা ভালো লাগবে।

—ভালো ত লাগেই।

—কেন?

—তুমি আছ ব'লে।

সমস্ত প্রগল্‌ভতা থামিয়ে মুহূর্তকাল চুপ করে থাকে চিত্রাঙ্গী, তারপর বলে,—ক্ষেত্রায়ার পদ মনে প'ড়ে গেল। গোপিকা বলছেন,—কদম্ববৃক্ষের ছায়া এত শীতল কেন সখি? কেন না, সে আছে ব'লে,—কদম্বতল তার প্রিয় ব'লে আমারও প্রিয় যে!···আহা গো, মা নেই, থাকলে মার মুখে তুমি ক্ষেত্রায়ার অনেক পদ শুনতে পেতে! আমি যে সব জানি না—অর্ধেক ভুলেই গেছি।

—বলো, মার কথা বলো, শুনতে বড়ো ভালো লাগে।

—মার কথা? মা বলতো, মার কাছে এমন একটা সুর আছে, যা এ দেশে খুব অপ্রচলিত, কিন্তু সেই সুর নাকি কমলাকেও মা দিয়ে যায় নি। কমলাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কমলা বলল,—মা ব'লে গেছে, ঐ সুর নিতে গেলে ব্রত পালন করতে হয়, ব্রহ্মচারিণী থাকতে হয়। কিন্তু সুর পেলে আর সংসারে মন বসে না।

কেটে যায় দিন। সোমনাথ একদিন এসে বলে,—জানো গো? এক মারোয়াড়ীর গদিতে চাকরী পেয়েছি, খাতা-লেখার কাজ, মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে দেবে আপাততঃ। বেলা একটা থেকে আটটা পর্যন্ত গদিতে গিয়ে বসতে হবে।

চিত্রাঙ্গী হাসে, বলে,—শেষে চাকরী! মন বসবে?

—বারে, কেন নয়? তাছাড়া, আমাদেরও ত চলা চাই।

—চলছে না নাকি আমাদের?

—মায়ের ঐ জমানো টাকা খরচা না হওয়াই ভালো।

শুরু হয় সোমনাথের চাকরী-জীবন। মন্দ নয়, প্রয়োজনও বটে, একটা অভিনবত্বের স্বাদও বটে। ফিরে এসে চিত্রাঙ্গীর কাছে গল্প করে চাকরী-জীবনের। চিত্রাঙ্গী সকৌতুকে সব শোনে, বলে,—প্রথম মাইনে পেয়ে আমাকে কী দেবে গো?

দিন যায় এভাবে। একদিন অফিসের পর ফিরে আসা মাত্রই চিত্রাঙ্গী ছুটে আসে কাছে, বলে,—জানো? চন্দ্রা চিঠি লিখেছে।

—কে, নাগমণি! কী লিখেছে? ও' কি লিখতে জানে নাকি?

—ওমা, কেন জানবে না, হয়ত তোমাদের মতো জানে না! কী লিখেছে শোনো? ওরা তুজনে কাপড় কাচার কাজই করছে, দলের সবাই অবশ্য প্রকাশ রাওদের ডাইক্লিনিং-এর কাপড়ই কাচে, এরা তুজনেই শুধু আগের মতো। লছ্মী ভালই আছে তার নতুন সংসার নিয়ে। তাকে আর বাইরে বেরিয়ে কাজ করতে হয় না, সে ঘরের কাজ নিয়েই ব্যস্ত, নোকন্নাও তার কাছে থাকে, দোকানের দেখাশুনা করে।—তারপরে জানো, কী হয়েছে?

—কী?

মুখ নামিয়ে সলজ্জ ভঙ্গিমায় চিত্রাঙ্গী উত্তর দেয়,—তোমাদের নাগমণি মা হ'তে চলেছে। চিঠির শেষে লিখেছে এই দেখ।

ওদের ঘরে তুপাশে তুটি আলাদা বিছানা। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর যথারীতি শুয়ে পড়েছে, চিত্রাঙ্গী এসে বসল ধীরে ধীরে, বলল,—খুসী হওনি চন্দ্রার খবর শুনে? মেয়েদেব জীবনে এর থেকে বড়ো পাওনা আর কী হ'তে পারে! এবার ও' সুখী হবে।

—আচ্ছা, চিত্রা?

—কী?

—সবাই পার্থসারথীর মন্দিরে যায়, তুমি যাও না কেন? এই যে সেদিন ওরা সবাই রাত্রে মন্দিরে গিয়ে নাচল, তুমি গেলে না কেন?

একটু অবাক্ হয়েই চিত্রাঙ্গী বলল,—তুমি জানো না?

—না ত!

—তোমাকে বলি নি।

—না।

একটু হাসে সে, বলে,—দেখ, কী ভুলো মন! আমার যে এক বছর অশৌচ পালন করতে হবে। মা মারা গেছে না? তাছাড়া…

ওর দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চিত্রাঙ্গী বলে,—মার ব্রত নিয়েছি যে। একটি বছর আমাকে সংযমে থাকতে হবে। সারা বছর জুড়ে তিথি দেখে পূজা করতে হবে অগ্নির। সেদিন তা করেছি রত্নম্‌দাদাকে ডেকে, তুমি তা জানো। পরশুদিন করব ব্রহ্মার। তারপর দিন দেখে করব সরস্বতীর পূজা, মহাদেবের পূজা, বিষ্ণুর পূজা, গণেশের পূজা এবং সবার শেষে সূর্যের পূজা।

—কেন গো!

—বারে, ওঁরা যে 'সারিগমপাধানি' এই সপ্তস্বরের অধীশ্বর। এঁদের পূজা করতে হয় আমাদের, শুধু গলা সাধলে আর নাচলেই হয় না।

—আর পার্থসারথী?

—তাঁর সামনেই ত বছর শেষে নাচব। বাইরের কারুর অধিকার নেই সে নাচ দেখবার, শুধু তোমাকে দেখাবো, নিয়ে যাবো তোমাকে।

সোমনাথ বলে,—মাঝে মাঝে অবাক্ লাগে তোমাকে দেখে! সেদিন 'ঠাকুর-ঠাকুর' ব'লে ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠলে, আমি গিয়ে ধরতেই বলে উঠলে,—আমাকে ছেড়ে দাও, পার্থসারথী আমাকে ডাকছেন! সত্যি চিত্রা, এক-এক সময় তুমি এমন ভাবে বিভোর হয়ে যাও! কথা বলতে বলতে হঠাৎ হ'য়ে গেলে অন্যমনস্ক, কোথায় কতো দূরে যেন চলে গেলে তুমি! মাঝে মাঝে তাই ত তোমাদের মন্দিরের ঐ ঠাকুরটির ওপর আমার হিংসে হয়!

খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে চিত্রাঙ্গী, বলে,—ঐ পাথরের ঠাকুরটির ওপর তোমার হিংসে হয়!

—পাথর কোথায়! ও'যে তোমাকে ক্রমশই গ্রাস করছে।

হাসি মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে, গম্ভীর হয়ে চুপচাপ কী যেন ভাবতে থাকে চিত্রাঙ্গী। তারপরে অদ্ভুত এক স্নেহঝরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ব'লে ওঠে,—খুব কষ্ট দিচ্ছি তোমাকে, না গো?

—কষ্ট! কষ্ট কেন?

মুখ নীচু ক'রে উত্তর দেয় চিত্রাঙ্গী,—এইভাবে এনে বেঁধে রাখলুম। একই ঘরে থাকি, লোকে জানে তুমি আমার প্রেমের ঠাকুর,—কিন্তু আমার আত্মদানের লগ্ন যে আজও এলো না! একে অশৌচ, তার ওপরে মার ব্রত নিয়েছি। উদ্‌যাপন না ক'রে আমি আত্মদান করব কেমন ক'রে?

সোমনাথ বলে,—এসব কথা না ভাবলেও চলবে। আমার অভাবটা কোথায়? নিজের হাতে আমার সব-কিছু করো, সেবাযত্ন কিছুরই ত্রুটি নেই।

চিত্রাঙ্গী হাত বাড়িয়ে ওর মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে,—খুব ভালোবাসো আমাকে, না গো? আমি দেখেছি, আমাকে বেশীক্ষণ না দেখতে পেলে তোমার চোখমুখ যেন কেমন হ'য়ে ওঠে! রাত্রে চাকরী থেকে ফিরে এসে যখন আমার নাম ধ'রে ডাকো দরজার গোড়া থেকে, তখন সে ডাকে যেন সুধা ঝ'রে পড়ে। যখন গান গাই, তন্ময় হয়ে সেই গান শোনো,—আমার মুখের দিকে অবাক্ হ'য়ে থাকো! হ্যাঁ গো, এমন সুধাঝরা দৃষ্টি তুমি পেলে কোথা থেকে!

সোমনাথ একটু হাসে শুধু, কোনো উত্তর দেয় না।

আরও দিন কাটে। নিজেকে লক্ষ্য ক'রে মাঝে মাঝে নিজেই অবাক্ হয়ে যায় সোমনাথ। তার সমস্ত চিন্তা আজ এই একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে। ওর কথা বলার ধরণ, ওর কণ্ঠস্বর, ওর চলার ছন্দ,—সবার মধ্যেই ও' যেন এক পরমাশ্চর্যকে খুঁজে পাচ্ছে। এক-একদিন কষ্ট হয় বই কী! একই ঘর, একই ছাদের নীচে দুজনে শুয়ে আছে, একটি প্রদীপের স্তিমিত আলোয় সব-কিছু স্বপ্নের মতো মনে

হয়! ঐ ত ও ঘুমিয়ে আছে পাশ ফিরে, দুটি হাত মুখের কাছে জড়ো করা। নিরুদ্ধ যৌবন মাঝে মাঝে সব বাঁধ ভেঙে দিতে চায়, কিন্তু না, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কী জানি কী ওর ব্রত, শেষ হোক তার উদ্‌যাপন। তবু রোজ দুটিবেলা চোখে দেখতে পাচ্ছে ত ওকে, ওর করপরশও পাচ্ছে, তবে? অভাবটা কিসের? ভাবতে ভাবতে মনটা আবার শান্ত হয়ে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে কী এক অদ্ভুত আনন্দে মনটা ভরে ওঠে!

এক-একদিন উত্তাল তরঙ্গ ওঠে চিত্রাঙ্গীর মনেও। ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে জেগে ওঠে সোমনাথ, দেখে ও' এসে বসেছে ওর বিছানায়, তাকে জড়িয়ে ধরেছে দু'হাতে, বলছে,—বড্ড ভয় করছে তার!

—ভয়!

অদ্ভুত এক আর্তকণ্ঠে চিত্রাঙ্গী বলে ওঠে,—হ্যাঁ, ভয়। তুমি নাও, নাও আমাকে। নইলে আর পাবে না, ঐ পাথরের ঠাকুরটি আমাকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নেবে তোমার কাছ থেকে!

—বলছ কি তুমি?

ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে চিত্রাঙ্গী, বলে,—ঐ পাথরের ঠাকুর আর তুমি ছিলে এক,—হঠাৎ দুজনে আলাদা হয়ে গেলে কেন! এ' আমি কী স্বপ্ন দেখলুম!

ওর মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ওকে শান্ত করে সোমনাথ, বলে,—আমি ত রইলাম, তুমি তোমার ব্রত উদযাপন করে নাও।

—হ্যাঁ গো, রাগ হয় না আমার ওপর!

—রাগ কেন?

—আমাকে চাবুক মারতে ইচ্ছা হয় না তোমার? আমাকে দু'হাতে ঠেলে ফেলে রেখে চলে যেতে ইচ্ছে করে না তোমার!

—কেন?

চিত্রাঙ্গী বলে,—আমার মতো নিষ্ঠুর কী সংসারে দুটি আছে? একঘরে তোমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম কেন? আমার ব্রত থাকতে পারে, কিন্তু তোমার কী? তুমি কেন এ সংযমের কষ্টকে বরণ করে নিলে?

সোমনাথ একটু থেমে বলে,—ভুল কথা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন স্বীকার করি, কিন্তু উত্তীর্ণ হবার পর যে কী আনন্দে মন ভ'রে ওঠে তা তুমি জানো না! আমার প্রেম দেহকে ছেড়ে এমনি করে আত্মাকে চিনতে শিখছে। এ'যে শেখার আনন্দ, আবিষ্কারের আনন্দ, এর কী তুলনা আছে?

এক-একদিন গান গাইতে গাইতে হঠাৎ গান থামিয়ে কাঁদতে শুরু করে চিত্রাঙ্গী। সোমনাথ কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, বলে,—আরে, কাঁদা কেন, হঠাৎ কী হলো?

আর্তকণ্ঠে চিত্রাঙ্গী বলে ওঠে, সুর ধরা দিচ্ছে না। এ ব্রত নিলাম তবে কিসের জন্য? তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখলাম তবে কিসের জন্য? সেই যে নতুন ঘরানার গান, যে-গান মা ছাড়া আর কেউ জানত না, সেই গান সেই সুর—মার সঙ্গে সঙ্গে কী এভাবে শেষ হয়ে যাবে? আমার সমস্ত সাধনা সেই গানকে ফিরে পাবার! কতো চেষ্টা করছি মনে করতে। কিছু মনে পড়ে, কিছু ভুলে যাই। কিন্তু আমাকে পারতেই হবে। মায়ের ইচ্ছায় আমি ঠিক পারবই, কী বলো?

—পারবে।

—কিন্তু কণ্ঠে যে মাঝে মাঝে সুর ফোটে না। এই ত দেখ না —ন্ধা পা ন্ধা পা ধা পা পা ধা নি—বৈয়ারী ভামা লোকপালনা— দেখলে ত? পঞ্চম সুরে বলছে না, স্বরে কয়েক শ্রুতি কম লাগছে। বলতে বলতে হঠাৎ কী রকম বিহ্বল হয়ে গেল চিত্রাঙ্গী, অন্যদিকে তাকিয়ে বলে উঠল,—পঞ্চম! মত্ত কোকিলের মতো আমাকে পাগল ক'রে দাও!

ব'লে আবার কাঁদতে থাকে।

এভাবেই দিন যায়। সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে যেন দুটি প্রাণী। একজন করে সঙ্গীত আর নৃত্যের সাধনা, আর একজন তন্ময় হ'য়ে তা লক্ষ্য করে। প্রিয়াকে তার যেন মাঝে মাঝে অশরীরী মনে হয়! মনে হয়, ওর যেন শরীর নেই, ও' যেন শুধু সুর—দৃশ্য-সঙ্গীত—সঙ্গীত যেন হঠাৎ রূপ পরিগ্রহ করেছে!

একদিন মেয়েটি বলে,—হ'য়ে এলো সময়। মন্দিরে নিয়ে যাব তোমাকে। নাচ দেখো আমাদের। কিন্তু তারপর! তোমাকে কিন্তু খুব সাজতে হবে। আমি তোমাকে নিজের হাতে চন্দন পরিয়ে দেবো। আর অজস্র ফুল আনব ঘরে। আমি পরব গোলাপী চেলি। ধূপের গন্ধে ভ'রে যাবে ঘর—ফুলে ফুলে ছেয়ে যাবে সব,—আমি ধীরে ধীরে আসব তোমার কাছে, তুমি আমার মুখখানা দু'হাতে তুলে নিয়ে যেন চমকে উঠবে বলবে,—এ কে? এ' চিত্রাঙ্গীকে ত কখনো দেখি নি! তারপর আমার আঁচলে পড়বে টান। আমি লজ্জা পেয়ে প্রদীপ দেবো ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে, তারপরে আসবে আমার আত্মদানের লগ্ন।

অবশেষে সত্যিই এলো ওর ব্রত উদযাপনের দিন। মধ্যাহ্ন থেকে শুরু হলো ওর সাজসজ্জা। বললে,—এসব কোনো পুরুষের দেখতে নেই। কিন্তু তোমাকে দেখাবো।

পায়ের তলায় কী এক হলুদ রঙের ফুল ঘসতে লাগল চিত্রাঙ্গী, নখে দিলো কী এক লালরঙের ফুলের রস। হলুদ মেখে স্নান করে এসেছে। কেশে দিলো ধূপের ধোঁয়া। কপালে আঁকল চন্দনের পুষ্পকলি। লালচন্দন—শ্বেতচন্দন। লাল টকটকে বেনারসী শাড়ী পরল একটা, পরল সিঁথিমৌর, বাজুবন্ধ, কটি মেখলা, পায়ে নুপূর, নাকে হীরের ফুল। আবরণে-আভরণে দ্যুতিময়ী হ'য়ে সে যখন মন্দিরে গেল, রাত তখন বারোটা বেজে গেছে।

এ এক অদ্ভুত পরিবেশ মন্দিরে। একেবারে পিছিয়ে একটা থামের আড়ালে চুপচাপ ব'সে রইল সোমনাথ। সামনে তার বড় বড়

থাম-দেওয়া নাটমণ্ডপ, মণ্ডপের শেষে মন্দির, দেবতাকে আজ ফুলের মালায় সাজিয়েছে ওরা। লোকজন নেই, জনকয়েক বাদক তাদের যন্ত্র নিয়ে বসে আছে থামের সারির সঙ্গে সারি মিলিয়ে। তাদেরও গলায় ফুলের মালা, মাথায়ও ফুলের মালা জড়ানো। দু'একজন পুরোহিত ঘোরাঘুরি করছেন এদিক-ওদিক। আর কোনো শব্দ নেই কোনোদিকে—অদ্ভুত নির্জন মনে হচ্ছে চারদিক—সব মিলিয়ে কীরকম এক পৌরাণিক পরিবেশ যেন! অজস্র প্রদীপ জ্বলছে নাটমন্দিরে—ধূপ আর ধূনোর গন্ধ ভরিয়ে রেখেছে সমস্ত মন্দির। হঠাৎ বাদ্যে জেগে উঠল সঙ্গীত—আর লাল শাড়ীপরা চিত্রাঙ্গীকে দেখা গেল নাটমন্দিরে—নৃত্যের আরতিতে সে মগ্ন হ'য়ে গেছে ততক্ষণে। তাম্-তিথাম্-তিথাম্-তাই! ক্রমে ক্রমে মনে হ'তে লাগল, পায়ের কাছ থেকে একটা হিল্লোল উঠে কটির দিকে আসছে,—বারে বারে উঠে আসছে হিল্লোল—বারে বারে বাধা পাচ্ছে—এক রণ শুরু হয়েছে যেন! পদসঞ্চালনে বারে বারে একটা ঢেউ জাগছে, কটিদেশ তাকে দিচ্ছে বাধা। কিন্তু কতক্ষণ! সেই আনন্দ-হিল্লোল একসময় জয় করল কটিদেশ, সে আনন্দে সমস্ত জঘন প্রদেশ যেন আত্মহারা হয়ে মুহুর্মুহু কম্পিত হতে লাগল—তারপরে সেই হিল্লোল এল বক্ষদেশে—আবার বাধা—আবার রণ—কিন্তু বুকও দিলো ধরা—আনন্দে পয়োধরও স্পন্দিত হতে লাগল ছন্দে ছন্দে, তারপর গ্রীবা, তারপর মুখ—দুটি ঠোঁট—দুটি চোখ—তারপর সমস্ত মুখমণ্ডল—তারপর সমস্ত সত্বা! সমস্ত সত্বাই যেন আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেছে! সব ভুলে গেছে যেন ও' সেই মুহূর্তে, ওর দেহ ওর মন···এই মন্দির—এই দেশ—এই পৃথিবী—এই বিশ্ব—সব যেন চেতনার রাজ্যে বিলীন হ'য়ে গেছে, জেগে আছে মাত্র একটি আনন্দের দৃশ্যসঙ্গীত—একটি দৃশ্যমান সুর! কিন্তু তারপর? ধীরে ধীরে আভরণ খুলে ফেলতে লাগল সে। গেল গলার হার, গেল শিরোভূষণ, গেল বাজুবন্ধ, গেল কটিমেখলা! তারপর? নিজেই নিজের শাড়ীর আঁচলে দিলো টান,

ঝড়ের ঘূর্ণির মতো নৃত্য-কম্পিত দেহ থেকে খসে পড়ল শাড়ী—খসে গেল কাঁচুলী—একটি প্রদীপশিখার মতো নিরাবরণ দেহটি শুধু জ্বলতে লাগল দেবতার সামনে—চারিদিকে ধূপের ধোঁয়া—প্রদীপের আলো—গায়কবৃন্দের মুখে তখন সঙ্গীত উঠেছে একটানা—"ওঁ"—"ও-ওম্" —"ও-ওম্"—দেখতে দেখতে চোখে জল এসে গেল সোমনাথের! এ কার চিত্রাঙ্গী ও'? একটি বিদ্যুৎশিখার মতো ঐ যে বাহ্যজ্ঞানরহিত নিরাবরণ দেহটি সমস্ত সত্তা দিয়ে বলছে—"ওঁ"—সে কার? কোনো মানুষের? বিশ্বাস হয় না। ঐ বিদ্যুদ্দীপ্ত দেহকে স্পর্শ করবে কোনো রক্তমাংসের পুরুষ? সাধ্য কী?

নিদারুণ বিস্ময়ে দুটি চোখ মেলে দেখতে লাগল সোমনাথ,—যেন কোনো এক অজানা জগতে এসে অকস্মাৎ উত্তীর্ণ হয়েছে সে! অনির্বচনীয় আনন্দে সত্তা এখানে ভ'রে ওঠে,—নিজের দেহের স্থূল অস্তিত্বটাকে পর্যন্ত বিস্মৃত হ'য়ে যেতে হয়! তাই, নৃত্যশেষে সঞ্চালিত বিদ্যুৎশিখাটি যখন দেবতার কাছে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেল, পুরোহিত এসে আবরিত করে দিলেন তাকে,—সোমনাথের মনে হ'লো, সমস্ত আলোক যেন নিভে গেল মুহূর্তে!

পরদিন চিত্রাঙ্গী বলল,—আমার নাচ দেখে কী মনে হ'লো তোমার, গো?

—মনে হলো? নাই বা শুনলে সে মনে-হওয়ার কথা।

ওর কাছে এসে দুহাতে ওর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে আবদারের ভঙ্গীতে ছেলেমানুষের মতো ব'লে ওঠে চিত্রাঙ্গী,—বলো না!

একটু হাসে সোমনাথ, কিছু বলে না। চিত্রাঙ্গী যা এতদিন করেনি, আজ তাই করে বসে, হঠাৎ চুম্বন মুদ্রিত করে দেয় ওর মুখে, বলে,—আমার ব্রত-উদ্‌যাপন হ'য়ে গেছে। আজ আমাদের প্রথম রাত্রি, মনে আছে ত কী-কী করতে হবে? খু-ব সাজতে হবে কিন্তু। কমলাকে চন্দন বাটতে বলেছি, ওরা বলেছে, ওরা গান গাইবে,

তোমাকে সাজাবে,—তখন কিন্তু "না" বলতে পারবে না, ব'লে রাখছি।

ভিতরটা একবার কেঁপে ওঠে সোমনাথের, কিন্তু পরমুহূর্তেই সেভাব দমন ক'রে সোমনাথ ব'লে ওঠে, ব্রত ত শেষ হ'লো কিন্তু যার জন্য ব্রত পালন করা, তার কী হ'লো? ফিরে পেলে মার সুর?

মুহূর্তের জন্য ম্লানিমায় ঢেকে যায় ওর মুখ, বলে, না। কিন্তু সাধনা করলে নিশ্চয়ই পাবো, পাবো না গো?

—পাবে।

কিন্তু বুকের ভিতরটা গুমরে গুমরে উঠতে থাকে সোমনাথের। যে সুরসাধনায় নেমেছে চিত্রাঙ্গী, তার সাধনা ত সহজ নয়। কমলা মেয়েটিকে নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন বসন্ত্‌দেবী, কিন্তু কেন সে পারলেনা শেষ পর্যন্ত? তার একান্ত শিল্প-সাধনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল তার নারীত্ব। কবে থেকে যে মানুষ সমাজ গড়ল, কবে থেকে যে সমাজের প্রভু হয়ে বসল পুরুষ, নারী হয়ে দাঁড়াল তার গৃহদাসী। ঘর সংসার আর সন্তান—এই নারীজীবনের সার্থকতা—একথা বার বার নারীকে বোঝাতে লাগল পুরুষ—আজ নারীও জানে তার জীবনের সার্থকতা মাতৃত্বে, সন্তান পালনে, আর ঘর সংসারের দৈনন্দিনতায়। একে যতই কাব্যের সুষমায় মণ্ডিত করা হোক না কেন—এর বাইরেও থাকতে পারে জীবন। এই ত দেবদাসীদের জীবন, এখানেও সমস্যা আছে, কিন্তু সমস্যার বাইরে থাকার পথও আছে। তার মার বধূ-জীবনের কথা ভেসে উঠল সোমনাথের মনে, কৃষ্ণবেণীর কথাও জেগে উঠল মনে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে উঠল মন,—না, না, চিত্রাঙ্গীকে সে ঘরের মোহে বেঁধে রাখবে না। যে সুর-সাধনায় সে নেমেছে, সে সুর আর কোথাও নেই, অন্ধ্র দেশের নিজস্ব এই সুর-সম্পদ যদি হারিয়ে যায়, সে সুর বহুকাল আগে দেবদাসীদের মুখে মুখে ফিরত, তার ধারা যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় ত তার চেয়ে বড় ক্ষতি কি হতে পারে? কমলা পারেনি ঐ রত্নম্ লোকটার জন্য। ওদের ভালবাসার

কথা সবাই জানে, ঐ লোকটিকে ভালবেসে তার ঘর করতে গিয়ে স্বরলোক থেকে চ্যুত হয়ে পড়েছে কমলা—যদি চিত্রাঙ্গীরও তাই ঘটে ?

তারপরে, ধীরে ধীরে বিকেল শেষ হ'য়ে সন্ধ্যা নামতে থাকে। ওরা চিত্রাঙ্গীকে নিয়ে যায় মন্দিরে। যাবার সময় চিত্রাঙ্গী ওকে বলে যায়,—কোথাও যেওনা, ঘরে থেকো কেমন? সোমনাথ কোন উত্তর দেয়নি। মন্দির থেকে ফিরে এসেই তাকে ওরা সাজাতে বসবে, আসবে তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত মিলন-রাত্রি। কিন্তু কোথায় খুসী হচ্ছে তার মন? বুকটা কাঁপছে যেন কিসের আশঙ্কায়! ঐ ত দেয়ালে টাঙানো বসন্ত্দেবীর মূর্তি। সারাজীবন সঙ্গীতের সাধনা ক'রে গেছেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যদি এক বিশেষ ধরণের বিশেষ ঘরানার গান স্তব্ধ হ'য়ে যায় ত, তার থেকে বেদনার আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু, এতদিন বেশ ছিল ওরা তুজনে, এরপর যদি আসে মত্ততার ঢেউ, ওকে নিয়ে বিভোর থেকে যদি চিত্রাঙ্গী তার সাধনাকে ভুলে যায়! বিত্যুদ্দীপ্ত দেবদাসীর যদি বিত্যুৎ নিভে গিয়ে নিছক কামনার পঙ্কিলতা জেগে ওঠে! ওঃ! সে যদি এই মুহূর্তে এখান থেকে ছুটে চলে যেতে পারত! সোমনাথ, যদি ওকে সত্যিই ভালোবেসে থাকো, যদি সত্যিই বুঝে থাকো ওর শিল্পীসত্তাকে, যদি সত্যিই ওর স্বর-সাধনাকে মূল্য দিতে রাজী থাকো, তা হলে চলে যাও, চলে যাও তুমি! আধ্যাত্মিক রাজ্যের অনুভূতিতে যে পৌঁছে গেছে এই এক বছরের তপশ্চর্যায়, তাকে স্থূলতার সীমায় নামিয়ে এনো না।

এ'ও ত প্রেম। ওকে ছেড়ে চলে গিয়ে ওকে চিরদিনের মতো হৃদয়ে গ্রহণ করো। ও' তোমাকে পেলে মত্ত হ'য়ে উঠবে। তোমাকে নিয়ে নতুন এক খেলায় মেতে উঠবে, স্বরসাধনায় ওর ব্যাঘাত ঘটবে।

—কিন্তু, মাত্র একটা রাত। আমারও ত আকাঙ্ক্ষা আছে, আমারও ত রক্তমাংসের শরীর ?

ভিতরের সোমনাথ বাইরের সোমনাথকে বলতে থাকে,—কিন্তু তার পরীক্ষা ত তুমি দিয়েছ সোমনাথ, একটি বছর! তোমার ভাবনা কী?

ঠিক কথা। নিজের কয়েকটি টাকা পকেটে নিয়ে ধীর পায়ে বাড়ির বাইরের দরজায় এসে থামে সোমনাথ। তারপর সেখান থেকে চলে যায় পথের মোড়ে। দেখা হয় রত্নমের সঙ্গে, সে ওকে দেখে একটু মুচকি হেসে বলে,—কী গো চিত্রাঙ্গীর ঠাকুর, কোথায় চলেছ? ওর কথায় কোনো সাড়া না দিয়ে হনহন করে এগিয়ে যায় সোমনাথ। নরশাপুরমে যাবার শেষ বাসটা বোধ হয় এখনো যায় নি, তাড়াতাড়ি গেলে এখনো ধরা যায়। কিন্তু, ওকে তার শেষ দেখাটিও দেখা হবে না? তার নিজের কথা থাক, সেও ত কষ্ট পাবে ওকে না দেখতে পেলে! হ্যাঁ, তা' পাবে। কিন্তু কয়েকদিন। ও' পারবে তাকে ভুলতে। ওর পার্থ-সারথীই ওকে তা ভুলে যেতে সাহায্য করবেন। তাম্‌-তিথাই-তিথাই-তাই! আবার নৃত্যের মাধুর্যে ভ'রে উঠবে বিদ্যুৎশিখা, সেই হবে ওর সত্যিকার আরাধনা—ও'যে অন্য জগতের মানুষ! ওর কোলে সন্তান এলে চলবে না, ঘরের মায়ায় বাঁধা পড়লে ওর চলবে না! অথচ, নারীর শাশ্বত কামনা, ঘর-সংসার আর সন্তান। কিন্তু দৃশ্যসঙ্গীত যে সৃষ্টি করতে পারে, তার সত্তাকে আর শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই নারীত্বকে তার জয় করতে হবে।

—আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছে চিত্রাঙ্গী, তবু আমাকে যেতে হবে। যদি সন্তান আসে, যদি তুমি বাঁধা প'ড়ে যাও! আমি যে কখনো ভুলতে পারি না তোমার সেই নৃত্যরতা নিরাবরণ বিদ্যুদ্দীপ্ত দেহ-প্রদীপকে! যদি তা না দেখতুম তা' হ'লে কী হ'তো জানি না! কিন্তু, তোমার জ্যোতির্ময়ী মূর্তির প্রকাশ যে আমি দেখেছি, সেই স্বর্গীয় সুষমাকে আমার কামনাপঙ্কিল হাতে আমি ছোঁবো কেমন করে?

কিন্তু তবু ত কষ্ট পাবে চিত্রাঙ্গী। তবে কি সে ফিরে যাবে? পায়ে পায়ে সত্যিই ফিরে আসে সোমনাথ, ঘর তখনো খোলা, মন্দির থেকে তখনো ওরা ফিরে আসেনি। একটিবার কি দেখা হবে না যাবার আগে? না। হবে না। কষ্ট চিত্রাঙ্গী পাবে, কিন্তু তাকে জয় করতে সে পারবে সোমনাথের থেকেও সহজে। সে ত একদিন বলেছিল যে মুক্তি আমি নেবো, দেবোও। তা ও পারবে। মানুষ যখন মনে করে সে মহত্তর কোন জীবনের সন্ধান পেয়েছে তখন মানবীয় প্রেমের আকর্ষণও তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। বিশেষ করে সেই মানুষ যার কাছে দেহগত মিলন আর অনাস্বাদিত ঘটনা নয়। চিত্রাঙ্গী স্বৈরিণী জীবন যাপন করেছে, দেহ-মিলনের আস্বাদ তার যথেষ্ট জানা, তাই তার পক্ষেই সম্ভব হবে যৌবনের ক্ষুধাকে জয় করা। তার পক্ষেই সম্ভব হবে নৃত্য ও সঙ্গীতের আরাধনায় একাগ্রভাবে ডুবে থাকা। তার বিচিত্র জীবন-দর্শনই তাকে পথ দেখাবে। ঘর সংসার ত করছে সব নারীই, কমলাও করছে রত্নম্‌কে নিয়ে, মা হয়ে সন্তানকে গড়ে তুলছে ত সব নারীই, থাক না তার বাইরে অন্ততঃ একজন যে সুর-তপস্যায় নিজেকে মগ্ন করে রাখবে। নারী জীবনের থেকেও তার শিল্পীজীবন বড় হয়ে উঠুক!

বোধহয় শোনা গেল ওদের কলহাস্য, বোধহয় শুনতে পেলো ওর পায়ের নুপূরের ধ্বনি, এখুনি এসে পড়বে সে। কিন্তু কী করা যায়? ওকে দেখবার—ওকে পাবার—নিদারুণ লোভকে জয় করা কি অতই সহজ? বুকের ভিতরটা তীব্র বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠছে—চোখ উঠছে জলে ভ'রে, তবু উপায় নেই, তাকে যেতেই হবে—যেতেই হবে!

মুহ্যমান মোহাবিষ্টের মতো সে এসে পৌঁছল নরশাপুরম ষ্টেশনে। তার মাথার ভিতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে—কিছু চিন্তা করবার শক্তিও যেন তার নেই,—সব কিছু শূন্য! কিন্তু, একটা-কিছু অবলম্বন যে তার চাই!

ষ্টেশনে এসে ট্রেণের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কয়েকটা কথা কানে যেতেই আপাদমস্তক তার কেঁপে উঠল নিদারুণ-ভাবে। কতকগুলি গ্রাম্য লোক এক জায়গায় জটলা করছিল ব'সে। তাদের কাছে ছুটে এসে পাগলের মতো দাঁড়ালো সোমনাথ, বলল,—কী বলছ তোমরা! গোদাবরীতে বন্যা!

—হ্যা গো বাবু। ভীষণ বন্যা হয়েছিল। বাড়ি ঘর-দোর সব ভেসে গিয়েছিল। এখন অবশ্য জল নেমে গেছে। ঘরবাড়ি তৈরী হচ্ছে। কিন্তু কোন্ দেশের মানুষ গো তুমি! কোনো খবর রাখো না! কতো লোক মারা গেল—কতো লোক সর্বস্বান্ত হ'লো। চেট্টিরা চাল রেখেছিল মাটির নীচে লুকিয়ে, সে-সব গেছে নষ্ট হ'য়ে! কাঠের গোলা থেকে কতো কাঠ গেছে ভেসে!

—এত কাণ্ড! আর আমি কিছুই জানি না!

ট্রেণ চলেছে ছুটে রাজমহেন্দ্রীর দিকে,—আর সোমনাথের মন চলেছে তারও আগে আগে ছুটে। শেষ পর্যন্ত সত্যিই ক্ষেপে গেল গোদাবরী! মা—তার মা,—যেন সমস্ত অত্যাচার আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে হঠাৎ রুখে দাঁড়িয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! আশ্চর্য, একটি বছর তার মাকে একটিবারও তার মনে পড়ে নি!

কিন্তু, সে কেমন আছে, কে জানে! প্রথমেই যার খোঁজে সে ছুটে গেল, সে কৃষ্ণবেণী। কিন্তু কী হয়েছে গোদাবরী-তীরের অবস্থা! উঁচু-বাঁধটা সম্পুর্ণ ভেসে গেছে, কাঠের গোলাগুলি এলোমেলো, কোটিলিঙ্গম-শিবের মন্দিরের চত্বরে মাটির ঢিবি। বাড়িঘর বহু ভেঙ্গে গেছে, নিশ্চিহ্নও হয়ে গেছে কিছু। যেন অনেকগুলি তাসের ঘর ছিল এখানে, বাতাসে সব ভেঙে পড়ে গেছে!

বাড়ির কাছে এসে স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সোমনাথ। দু'একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে শুধু কোনক্রমে, বাকী সব ভূমিসাৎ। বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। কোথায় গেল কৃষ্ণবেণী?

পাশের গলি পেরিয়ে ছুটে গেল সে পার্বতী-মার বাড়ি। গলির ওপরে মাটির ঢিবি, পার্বতী-মার বাড়িটা ছিল দোতলা, এক-অংশ ভেঙে গেছে, অন্য অংশে বোধহয় মানুষ আছে এখনো। দোতলায় ওঠবার সিঁড়িতেও মাটি।

—পার্বতী-মা—পার্বতী মা?

ঘরের অন্ধকার কোণে প্রদীপ জ্বালিয়ে কী করছিল যেন বৃদ্ধা, বলে উঠল, কে?

—আমি সোমনাথ।

—সো-ম-না-থ!—তাকে দেখে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল পার্বতী-মা! কিন্তু কি হয়েছে পার্বতী-মার? এই এক বছরে বয়স যেন ভয়ানক বেড়ে গেছে, চুলেও পাক ধরেছে প্রচুর, চোখের নীচে কালি, গালে-কপালে গভীর কুঞ্চন-রেখা, কোলে একটি মাসখানেকের ঘুমন্ত শিশুকে রেখে প্রদীপের তাপ দিচ্ছে তার পেটে। ফুটফুটে সুন্দর শিশুটি, ছেলেই বটে, মাথাভর্তি রেশমের মতো চুল,—চোখের পাতি-দুটি ঘন—ঠোঁট দুটি পাতলা!

—এসেছিস সোমনাথ! বেঁচে আছিস!

—হ্যা, পার্বতী-মা। কিন্তু কী হয়েছে চারদিকের অবস্থা! ঘর-দোর ভেঙে গেছে! আমি কিছুই জানতাম না! কৃষ্ণবেণী কোথায়?

কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বৃদ্ধা বলে,—তোর মা যেখানে গিয়েছিল, সেইখানে, ঐ গোদাবরীর জলে।

—মানে! বন্যায় ভেসে গেছে!

—লোকে তাই বলে বটে, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না। ও মনের দুঃখে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। সন্ধ্যার আগে এলো, কতো কাঁদল, ছেলেটাকে আমার কোলে দিয়ে বলল,—একে দেখো, আমি শিবমন্দিরে পূজা দিয়ে আসি। সেই যে গেল, আর এলো না। রাতে এলো জল, জল বাড়তে লাগল, আমি ছেলেটাকে বুকে ধরে

ভয়ে অস্থির, ওর আর খোঁজ করতে পারলুম না, পরে লোকে বলে, বানের জলে ও' ভেসে গেছে !

—এই ছেলে ?

—কৃষ্ণবেণীর। কোথায় ভেবেছিলাম তীর্থে-তীর্থে ঘুরব, তা' আর হ'লো না, শেষ বয়সে কিসে বাঁধা পড়লুম দেখ। সেই রামেশ্বরকে তোর মনে আছে ? সে-ই এর বাপ। তা' তাকেই বা পাবো কোথায় ? সে ত অনেক আগে থাকতেই নিরুদ্দেশ লোকজানাজানির ভয়ে !

ধপ্ করে মাটিব উপর বসে পড়ল সোমনাথ। সেই দৃপ্ত চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই যে বলেছিল, তুমি এসে এখানে থাকো। আমাকে তুমি না দেখলে কে দেখবে ! সেই যে বলেছিল—তোমাব সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ এসেছিল, আমাকে তোমার জন্য দেখতে গিয়ে নিজেই বিয়ে করে বস্‌ল তোমার বাপ, সে কী আমার দোষ ?

ছেলেটার দিকে মুখ ফেরাতেই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল,—না-না, এখানেও থাকা চলবে না, —ছেলেটা চোখ তুলে তার দিকে তাকাবে, মনে হবে, চাবুক মারছে তাকে !

—আমি যাই পার্বতী-মা।

—সে-কী ! তোর খবর বলে যা !

আমার কোনো খবর নেই। আমি চাবদিকের সব দেখে আসি ঘুরে ঘুবে। তাবপব ফিবে আসব তোমার কাছে।

ত্বরিত পায়ে বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। গোদাববী এখন শান্ত, দেখেও বোঝা যায় না, স্ফীত হয়েছিল তার বুক, ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার দুপাশের জনপদ !

সকালের রৌদ্র চিক্‌চিক করছে জলে। মা যেন হাসছেন তার দিকে চেয়ে,—সোমা, সোমলু, ভালো আছিস্ !

বুকের ভিতরটা হু-হু করে উঠল অকস্মাৎ ! সেই যে বলেছিল,

তোমার বউ নিয়ে এসে আমার কাছে ছুটিতে থাকো সোমনাথ, তোমাদের দেখে আমি সুখী হবো!

হলো না—কিছুই হলো না। এক দিক থেকে অদ্ভুত ভারমুক্ত মনে হচ্ছে নিজেকে! বাঁধানো ঘাটগুলো মাটির তলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পুরোহিতের দল আজ কোথায়! দু'একজন এদিক-ওদিক ঘুরছে—শ্মশানচারীর মতো। নদীতীরে যে বড়ো বড়ো গাছ দেখা যেতো, তার একটাও আর বেঁচে নেই। সেই প্রকাণ্ড অশথ গাছটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

দ্রুত পথ পার হয়ে যে বাড়িটাতে সে থাকত, সেইদিকে যেতে লাগল। কিন্তু সে বাড়িটাও গেছে একেবারে গুঁড়িয়ে, ধূলিসাৎ হ'য়ে। দু'একটি রজকের দল কাপড় কাচ্‌ছে, কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল তাদের নোকন্না-সর্দারের কথা। কেউই চিন্‌তে পারল না প্রথমে, অবশেষে একজন বললে,—আমাদের প্রকাশ রাওয়ের শ্বশুর? তাঁরা ত এখানে নেই, কোকনদে গেছে চ'লে। প্রকাশ রাও সেখানে দল করেছে কি না। এখানকার ডাইক্লিনিং দেখছে এখন অন্যলোক। প্রকাশ রাও কোকনদে গিয়ে 'ভোট্‌ দাও—ভোট্‌ দাও' বল্‌ছে, ওখানকার চাকলেরা সবাই ব'লেছে ভোট দেবে প্রকাশ রাওকে!

—লছমীর খবর জানো?

—প্রকাশ রাওয়ের বউ ত? সে ত তাঁর সঙ্গেই আছে। ঘরের ভিতর থাকে, বাইরে বেরুতে দেয় না।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় সোমনাথ। এরা সবাই ডাইংক্লিনিংয়ের জন্য কাপড় কাচ্‌ছে। কিন্তু ওরা কোথায়? কোণ্ডা আর নাগমণি?

সারা দিন ধ'রে খোঁজবার পর শেষকালে ওদের খবর পাওয়া গেল। সেই জলের পাম্পটা পেরিয়ে, যেখানে প্রথম দেখা পায় কোণ্ডা নাগমণির, সেইখানে নিজেরা চালা বানিয়ে নিয়েছে দুজনে। কাপড় কাচে, তবে ডাইংক্লিনিংয়ের জন্য নয়। দূরে দূরে গৃহস্থবাড়িতে চলে যায় দুজনে, কাপড় নিয়ে আসে,—এইভাবে নিজেদের কাজ ওরা

কষ্টেস্বষ্টে করে যাচ্ছে, তবু ডাইংক্লিনিং ব্যবস্থার পায়ে নতি স্বীকার করে নি।

জলের ওপর পাথর রেখে মহা উৎসাহে কাপড় কাচছিল কোণ্ডা, ওকে দেখে রীতিমত 'হৈ-হৈ' ক'রে উঠ্‌ল বলা চলে, বলল, পণ্ডিত! এই এত দিনে এলে! জমানা বদল গিয়া!

ওর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নতুন এক দৃষ্টিতে গোদাবরীর তটের দিকে তাকায় সোমনাথ,—এখান থেকে জনপদের এক নতুন রূপ চোখে পড়ে! সব-কিছুর ওপর যেন নতুন পলিমাটি পড়েছে! নতুন কোনো জীবন গড়ে উঠ্‌বার কামনায় মাটি যেন অধীর হ'য়ে আছে! নতুন জল যেন এসে তটভূমিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে,—ফিসফিস-করা সুরে ব'লে যাচ্ছে,—সোমা-সোমলু!

—বেঁচে আছি মা। নতুন এক জীবন যেন ফিরে পেয়েছি।

কোণ্ডা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বলল,—একী পণ্ডিত, তোমার চোখে জল কেন?

—ও' কিছু নয়। চল্‌ তোর ঘরে।

—আমার ঘরেই তোমাকে থাকতে হবে কিন্তু। তা তোমার বৌ কোথায় পণ্ডিত? সেই যে সেই মেয়েটা, সেই নাগমণির বন্ধু?

ম্লান হেসে সোমনাথ বলে,—সে আছে। কিন্তু ঠিকই ব'লেছিস কোণ্ডা, আমি তোদের পাশেই থাকব। এই যে নদী, এ আমার মা, একে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না, থাকলে আমি ভুল করব!

হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কোণ্ডা, সোমনাথের কথা সে বুঝতে পারে না, বলে,—কি ব'লছ!

—কিছু না। হ্যাঁরে, লছমীর খবর কিরে?

হো-হো ক'রে হেসে ওঠে কোণ্ডা, বলে—লছমীর খবর! সে'ত বড়োলোকের বউ হয়ে গেছে! কোকনদে চলে গেছে সবাই ওরা। নোকম্মা-সর্দারের বুকের রোগ হ'য়েছে শুনেছি, সে জামাই-মেয়ের কাছেই থাকে। বুড়ো এবার মরবে।

কথা বলতে বলতে ওদের ঝুপড়ীর দিকে এগিয়ে যায় সোমনাথ। কিন্তু ওদের ঘরের প্রাঙ্গণে যে অপূর্ব দৃশ্য তার জন্য অপেক্ষা করছিল, তাকি সে জানত !

নাগমণির মাসদুই বয়সের কচি ছেলেটা হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করছে বিছানায় শুয়ে, আর তার সামনে নাচের ভঙ্গীতে হাত-পা আন্দোলিত করছে নাগমণি। নাগমণি ওদের দেখতে পায় নি, সে শিশুর দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে নাচছিল আর সঙ্গে সঙ্গে গাইছিল কি একটা গানের কলি ! দেখে-দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল সোমনাথের, যেন কোনো বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা কোনো ছবি দেখছে সে !

কোণ্ডার হাঁকে ডাকে অবশ্য তন্ময়তা ভেঙে গেল নাগমণির। সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ল ওকে দেখে আনন্দে, বলল,—ভগ্নিপতি !

—হ্যাঁ রে, আমি, বিশ্বাস হচ্ছে না !

নাগমণি ছুটে এসে ওকে একেবারে জড়িয়ে ধরে, বলে,—আমার ভগ্নী কই ?

একটু থেমে সোমনাথ বলে,—সে মাণ্ডুলাতেই আছে। মন্দিরে। আমি এলাম, কিন্তু আর যাব না। তোদের কাছেই থাকব। তোর ছেলেটি বড়ো হবে, ওকে আমি পড়াবো। ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে নাগমণি বলে—বেশত পড়িও, ওকে আমি তোমার হাতেই দিলাম। কিন্তু, চিত্রাঙ্গী, আমার বোন ?

—তাকে একটা জরুরী চিঠি লিখতে হবে। হ্যাঁরে তোদের কেউ মাণ্ডুলাতে যাচ্ছে ? না, ডাকে পাঠাবো ?

কোণ্ডা বলে ওঠে,—আমাদের একটা লোক যাচ্ছে, পণ্ডিত। ভোরেই যাবে। পূজা দেবে পার্থসারথীর মন্দিরে। মানৎ আছে। তার কাছে চিঠি দিতে পারো !

—বেশ তার হাতেই দেবো। সে যেন পৌঁছে দেয়।

রাত্রে ওদের ঘরে বসে প্রদীপের আলোয় চিঠিটা লেখে সোমনাথ। হাত তার কেঁপে ওঠে, তবু না লিখে উপায় নেই।

বসন্তদেবীর সেই সুর, যাকে আয়ত্ত করতে একাগ্র নিষ্ঠা আর সংযমের প্রয়োজন, যা ভালবাসার জালে জড়িয়ে গিয়ে কমলা পারলো না শেষ পর্যন্ত—তাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, আর তা চিত্রাঙ্গীই পারবে। ওর পার্থসারথী ওঁকে সেই মানসিক শক্তির সম্পদই যেন দিয়ে দেন।

"চিত্রাঙ্গী,

হঠাৎ সব ছেড়ে চলে এলাম কেন গোদাবরীর তীরে, তা' তুমি একদিন নিশ্চয়ই বুঝবে। বিপুল বন্যা হয়ে এখানকার সব কিছু ওলোট-পালট্ হয়ে গেছে, আমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। অনেক কাজ করার আছে নতুন জীবন গড়ে তোলার জন্যে। কৃষ্ণবেণীকে তোমার মনে আছে? তার কথা সবই বলেছিলাম। আমার সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা, তাকে বিয়ে করে এনেছিল আমার বাবা। আমি সেই ভুলের আজ প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই নূতন গোদাবরীর জল মাথায় নিয়ে। আমি কৃষ্ণবেণীকে নিয়ে ঘর বেঁধেছি। সে আর আমি নূতন জীবন শুরু করলাম। আমাদের দু'জনের মধ্যে তুমি যেন এসে পড়োনা। তোমার কাজ তুমি করে যেও, আমার সন্ধানে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে পড়োনা, আমার দেখা তুমি পাবে না।

—সোমনাথ"

চিঠিটা লিখতে লিখতে চোখের জল টপ টপ করে পড়ছে চিঠিটায়। কৃষ্ণবেণী শব্দটার ওপরে একফোঁটা জল পড়ে শব্দটা প্রায় মুছে দিয়েছিল, আবার তার ওপরে ভাল করে কলম বুলিয়ে কথাটাকে স্পষ্ট করে তোলে সোমনাথ। এ মিথ্যা কথা লেখার জন্য মা তুমি ক্ষমা কোরো সোমনাথকে, এ ছাড়া যে অন্য কোন পথও ছিল না।

একটি রাত কেটে গেল ওদের ঘরে। চিঠিটা কোণ্ডার লোকটির হাতে ছেড়ে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হলো সোমনাথ। সবাই যা করে সোমনাথও তাই করতে পারত! মাণ্ডলায় তার চাকরী ছিল, ছিল

ঘর, ছিল চিত্রাঙ্গী। কিন্তু বদ্ধ জীবনে প্রেমকে সে বন্দী করতে চায় নি। কিন্তু আজ থাক তার নিজের কথা। এদের নীড় কিন্তু সত্যিকার আনন্দের নীড় হয়েছে। দারিদ্র্য বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারে নি ওদের আনন্দকে, ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো সোমনাথ, বললে,—মাগো, মানুষগুলো উঠে দাঁড়াতে পারছে না, আমি ত মুক্ত, আমি ওদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকব।

সত্যই যেন নতুন এক জীবন গড়ে উঠ্‌ছে। নতুন ক'রে মাটি সরাচ্ছে লোক। কোণ্ডা আর নাগমণি ভোরে উঠেছে কাপড় কাচ্‌তে, ছেলেটাকে তীরে শুইয়ে রেখে পাশাপাশি কাপড় কাচ্‌ছে ওরা। 'হেই-হেই' একটা একটানা শব্দ উঠ্‌ছে। আকাশ দিয়ে পাখী উড়ে যাচ্ছে, তারই দিকে তাকিয়ে আপন মনে কথা কয়ে উঠ্‌ছে শিশুটি হাত-পা ছুঁড়ে!

তার ঠিক মাথার কাছে একটি ছোট্ট শিশু বৃক্ষ। হঠাৎ-ই চোখ পড়ল গাছটার দিকে। ভালো ক'রে লক্ষ্য করতে করতে এক নিবিড় আনন্দে ভ'রে গেল সোমনাথের মন। ছোট্ট শাল্মলী গাছ, ভবিষ্যতের শাল্মলী তরু!

এই তরু বড়ো হবে, ছায়া দেবে যুগ থেকে যুগান্তরের লোককে, লোকের শোক-দুঃখ-আনন্দের সাক্ষী হবে, কতো পাখী বাঁধবে বাসা এসে ডালে, কতো পাখী উড়ে যাবে,—হয়তো ভবিষ্যতের কবি একে দেখেই একদিন রচনা করবে,—অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু······

সেই রচনা ব্যর্থ হবে না, কিন্তু কে হবে ভবিষ্যতের সেই কবি?